শিক্ষাতত্ত্ব

সার পার্সি নান্ প্রণীত
"এডুকেশন, ইট্‌স্ ডেটা এণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স"
নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম্, এ., ডিপ্লোমা-ইন্-টীচিং (লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, টীচার্স ট্রেনিং ইন্সটিট্যুট, কলিকাতা কর্পোরেশন

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শিক্ষাতত্ত্ব

সার পার্সি নান্ প্রণীত
"এডুকেশন, ইট্স্ ডেটা এণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্ল্স"
নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম, এ., ডিপ্লোমা-ইন্-টীচিং (লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, টীচার্স ট্রেনিং ইন্সটিট্যুট, কলিকাতা কর্পোরেশন

ও রি য়ে ণ্ট লং ম্যা ন্স
বোম্বাই কলিকাতা মাদ্রাজ নতুন দিল্লী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই-১
৩৬-এ, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২
ক্যানসন হাউস, ২৪-১, আসফ আলি রোড, নতুন দিল্লী-১
গানফাউণ্ড্রী রোড, হায়দ্রাবাদ-১
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭, ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীট্, লণ্ডন, ডব্লিউ-১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরোণ্টো, কেপ্ টাউন ও মেলবোর্ণ

লণ্ডন-এর এডওয়ার্ড আর্ণল্ড এণ্ড কোং
প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫০
দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ১৯৫৮

মুদ্রাকর: শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

ভূমিকা

শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মনীষীশ্রেষ্ঠ সার পার্সি নানের গ্রন্থটির নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এরূপ সুলিখিত ও গভীর তথ্যসম্বলিত রচনা অল্পই আছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে মাতৃভাষায় ইহার একটি সংস্করণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে।

শিক্ষাসম্পর্কিত নানা জটিল প্রশ্নের আলোচনা পুস্তকটিতে আছে বলিয়া ইহার ভাব ও ভাষা উভয়ই শিক্ষিত পাঠকেরও অনেক স্থলে বড় কঠিন লাগে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার দুরূহ অংশগুলির সরলতা সাধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক নানের নিজের মুখে এই সকল তথ্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনা শুনিবার যে দুর্লভ সুযোগ হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ সহায়তা প্রতি পদে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত বক্তব্য বিষয়ের সংযোগসাধনের প্রয়াসও যথাসম্ভব করা গিয়াছে। আবার কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র মূল পুস্তকে ছিল, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল কারণে মূল পুস্তকের আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং অনেক অংশ নূতনভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যুক্তিটি সম্পূর্ণ অব্যাহত ও অপরিবর্ত্তিত আছে।

বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। এই জন্য মনোবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বাঙ্গালায় আলোচনা করা সহজ নহে। যে সকল শব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পরিভাষা তালিকায় আছে, সেগুলি ব্যবহার করিয়াছি। অন্যান্য কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় শব্দের বিষয়ে আমাকে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন সুধীবর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীজিতেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়। ইঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ সানন্দে স্বীকার করিতেছি। পুস্তকখানি প্রণয়ন কালে সতীর্থ শ্রীশরদিন্দুরঞ্জন বসু মহাশয়, বন্ধুবর শ্রীজীমূতপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও

আমার পত্নীর কাছে নানাভাবে যে সহায়তা পাইয়াছি, সে জন্য তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাঙ্গালা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ বিশেষ আর নাই। পাঠকগণের কাছে ইহার আদর হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহা পরম তৃপ্তির কথা। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকটি আগাগোড়া সংশোধিত হইয়াছে, অনেক অংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে; মূল বিষয় বজায় রাখিয়া ভাব ও ভাষাকে আরও সরল করিবার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি ইহাতে পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির আকর্ষণ আরও বাড়িবে।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচী

শিক্ষাতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি, এই কথাটি লইয়া সকল দেশে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া আসিতেছে। পূর্ণ বিশ্বাস লইয়াই নানা লোক এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর দিয়াছেন। কেহ বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন ; কেহ বলেন জীবনযাত্রার পূর্ণতা সাধনের সহায়তা দান ; আবার অন্য কেহ বলেন দেহ ও মনের সুস্থতা বিধানই শিক্ষার অভিপ্রায়। এই ভাবে উত্তরের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়াইতে পারা যায়। প্রথমে হয়ত এগুলি সন্তোষজনক মনে হইতে পারে। কিন্তু আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই সব প্রশ্ন আসিয়া পড়ে যে, কিরূপ চরিত্র গঠিত হওয়া উচিত, জীবনের পরিপূর্ণতা বলিতে কোন্ কোন্ ক্রিয়া বুঝায়, সুস্থ মনের লক্ষণই বা কি ? তখন দেখিতে পাওয়া যায়, এই উক্তিগুলির কোনটিতেই শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যায়, এমন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, লোকে এগুলির ইচ্ছামত নানারূপ বিভিন্ন অর্থ করিতে পারে। কেন না, ভাল চরিত্র বলিতে আমি যাহা বুঝি, আর একজনের হয় ত তাহা হাস্যকর বা আপত্তিজনক ঠেকিবে। জীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে একজনের যাহা ধারণা, তাহাকে অপর এক ব্যক্তি আত্মার চরম অধোগতি মনে করিতে পারেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া নৈরাশ্যবাদী কেহ হয়ত এমন কথাও বলিবে যে, এই সকল সংজ্ঞার আসল সার্থকতা হইল কথার একটা জালের মত সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার নীতি ও ব্যবহারিক ধারার মধ্যে পার্থক্যগুলিও চাপা দেওয়া ; কারণ সেগুলি এত মূলগত যে উহাদের মধ্যে মিল আনা সম্ভব নহে। আবার এগুলি এত গভীর যে উহাদিগকে লোকচক্ষুর সামনেও আনা চলে না।

এতখানি প্রভেদের সৃষ্টি কিরূপে হইল? তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সকল শিক্ষাধারারই মূলতঃ ব্যবহারিক প্রয়োগ রহিয়াছে, সেজন্য প্রতিক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের সহিত উহার যোগ রাখিতে হয়। সুতরাং যে শিক্ষা সুনির্দিষ্টরূপে জীবনে আমাদের পথ দেখাইবে, উহার লক্ষ্যও আমাদের জীবনের আদর্শেরই অনুরূপ হইবে। ফলে জীবনের বিবিধ আদর্শের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ আছে, তাহার প্রভাব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মধ্যেও আসিয়া পড়ে। উদাহরণরূপে বলা যায় যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকদের জীবনযাত্রার আদর্শে প্রভেদ ছিল। এই জন্য উভয়ের শিক্ষানীতির মধ্যেও কোন মিল দেখা যায় না। তাহা ছাড়া সভ্য সমাজে কোনও এক আদর্শের প্রভাব দীর্ঘ কাল অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, এমন কি কোনও একটি জাতি বা দেশের মধ্যেও তাহা ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, আমাদের এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে যাঁহারা নামে একই আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও সব সময়েই দলাদলি থাকে; সন্দেহ, অবিশ্বাস বা বিদ্রোহ ভাবও গোপনে তাঁহাদের মনে থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির স্রষ্টাগণ ক্রমাগত পরস্পরের বিরুদ্ধতা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর সাধারণ লোকেও আসল সত্যটির সন্ধান কোথায় পাইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এই গোলযোগের মূল কারণ অবশ্য এই যে, মানবচরিত্র বড়ই জটিল, আর উহার এমন এক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা আমাদের দৃষ্টিতে বড় অদ্ভুত রকম পরস্পরবিরোধী ঠেকে। একদিক হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষে মানুষে এতখানি প্রভেদ রহিয়াছে. যেন প্রত্যেকেই এক একটি দ্বীপের নিঃসঙ্গ অধিবাসীর মত; তাহাদের মধ্যে অপার সমুদ্রের ব্যবধান রহিয়াছে। কতকগুলি উচ্চারিত ধ্বনি বা লেখার সাহায্যে দুইজন মানুষের মধ্যে অস্পষ্ট ও পরোক্ষরূপে ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারে মাত্র। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ যোগ বা একাত্মবোধ নাই, দুজনের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আর এক দিক হইতে দেখিলে, যথার্থ ই সকল মানুষ একত্বসূত্রে আবদ্ধ। আমরা যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের দেহে যেমন কোনও আচ্ছাদন থাকে না, তেমনই মনও থাকে শূন্য। দেহে

অন্য লোকে বস্ত্র পরাইয়া দেন, মনও তেমনই অপরের চিত্তনিঃসৃত ভাবধারায় পুষ্ট হয়। অপরের নিকট হইতে এগুলি না পাইলে আমরা বাঁচিতে ও মানুষ হইতে পারিতাম না।

মনুষ্যজীবনের এই যে পরস্পরবিরোধী দুটি ব্যাপার আছে, দার্শনিক আলোচনার সময়ে লোকে তাহার একটির উপরেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। একদল বলে যে ব্যক্তির গুরুত্ব অধিক, তাহারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজের উর্দ্ধে স্থান দেয়। আবার আর একদলের মতে রাষ্ট্র ও সমাজই হইল প্রধান, এবং উহাদের সেবাতেই ব্যক্তির সার্থকতা প্রকাশ পায়। এই দুই বিপরীত মতবাদের মধ্যে চিরদিনই বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও ইহার দ্বারা এখনও পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়া আসিতেছে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময়ে কি প্রধান ভাবে তাহার কথাই বিবেচনা করিতে হইবে, বা সমাজ ও রাষ্ট্রসেবার কথা মনে করিতে হইবে, অথবা সংযুক্তভাবে দুইটি উদ্দেশ্যই মনে রাখিতে হইবে? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত কি, তাহা আলোচনার প্রারম্ভেই যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবে বলাই হইবে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

মানুষ সামাজিক জীব, আর যে সহজাত 'আসঙ্গ-প্রবৃত্তির' ফলে সে এরূপ হইয়াছে, উহাই সকল সভ্যতা ও মানবিক সার্থকতার মূল। এই উক্তি পুরাতন, আর যে সব যুক্তির সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, সেগুলির পুনরুল্লেখেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইহা খুব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষ যাহা হইয়া উঠে, নিজ সামাজিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলেই, অর্থাৎ, মাতাপিতা, সতীর্থ, বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষকগণ, সঙ্গী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, বন্ধু ও শত্রু, প্রভু ও ভৃত্য, প্রভৃতির সংস্পর্শের প্রভাবেই উহা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইহাও সহজেই বুঝা যাইবে যে আমাদের 'সামাজিক উত্তরাধিকার' (social heritage) অর্থাৎ বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সমাজের যাবতীয় আচার এবং সংস্কারাদিও ব্যক্তির মানসিক গঠন ও বিকাশের উপর বিশাল প্রভাব আরোপ করে। এই সকল সুবিদিত ব্যাপারের কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বহু চিন্তাবিৎ ইহা হইতে যে সব

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এইগুলি মানিয়া লওয়া সম্পর্কে আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ইহাতে এমন কথা প্রমাণ হয় না যে সমাজের একটা 'বিশ্বজনীন মন' আছে। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মনেরই আসল অস্তিত্ব রহিয়াছে। আর এরূপ সিদ্ধান্তও করা যায় না যে, শুধু রাষ্ট্রের সেবা ও গৌরববর্দ্ধন করা ছাড়া ব্যক্তির অন্য কোনও কর্ত্তব্য নাই। গণতন্ত্রও এরূপ মতবাদের বিরোধী। গণতন্ত্রে অবশ্য এ কথা মানিয়া লওয়া হয় যে, জাতীয় আচার ও ঐতিহ্যের যে অমর সত্তা রহিয়াছে, পৃথক ব্যক্তিগত জীবন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্র ইহাও বলে যে, ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ উন্নত করার বিষয়েই জাতীয় ঐতিহ্যের যাহা কিছু গুরুত্ব। তেমনই বলিতে হয় যে, কোনও শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কতখানি ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

স্বতরাং এই মতবাদকে ভিত্তি ধরিয়াই শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা যাইবে। আমাদের যুক্তি এই যে পৃথিবীতে ভাল যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বিভিন্ন নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীন ক্রিয়ার ফলেই হইতে পারিয়াছে। স্বতরাং শিক্ষাপ্রণালীও এই নীতি অনুযায়ী গঠিত হওয়া চাই। একথা মানিয়া লইলে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব যে চলিয়া যায় বা হ্রাস হয়, তাহা নহে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ মানুষের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে, আর সে প্রকৃতিতে আত্মশ্রদ্ধা (self-regard) যেমন আছে, তেমনি সামাজিক ভাবও রহিয়াছে। আর এই মতবাদে জাতীয় সংস্কার ও শৃঙ্খলার মূল্য বা ধর্ম্মের প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে এ কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয় যে, ব্যক্তির উপরেও সমাজের এমন কোন মহীয়ান্ সত্তা আছে, যাহার কাছে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন একেবারেই তুচ্ছ। ব্যক্তির মর্য্যাদা যে অসীম, আর নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে যে তাহারই চরম দায়িত্ব রহিয়াছে, সেই কথাটিই এই মতবাদে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিষয়টি আর এক দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। একটু আগে জীবনের আদর্শের কথা বলা হইয়াছে। উহার বিষয়টি এখন বিবেচনা

করা যাক। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ জীবনের আদর্শ বহুলাংশে অপরের প্রেরণা অনুযায়ী গঠন করিয়া থাকে, তাহা সত্য। কিন্তু এ কথা বলিলেও কিছুমাত্র ভুল হয় না যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ তাহারই নিজস্ব ও অদ্বিতীয়। এই অর্থে প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির, যেমন কবিতার, একটি নিজস্ব আদর্শ আছে। যে কবি দেখেন যে তাঁহার সৃষ্টি প্রতিভা ব্যর্থ হইয়াছে, তিনি কখনও অপরের একটি কবিতা দেখাইয়া বলেন না যে, সেইটিই সৃষ্টি করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার আদর্শটি সুনির্দ্দিষ্ট, আর উহা যদি বাস্তবরূপ লইতে পারে, তবে একমাত্র তাঁহার নিজের রচনাতেই পারিবে, অন্যের কবিতায় নয়। তাঁহার আদর্শে যে উৎকর্ষের মানটি সূচিত হয়, উহাতে তাঁহার নিজের প্রয়াসটি পোঁছিতে পারে নাই, এই কথাই এক্ষেত্রে বুঝায়; অন্য লোক সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে বা পৌঁছিতে পারিত, এমন কোনও কথা আসে না। সুতরাং শিক্ষার যে উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন, তাহা জীবনের কোনও বিশেষ একটি আদর্শের সমর্থক হইতে পারে না। কারণ মানুষ যত, আদর্শের সংখ্যাও তত। সুতরাং প্রত্যেকের ব্যক্তিতা (individuality) অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাহাতে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে, এমন সুযোগ সকলকে দেওয়াই হইবে শিক্ষার কার্য্য। এই ভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি বিচিত্র মানবজীবনের সম্মিলিত ধারায় নিজ নিজ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনুযায়ী নিজস্ব দানটি নিবেদন করিতে পারিবে। অবশ্য এ দানটি ঠিক কিরূপ হইবে, তাহা ব্যক্তিই স্বয়ং নিজ জীবনে স্থির করিবে।

মানুষের ক্রমবিকাশধারা এই নীতি অনুযায়ী চলে কিনা, অর্থাৎ ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সমর্থিত, না আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র, সে আলোচনা পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে করা যাইবে। এখন ইহার কয়েকটি গুরুতর তাৎপর্য্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর ইহার সম্পর্কে যে সমস্ত ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতে পারে, সেগুলিকেও দূর করিতে হইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কথা উপরে বলা গিয়াছে, তাহাতে মনে হইতে পারে যে তাহাতে জীবনের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট আদর্শের প্রভেদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কোন শ্রেণীর ব্যক্তিতা বা চরিত্রকে উৎসাহ দিতে হইবে, আবার কোন্‌টিকেই বা দমন করিতে হইবে, তাহার কোনও

উল্লেখ ইহাতে নাই। শিক্ষক মহাশয় কি তবে শিক্ষার্থীগণের নৈতিক গুণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সমান আগ্রহে সর্ব্বপ্রকার চরিত্রেরই বিকাশ সাধন করিবেন? সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে তাহা হইতে পারে না। কিন্তু এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে গেলে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি আসিয়া পড়িবে। তবে একটি কথা সহজেই বুঝা যায় যে, নিজ দায়িত্ব বহন করা প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার ও কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু জন্মকালেই শিশুর সে দায়িত্ব বোধ আসে না। পারিবারিক জীবন ও বিদ্যালয়ের সংস্কার যে আমাদের মধ্যে আছে উহাতে এক সম্মিলিত দায়িত্বই বুঝায়, যুক্তভাবে তাহা বহন করেন মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ। প্রথমে ইহার প্রভাব অত্যধিক। পরে যতই দিন যাইতে থাকে এবং শিশুর ব্যক্তিতা পরিণত রূপ ধারণ করে, ততই ইহা কমিয়া আসে। শিশু যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হইতেছে, তাহার মধ্যে সেই সমস্ত উপাদানই যতদূর সম্ভব বেশী থাকা চাই, যেগুলি শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিতা গড়িয়া তুলিতে পারে, আর অন্য প্রভাবগুলি বাদ দেওয়া হয়। নৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করাই মাতাপিতা ও শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। এ স্থলে অবশ্য শিশুকে অপরের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে হইল, এবং সে জন্য তাহার অবাধ পরিণতির স্বাধীনতাওবাধা পাইল। কিন্তু মানুষের জীবনে এটুকু বাধা মানিয়া লইতেই হইবে। স্থপতি যখন গৃহ নির্ম্মাণ করে, তখন তাহার যা উপকরণ আছে, তাহার দ্বারাই ত তাহাকে কাজ চালাইতে হয়। তথাপি তাহার সৃষ্টিপ্রতিভা অনুযায়ী যে কোনও রূপে সেগুলিকে কাজে লাগাইবার স্বাধীনতাও তাহার আছে। সেইরূপ বিদ্যালয়ের পাঠ ও শৃঙ্খলার বেলাতেও যে সমস্ত কৃষ্টি ও নীতিমূলক সংস্কার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অমূল্য বিবেচিত হয়, সেগুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে; অথচ ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যাহাতে অবাধে স্ফূরিত হয়, তাহারও যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। সব রকমের মানুষ লইয়াই ত পৃথিবী; সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পরিণতি তাহার সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী হইলে ধরণীর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। যে ক্ষেত্রে নৈতিক বিধান শুধু অনুমোদনমূলক নয়, বাধ্যতামূলক, সেখানেও পালন করিবার ধরণটির মধ্যে যে কত রকমের বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। যেমন, বলিতে পারা যায় যে মোটরগাড়ীর

চালক যে পথের বাম দিক হইতে চলে, সেই ক্রিয়াটি দ্বারাই মানুষের প্রতি তাহার ভালবাসা প্রকাশ পাইল। ইহার অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টই দেখা যায় যে মানুষের ভাল ও নির্দ্দোষ কাজের বাস্তব রূপ যে কত হইতে পারে তাহার সংখ্যা নাই, এবং সেগুলির কোনটির উৎকর্ষের বাস্তব নীতিটি আগে হইতেই নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা এই কথাও বলিতে পারি যে, শিক্ষক যদি বুদ্ধিমান হন ত তিনি বিধিনিষেধের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াইবেন না। মানবের ব্যক্তিতার কোনও অভিনব রূপ, তাহার ভাব ও কর্ম্মের একটি নূতন ধারা, শেষ পর্য্যন্ত এ ধরণীর প্রকৃত ঐশ্বর্য্য বাড়াইবে কি কমাইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা বড়ই কঠিন। যাহা কিছুই আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত, তাহাকে সৌন্দর্য্য, সত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী বলিয়া নিন্দা করাই অতি সহজ। আমরা ত জানি যে, মানুষের যে সকল স্বষ্টিমূলক ক্রিয়ার ফল পরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, অতীতে সেইগুলিকেই দমন করিবার কত বার চেষ্টা চলিয়াছে। অতীতের এইরূপ শোচনীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও হইয়া চলিতেছে। কখনও তুচ্ছ ব্যাপারে, কখনও বা গুরুতর ক্ষেত্রে তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আর সাধারণ লোকের চেয়েও শিক্ষকের পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা আরও অধিক প্রয়োজন। ইহার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুতর দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নারীজাতি যোগাইয়াছেন। বহুকাল বাধা পাইবার পর এখন তাঁহারা অতীতের পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে বহু বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন। গত কয়েক দশক ধরিয়া শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিক্ষা ও নীতির ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি দেখা গিয়াছে, সেগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আরও অনেক সারগর্ভ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই কথা বলা যাইতে পারে যে স্বষ্টিকর্ত্তা মানবশিশুর ভিতরে যে বৈশিষ্ট্য ও বৃত্তিগুলি দিয়াছেন, সেগুলির অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ হওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত; আর শিক্ষকের সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি যেন কখনও বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন। বিশেষতঃ তাঁহাকে সতর্ক হইতে

হইবে যে শিক্ষার্থীগণকে সামাজিক কর্ত্তব্য শিখাইবার কালে তিনি যেন প্রাচীন ও জীর্ণ মতবাদের মধ্যে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধ না রাখেন। সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিবার অগণিত রূপ আছে, মানুষ তাহার অপর সকল কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ঠিক কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা আগে হইতে বলা বা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। জগতে এমন কোনও নির্ভীক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে, যাঁহার ব্যক্তিতার স্বরূপ হয় ত প্রথমে মানব-সমাজের অস্তিত্বেরই বিরোধী মনে হইবে, কিন্তু শেষে তাঁহার দ্বারাই সমাজের সমগ্র নৈতিক ভিত্তি উন্নত হইবে। আর যে ব্যক্তি এরূপ বলিষ্ঠচিত্ত নহেন, তিনিও যদি সম্পূর্ণ ও যথার্থরূপে নিজ প্রকৃতিরই অনুসরণ করেন, তবেই সমাজের সেবা তাঁহার দ্বারা ভালরূপে হইতে পারিবে। ফলতঃ ব্যক্তির উপর সমাজের যে দাবী আছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে তখনই পূরণ হইবে, যখন মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ সহজাত বৃত্তি ও শক্তিসমূহকে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে পারিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব আর সব মানুষের ছাঁচে গড়িলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এখনও পর্য্যন্তও আমরা এ প্রশ্ন উথাপন করি নাই যে, সমাজ (অর্থাৎ রাষ্ট্র) কোনও বিশেষ বিপদের মুহূর্ত্তে মানুষের নিকটে এমনই সেবা দাবী করিতে পারে, যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত বিকাশ বাধা পায়, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত উহা বিসর্জ্জন দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। এ দাবী মানিয়া লইলে কি আমাদের যুক্তির জোর কমিয়া যাইবে না? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, গত দুই মহাযুদ্ধে অসংখ্য লোকের বিবেচনায় আত্মবিসর্জ্জনই ছিল ব্যক্তির পূর্ণ ও বীরোচিত পরিণতি। কিন্তু এ উত্তর সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ নয়। আমরা জোরের সহিত এই কথাই বলিব যে, মানবজাতি চিরদিন তাহার বর্ত্তমান অন্যায়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে না, যদি উহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার সত্যকার অভিপ্রায় থাকে, তবে উন্নতচেতা মানবগণ অবশ্যই তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। কিন্তু যদি এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা অন্যায় না হয়, যেখানে সমাজের কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনায় ঢের বেশী একত্বসূত্রে আবদ্ধ, তাহা হইলে এ স্বপ্নকে

বাস্তবে পরিণত করার জন্য যাহা কিছু করা যায়, সে সবই করাও ন্যায়সঙ্গত হইবে।

সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়, যখন ইহা ব্যক্তির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অন্তরের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারে, এবং এই জ্ঞান জাগাইয়া তুলিতে পারে যে, প্রত্যেকটী মানুষের জীবনকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে হইবে। ব্যক্তির জীবন কাহারও একার ব্যাপার নহে; পৃথিবীর যাহা কিছুর প্রকৃত কোনও মূল্য আছে, তাহা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। এই নীতিই হইতেছে স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং হিংসাতন্ত্রের প্রবলতম প্রতিরোধক।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, আমাদের এই মতবাদের উদ্দেশ্য ভাল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁহাদের মনে হইতে পারে যে ইহা অনুসরণ করিতে গেলে ত প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক বিদ্যালয় না হউক, পৃথক পাঠ্যসূচী আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এ স্থলে আমরা আবার এই কথাই বলিব যে মানবজীবনের মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার পরিবর্ত্তন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেবল সামাজিক আবেষ্টনেই বিকাশ লাভ করে, সেখানে ইহা সকলের সম্মিলিত আগ্রহ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়। আমরা শুধু এইটুকু চাই, যেন এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবাধে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায়; বিরুদ্ধ প্রভাবের চাপে উহা যেন আদর্শচ্যুত না নয়। এমন ব্যবস্থায় দেখা যাইবে যে, কোনও ছেলেমেয়ের প্রকৃতি এরূপ যে তাহারা নির্জ্জনে একা থাকিতে ভালবাসে; তাহাদের সে স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানবসমাজ এবং বরণীয় চরিত্রের আদর্শের প্রভাব এত শক্তিমান যে এমন ছেলেমেয়েদের বিকাশও প্রচলিত ধারা হইতে খুব বিভিন্ন হইতে পারিবে না। ব্যক্তিতা ও খামখেয়ালীপনা এক বস্তু নহে। শিক্ষক মহাশয়কে নিজ ইচ্ছানুযায়ী চেষ্টা করিয়া ব্যক্তিতার সৃষ্টি করিতে হইবে না; শিশুর প্রকৃতিতে যে সকল বৃত্তি নিহিত আছে, উহার মধ্যে যা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা সবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, তাহাকে অবাধভাবে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ দেওয়াই হইল তাঁহার কর্ত্তব্য।

শিক্ষার যে সংজ্ঞা আমরা দিতেছি, তাহা এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, আপন সাধ্যমত উহার সদ্ব্যবহার করিবে। এই বিশ্বজনীন আদর্শ, মানুষের প্রকৃতি ও বুদ্ধি, উভয়ের দ্বারাই সমর্থিত। বস্তুতঃ এই স্বাধীনতাই জগতে সকল মঙ্গলের উৎসস্বরূপ, ইহাকে বাদ দিলে কর্ত্তব্যের কোনও অর্থ থাকে না, আত্মবিসর্জ্জন হয় মূল্যহীন, কর্ত্তৃত্বেরও কোনও সমর্থন থাকে না। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াই জগতের জাতিসমূহ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে মিলিত হইবে, সকলে মিলিয়া ভগবানের রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। গীতাতেও এই কথা রহিয়াছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।"

শিক্ষার জন্য ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র আদর্শ লওয়া চলে না, আবার ইহা অপেক্ষা মহত্তর কোনও আদর্শও হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন ও ব্যক্তিতা

পূর্ব্ব অধ্যায়ের মূল বিষয়টি এক কথায় এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিতাই (individuality) হইল জীবনের আদর্শ। আদর্শ কথাটির দুইটি তাৎপর্য্যই এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আদর্শ বলিতে প্রথমতঃ বুঝায় যে ইহা মানুষের প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল, আর দ্বিতীয়তঃ ইহা সেই চেষ্টার সাফল্য বিচারেরও মান। আবার মানুষ ক্রমাগত ইহার দিকে অগ্রসর হইয়া চলে, কিন্তু কখনও ইহাতে পৌঁছিতে পারে না। ইহার স্বরূপ কি, তাহাই এখন দেখা যাক।

এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে পূর্ব্ব অধ্যায়ে মানুষের জীবন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে তুলনা করা হইয়াছে, সেটি আর একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিলে সুবিধা হইবে। কারণ, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যেমন একদিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সাধনই হইল সকল শিল্প রচনার লক্ষ্যস্থল, তেমনিই যে কোনও শিল্পবস্তু, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র বা মূর্ত্তি, শিল্পীর ব্যক্তিতারই আংশিক অভিব্যক্তি। সুতরাং এ কথা বুঝা কঠিন নয় যে, প্রাণীজীবনের সকল ক্রিয়াতেই যে লক্ষণসমূহ আছে, সেগুলিরই সফল ও শক্তিব্যঞ্জক রূপ শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও দেখা যায়।

ইহার প্রধান বিশেষত্বগুলি সহজেই ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, শিল্পী নিজ উপকরণগুলির সাহায্যে এক মূল পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, সেগুলির কোনটিই দৈবক্রমে বা বৃথা আসে নাই, প্রত্যেকটিরই এক বিশেষ প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য আছে, আর এই নানা অংশগুলি সেইভাবে একটি আদর্শকেই ফুটাইয়া তুলে। সেগুলির বহুত্বের মধ্যে শিল্পকার যতখানি একত্বের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহার দ্বারাই তাঁহার সাফল্যের মান নির্ণীত হয়, ও উহার অভাবে তাঁহার ব্যর্থতাই সূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের সৃষ্টি-

কার্য্য স্বয়ংচালিত (autonomous)। অবশ্য এ কথা বলিতে ইহা বুঝায় না যে, কবি ব্যাকরণ বা যুক্তির ধার ধারিবেন না, বা সঙ্গীতকার সুর, তাল, লয় বিসর্জ্জন দিবেন, কিংবা চিত্রকর তাঁহার অঙ্কনবস্তুর আকার ও গঠনের কথা বিস্মৃত হইবেন। ইহার অর্থ এই যে, এ সকলের কার্য্যকরী প্রয়োগ তিনি কি ভাবে করিবেন, তাহার কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধান হইতে পারে না। যেমন কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারককে নিজ উপাদানগুলির গুণাগুণের কথা বিবেচনা করিতে হয়, আর বিজ্ঞানের বিধানগুলিও মানিতে হয়; কিন্তু এগুলি তিনি কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন, তাহা অন্য কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেনা। তাহা করিলে ত যন্ত্রটি তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেই উহা আবিষ্কার করিয়া দেওয়ার ব্যাপার হইল।

সুতরাং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই যে জীবনের আদর্শ, এ কথা বলিলে বুঝায় এই যে, আমাদের জীবন সমগ্ররূপে স্বয়ংচালিত; এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একত্ব সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমটির কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। আরও এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, স্বয়ংচালনা শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হইতেছে, নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে মানুষের স্বাধীনতার তাহাই প্রাণশক্তি। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, এ কথার অর্থে যদি বলা যায় যে সে নিজ প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে, তবে ভয়ানক ভুল হইবে। কিন্তু ইহার এ অর্থ খুবই সুসঙ্গত যে মানুষের জীবনের ধারা ঠিক কিরূপ হইবে, পূর্ব্ব হইতে তাহার কোনও নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া চলে না।

দ্বিতীয় যুক্তিটির অগণিত দৃষ্টান্ত মনুষ্যজীবনের সকল দিক হইতেই পাওয়া যায়। সমস্ত উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে বহুর মধ্যে একত্ব সাধন। সমগ্র ক্রিয়াটির মধ্যে ছোট বড় নানা চেষ্টা ও চিন্তা থাকে, সেই সবগুলির সমন্বয়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। শিশুর একটি বল লুফিবার চেষ্টার মত সাধারণ কাজই হউক, বা শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিশারদের পৃথিবীব্যাপী ক্রিয়াকলাপই হউক, সকলেরই মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার ইহাই সকল জ্ঞানেরও মূল; অতি সাধারণ বস্তু বা ঘটনা, যেমন টেবিল, চেয়ার বা চলন্ত মোটরগাড়ী প্রত্যক্ষ করার সম্পর্কেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে, আবার গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি, দর্শনশাস্ত্রের নীতি আয়ত্ত করার বিষয়েও হইতে

পারে। এই যে একত্বের মানুষের ক্রিয়া বা বোধশক্তিতে প্রকাশ, তাহা ব্যক্তির সত্তার একত্বেরই আংশিক রূপ মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাণীজীবন সম্বন্ধে এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। আমরা ব্যক্তিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রয়োগ শুধু মানুষের সচেতন প্রকৃতি বা মন সম্বন্ধেই করা হইয়াছে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সে বিধিগুলি মানুষের দেহ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। শুধু তাহাই নহে, সকল প্রাণী, এমন কি উদ্ভিদের দেহ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। কারণ, প্রাণের প্রথম সঞ্চার অবধি দেহের বৃদ্ধির মধ্যে একই উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; দেখা যায় যে, অনেকগুলি পৃথক অংশ পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দেহের বিকাশের শেষ পর্য্যায়ে উহার যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়, মনের তুলনায় তাহা খুব সামান্যই কম। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাণীজীবনের প্রধান ক্রিয়াসমূহের কারণ আমরা যাহাই বলি না কেন, তাহা সমানভাবে দেহ ও মন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইবে। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের দেহ যেহেতু জড়পদার্থে গঠিত, সে জন্য পদার্থ-বিদ্যার নিয়মসমূহে সমগ্র জীবনের ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা যাইবে, না যেহেতু আমাদের দেহ প্রাণবন্ত, অতএব যেখানে প্রাণের বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্পষ্ট আকারে জানা যায়—অর্থাৎ মনের সংজ্ঞাত জীবনে, সেখানেই দেহের ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে?

প্রশ্নটি গুরুতর দাঁড়ায় এই কারণে যে, বৈজ্ঞানিকেরা, বিশেষতঃ শারীর-বিদ্‌গণ, দেহের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণভাবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের তথ্য সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের এরূপ মনোভাব বা ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক—কারণ, প্রাণীদেহ অঙ্গার, বাষ্পজান, অম্লজান, ইত্যাদি সুপরিচিত রাসায়নিক উৎপাদনে গঠিত। এগুলির সংমিশ্রণ শরীরে যেমন আছে, তাহা পরীক্ষাগারেও করা যায়। সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে শারীরবিদেরা দেহকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন উদ্ভূত এক অতি জটিল যন্ত্র মনে করেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের যুক্তি ডেকার্ট (Descartes) প্রদত্ত

মতবাদের অনুরূপ। ডেকার্ট বলিয়াছিলেন যে, মানুষকে অতি দক্ষভাবে পরিকল্পিত এক যন্ত্রই গণ্য করা যাইত, যদি আমরা মানসিক অনুভূতি দ্বারা না জানিতাম যে তাহার আত্মা বা প্রাণ আছে।

ডেকার্ট অন্ততঃ নীতির দিক হইতে এমন সিদ্ধান্ত করিতে ছাড়েন নাই যে অন্য যে সব জীবের বেলায় উহাদের প্রাণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহাদের জীবদেহধারী যন্ত্রের বেশী কিছু মনে করার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি এইরূপ বলিতেন যে, কুকুর মার খাইলে যে শব্দ করে, ও ঘণ্টায় আঘাত করিলে যে ধ্বনি নিঃসৃত হয়, উভয়ই একশ্রেণীভুক্ত। কুকুরের চীৎকার যে বেদনাপ্রসূত, তাহার প্রমাণে বাধ্যতামূলক কোনও যুক্তি নাই। বর্ত্তমান সময়ে কোনও জীববিৎ অন্ততঃ উচ্চতর প্রাণী-সমূহের বেলায় ঠিক এতদূর অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু এ দ্বিধার জন্যই তাঁহারা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন। কারণ, হয় তাঁহাদের মানিয়া লইতে হইবে যে জীবের মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক চিরদিনই অজ্ঞাত থাকিবে, আর নয় ত মানসিক ক্রিয়াকলাপও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধীন।

এই সকল 'প্রাণীজীবনের যান্ত্রিক মতবাদের' (mechanistic conception of life) সমর্থকগণের অধিকাংশই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি মানিয়া লইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সাহসের না হইলেও সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিবার মত দুঃসাহসের অভাব হয় নাই, এমনও কেহ কেহ আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলেন লোয়েব (Loeb)। তাঁহার পরীক্ষাসমূহের ফলে তাঁহার মনে এই আশা জন্মে (ইহাকে উত্তম আশা বলা হয়ত চলে না) যে, জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল মানসিক ক্রিয়াকলাপ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, অধ্যবসায়, নৈরাশ্য, দুঃখভোগ, এ সকলের কারণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। আবার মনোবিদেরা কিন্তু স্বভাবতঃই ইহা চাহেন না যে মানসিক ক্রিয়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধিকারভুক্ত হউক। এইজন্য, বিজ্ঞানের সুসঙ্গত দাবীর পক্ষেও যাহা সন্তোষজনক হইবে, আবার প্রাণীর জীবনে মনের প্রাধান্যও অক্ষুণ্ণ রাখিবে, এমনই এক মতবাদ গঠনের জন্য তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের

মধ্যে এই যে ভয়ানক বিরোধ, বহুসংখ্যক কর্ম্মীর শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে ইহার মীমাংসার আশা হইয়াছে। পেনসিলভ্যানিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেনিংসের (Jennings) প্রচেষ্টা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ইঁনিও তাঁহার মতাবলম্বী অধিকাংশ লোকের ন্যায় প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতম প্রাণীসমূহের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রাণীর জীবনকে যদি রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রতিক্রিয়ারূপে বিশ্লেষণ কোথাও করা যায়, তবে তাহা এই ক্ষেত্রেই সম্ভব; আর জেনিংসের প্রথম গবেষণাগুলি স্পষ্টই যান্ত্রিক মতবাদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের রীতিনীতির সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অতি সামান্য স্তরের প্রাণীজীবনেরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। প্রাণীর জীবনে অবশ্য রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ক্রিয়া সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন কবিতার মধ্যে ব্যাকরণের প্রভাব থাকিলেও, কবিতাটি শুধু ব্যাকরণশুদ্ধ বাক্যের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী, তেমনি সামান্য কীটাণুর ক্রিয়াকলাপও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নচালিত যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরেরই হইবে। এক কথায়, তুচ্ছতম জীবও স্বয়ংচালিত।

জেনিংস ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের এই সমস্ত গবেষণায় আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে নিম্নতম কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাণীই হইল শক্তির কেন্দ্র; তাহারা সদাসর্ব্বদা জগতের সহিত সক্রিয় সংস্পর্শে আসিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে নিজস্ব স্বাধীনভাবও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কিন্তু নিখিল প্রাণীজগতে একত্ব থাকিলেও একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, উৎকর্ষের দিক দিয়া প্রাণীজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নতম পর্য্যায়ের প্রাণীর পৃথিবীর সহিত পরিচয়ের সীমা অতি সঙ্কীর্ণ। তারপর যত উচ্চে উঠা যায়, প্রাণীর ক্রিয়াকলাপেও ততই অধিকতর জটিলতা আসে, তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। ইহারই সর্ব্বোচ্চ স্তরে আছে মানুষ। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ধরাছোঁয়া ও প্রত্যক্ষের অগম্য, উহারই দ্বারা সে চালিত হয়; অতীত ও ভবিষ্যতের কথা

সে ভাবিতে পারে, এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, উভয়বিধ বিষয় দ্বারাই তাহার জীবনযাত্রা পরিপুষ্ট হয়।

সুতরাং, আলোচনার শেষে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, একটু আগে প্রাণীজীবনের যে দুইটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সজ্ঞান মানসিক ক্রিয়াঘটিত ব্যাখ্যাটিই অতি অবশ্য অনুসরণ করিতে হইবে। উহাতে ধরা হইয়াছে যে সব চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্তিত্বেও কেবল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্রিয়া ছাড়াও আরও কিছু আছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে প্রাণীজীবনের অগ্রগতির মধ্যে ব্যক্তিতার বিকাশ সাধনের এক ক্রমাগত চেষ্টা চলিতেছে, আর তাহার স্পষ্ট ও পরিণত অভিব্যক্তি আছে মানুষের চেতন প্রকৃতিতে। সুতরাং এই শেষ লক্ষ্যস্থলেই উহার প্রথম প্রচেষ্টাসমূহের আসল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই সিদ্ধান্তের দুইটি গুরুতর তাৎপর্য্য সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমটি হইল এই যে প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষাদানের যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, উহা প্রাণীজীবনের তত্ত্বসমূহ দ্বারা সমর্থিত। যে শিক্ষা ব্যক্তিতার পরিণতি সাধন করিতে পারে, কেবলমাত্র সেই শিক্ষাই স্বাভাবিক বিধিসম্মত। দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তিতা অর্থে শুধু মানসিক ক্রিয়াগুলি ধরিলে উহার অর্থ অন্যায়রূপে সঙ্কীর্ণ করা হইবে। প্রাণীর সমগ্র সত্তা, তাহার দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই ব্যক্তিতা কথাটি প্রযোজ্য। বালক বালিকার মনের বিকাশের মধ্যে যে প্রক্রিয়াটি আমরা দেখিতে পাই তাহা উহাদের সমগ্র জীবন সম্পর্কিত একটি প্রক্রিয়ারই সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি।

আরও বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে জীবের ব্যক্তিতায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। প্রথমতঃ প্রাণীজীবনের সর্ব্বাংশে একটি লক্ষণ পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহা হইতেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্ত্তন করিবার ও নূতন অভিজ্ঞতা পাইবার অবিরত চেষ্টা। আমাদের ক্রিয়াসমূহে যে চেষ্টা, গতি বা অভীষ্টসিদ্ধির এক অনুভূত আগ্রহ আছে, তাহারই মধ্যে এই লক্ষণটি আমরা বুঝিতে পারি। ইহাকে মনোবিদেরা ইচ্ছা (conation) বলেন, এবং যে সংজ্ঞাত ক্রিয়াসমূহের মধ্যে এই আগ্রহ বর্ত্তমান থাকিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্ব সাধন করে, সেগুলির নাম ইচ্ছামূলক ক্রিয়া (conative process)।

বোস্যাঙ্কোয়েট (Bosanquet) ইহার নাম দিয়াছিলেন, "সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীলতা ও প্রগতিশীলতা" ; যেমন, পাঠক যে এই উক্তিটি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা এক ইচ্ছামূলক ক্রিয়াসমষ্টি। অনেকগুলি জটিল মানসিক ক্রিয়া ইহার মধ্যে এক স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এখন এরূপ অবশ্যই হইতে পারে, যে প্রাণীর ক্রিয়াপ্রচেষ্টা যে লক্ষ্যের প্রতি নিয়োজিত হইতেছে, প্রাণীটি সে সম্বন্ধে সচেতন নহে। অতি ক্ষুদ্র জীবের ক্ষেত্রে ত এরূপ সজ্ঞাত উদ্দেশ্যের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিষও এস্থলে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পুস্তকপাঠ যে ইচ্ছামূলক প্রক্রিয়া (conative process), সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যেও চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গের এমন অনেক ক্রিয়া ও ভঙ্গী আছে যেগুলি আমাদের চেতনা সহকারে হয় না—উহাদের ইচ্ছাপ্রসূত বলা চলে না ; কিন্তু তথাপি সেগুলির সাধারণ লক্ষণ ইচ্ছামূলক ক্রিয়ারই মত। পাঠকের চক্ষুর কার্য্য চক্ষুস্থিত চশমার ন্যায় যন্ত্রবৎ নহে। ইহা প্রাণধারী জীবের লক্ষ্যমূলক ক্রিয়া, যে জীবের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বয়ংচালনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই সমস্ত অভিপ্রায়চালিত প্রক্রিয়াকে (purposive process) ইচ্ছামূলক বলা চলে না, কারণ ইহাদের স্থান চেতনার বহু নীচে। তথাপি যদি কোনও অমানুষী দর্শক আমাদের মানসিক ক্রিয়াসমূহকে ঠিক শারীরিক ক্রিয়ারই মতই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ইহাই লক্ষ্য করিবেন যে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রক্রিয়া একই শ্রেণীভুক্ত। উভয়ের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ প্রকৃতি তাহাদের সমান। অর্থাৎ ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিছক যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতে উভয়েরই প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ এই যে, এগুলির মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই যে প্রেরণা বা প্রচেষ্টা, ইহা মনুষ্য ও উচ্চতর প্রাণীগণের সংজ্ঞাত কার্য্যেই হউক বা নির্জ্ঞাত দৈহিক ক্রিয়াতেই হউক, অথবা নিম্নতর জীবসমূহের সম্ভবতঃ নির্জ্ঞাত ক্রিয়াকলাপেই ইহা অভিব্যক্ত হউক, ইহার একটি নাম আমরা দিতে চাই, 'এষণা' (horme')। এই অর্থে প্রাণীর সমস্ত অভিপ্রায়যুক্ত ক্রিয়া এষণাপ্রসূত। তাহারই মধ্যে একটি শ্রেণী হইতেছে ইচ্ছাচালিত

ক্রিয়া, যে সব জীবের উপলব্ধি বা 'জ্ঞান' আছে, ইহা শুধু তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ সকল জীবের মধ্যেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিবার এক অন্তর্নিহিত স্পৃহা দেখা যায়। প্রাণীর অভ্যাসগঠন, শারীরিক বিকাশ ও কার্য্যকলাপ, প্রবৃত্তি (instinct), বংশগতি (heredity) ইত্যাদি ব্যাপারগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাদিগকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাদের একটি পরিচয় অতি সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় স্মৃতির (memory) মধ্যে। অতি সুস্পষ্টভাবে কথাটি বলা হইল এইজন্য যে, বর্ত্তমান ঘটনায় যে অতীতের কোনও ব্যাপার প্রকাশ পাইতেছে বা তাহার কোনও প্রভাব রহিয়াছে, এই কথা আমরা কেবল স্মৃতির বেলায়ই প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারি। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অতীতকে ফুটাইয়া তুলার এই যে প্রেরণা রহিয়াছে, উহা সজ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, উহার একটি নাম দেওয়া যাইতে পারে, স্মৃত্যুপস্থান* (mneme) বা সহজভাষায় স্বতঃস্মৃতি।

মানবের ক্রমপরিণতির বিষয়ে আলোচনা করিবার সময়ে এই এষণা ও স্মৃত্যুপস্থান বা স্বতঃস্মৃতির কথা আমাদের প্রতি পদেই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রাণীজীবনের সমস্ত ক্রিয়ার মূল অংশ এইগুলি, সুতরাং এইগুলির প্রকৃতি ও বাহ্যরূপ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে অনুশীলন করা প্রথমেই আবশ্যক। তাহা পরবর্ত্তী তিনটি অধ্যায়ে আলোচ্য। তবে সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, মনোবিদ্যার এক আধুনিক শাখার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হইবে। উক্ত মতবাদে প্রাণীর জীবনে চেতনা বলিয়া যে কিছু আছে তাহাই কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এইভাবে চেতনার স্থান লইয়া মনোবিদ্যার যা কিছু বিরোধ, তাহার অবসান ঘটান গিয়াছে। এই নব মনোবিদ্যার নাম চেষ্টিতবাদ (behaviourism)। ইহার প্রধান সমর্থক ওয়াটসন (Watson) বলেন যে যেগুলিকে আমরা চেতনার বিষয় বলি, তাহার আদৌ অস্তিত্ব যদি বা থাকে ত সেগুলি কেবল অন্তরের জিনিষ। অর্থাৎ কোনও বিষয়ে অনুভূতি যাঁহার, একমাত্র

* শব্দটি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে গৃহীত।

তিনিই উহার কথা অবগত হইবেন। কিন্তু এরূপ অন্তরের ব্যাপার বিজ্ঞানের ভিত্তি হইতে পারে না। বিজ্ঞানের চাই বাহ্য বস্তু, অর্থাৎ তথ্যগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যে, যাঁহারই উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষা আছে, তিনিই সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া লইতে পারিবেন। তাই চেষ্টিতবাদে বলা হইয়াছে যে, যদি মনের ব্যাপারে চেতনাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইত, তবে মনোবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনই হইতে পারিত না, কারণ চেতনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাই। অথচ আসলে তাহা নহে, অর্থাৎ চেতনাই মনের একমাত্র প্রমাণ নহে। আমি আমার পোষা কুকুরটির চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তাহার মনঃসম্পর্কিত কথা ত আমি সহজেই বলিতে পারি। যেমন, আমি বলি যে কুকুরটি জানিতে পারিয়াছে যে, এখন আমি তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইব। আবার, কোনও ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছে বা ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এরূপ স্থলে তাহার মনোভাব জানিবার জন্য সচরাচর তাহার বলার অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। বরঞ্চ অনেক সময় মানুষ নিজ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বলে, তাহার চেয়ে, তাহাদের আচরণে যাহা বোঝা যায়, তাহাই আমরা অধিক বিশ্বাস করি। কারণ, কথার চেয়ে ক্রিয়ার দ্বারাই লোকের পরিচয় পাওয়া যায় বেশী এবং নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার দুর্ব্বলতা মানুষের যথেষ্ট আছে। সুতরাং প্রাণীদের বেলায় তাহাদের মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে লইলে তাহাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করা ও উহার তাৎপর্য্য বুঝাই একমাত্র পন্থা। মানুষের বেলাতেও আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে এই পদ্ধতিই সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়া থাকি। চেষ্টিতবাদে এই পদ্ধতিকেই বিজ্ঞানসম্মত করা হইয়াছে ; এবং মনুষ্যজীবনে মানসিক ব্যাপার বলিয়া যাহা কিছু কথিত হয়, তাহারই বিশ্লেষণে এই প্রণালীটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই পদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ ভয় প্রক্ষোভ (emotion) সম্পর্কে ওয়াটসনের পরীক্ষাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে এগার মাস বয়স্ক এক শিশু জোরে শব্দ শুনিলে বা নিজে হঠাৎ স্থানচ্যুত হইলে ভয় পাইত। একটি শাদা ইঁদুর কাছে আসিলে সে ভয় পাইত না, বরং তাহার গায়ে হাত দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বার কয়েক ইঁদুরটি

শিশুর নিকটে আনার সঙ্গে সঙ্গেই এক লোহার ডাণ্ডায় হাতুড়ির ঘা দিয়া আওয়াজ করা হইল। ফলে শব্দজাত ভয়টি ইঁদুরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গেল। যে ইঁদুর পূর্ব্বে আকর্ষণের বস্তু ছিল, সে এখন ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। ইহার ব্যাখ্যা এই দেওয়া হয় যে, কেবল শব্দটির সঙ্গে যে ভয় প্রথমে সংযুক্ত ছিল, তাহা প্রথমে শব্দ এবং ইঁদুর এই সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হইল, পরে দ্বিতীয় জিনিষটি, অর্থাৎ ইঁদুর, একাই সেই সাড়া জাগাইতে সমর্থ হইল। বিজ্ঞানের ভাষায়, শিশুটির ইঁদুরসম্পর্কিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া (emotional response) শব্দের অনুষঙ্গে (association) সাপেক্ষ (conditioned) হইল (পরে চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পরে দেখা গেল খরগোস বা অন্য যে কোন লোমবহুল প্রাণী দর্শনেই শিশুটির ভয়ের সঞ্চার হয়।

পাঠকগণ একথা স্বীকার করিবেন যে চেষ্টিতবাদের এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রথম দিকে শিশুর মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও চেষ্টিতবাদের সাহায্যে চিন্তার ন্যায় মানসিক ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যা হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ চিন্তা হইল মনের ভিতরকার ক্রিয়া, ইহার অস্তিত্ব শুধু চেতনার মধ্যে। ওয়াটসন ইহার উত্তরে বলেন যে চিন্তাকে বাক্‌যন্ত্রেরই অতি সূক্ষ্ম সুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ারূপে গণ্য যদি করা যায়, তাহা হইলে চেষ্টিতবাদের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যাও সম্ভব। এমন কোনও মতবাদ যে মানিয়া লওয়া যায় না, আর চেষ্টিতবাদে সজ্ঞান চিন্তা বা চেতনারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে চেষ্টিতবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। যেমন ইহাতে দেখা যায় যে প্রাণীর উচ্চতর ও নিম্নতর ক্রিয়াসমূহ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং উহা দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য যুক্তি সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি ওয়াটসনের চেষ্টিতবাদের সকল কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। আমাদের ইহাই মনে করিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ (perception), অনুভূতি (feeilng), জ্ঞান (knowledge), প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা চালিত হইলেও মানবজীবনে এগুলির নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনের শক্তি

এষণা (hormé) সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে অচেতন পদার্থ হইতে প্রাণধারী জীবের প্রভেদ যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, এষণাই সেগুলির মূল। সুতরাং প্রত্যেক জীবের আপন পরিবেশ সম্বন্ধে নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা যাহা বলিয়াছি, এষণা তাহারও মূলে আছে। স্বাধীন শব্দটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। জীবের স্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে, সে জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে। পরিবেশ হইতে নিজ খাদ্য গ্রহণ না করিয়া সে বাঁচিয়া থাকিতেই পারে না। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিক হল্‌ডেনের (Haldane) এই কথাই মানিয়া লওরা যায় যে, প্রাণধারী জীবের নিজ পরিবেশের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহাই হইতেছে প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান প্রভেদ। প্রাণীর মানসিক ক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে, বহির্জগতের সহিত অনবরত সংস্পর্শ না ঘটিলে এগুলির বিকাশ বা অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সম্ভবপর নহে। সুতরাং এক হিসাবে জীব যদিও জগতেরই অংশ মাত্র, তাহা হইলেও সেই জগতের সম্মুখেই আজীবন সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়, প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়! আমাদের মধ্যে যিনি মোটেই সপ্রতিভ নহেন, তিনিও বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের সংজ্ঞাত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে এই ভাবটি বলবৎ রহিয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সময়ে আমরা জগৎকে খোলাখুলি বা পরোক্ষভাবে এই কথাই বলি, "আমার অস্তিত্ব আছে, সে কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; আমি যতদূর সম্ভব নিজের পথেই চলিতে চাই, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথেই যে চলিব, তাহা নহে।" আমাদের দেহও আপন ধরণে সেই কথা বলে। সমগ্র জীবজগতের সকল স্তরে এই আচরণরীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীটাণুর মধ্যে ইহা ক্ষীণ ও উপলব্ধিবিহীন বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা (will to live) মাত্র। আর মানুষ সজ্ঞানে এই দাবী করে যে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাহার নিজের হাত আছে।

মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি যে, স্বীয় পরিবেশের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জীব যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করে, উহার পরিচয় আমরা দুই শ্রেণীর ক্রিয়াতে পাই, সংরক্ষণমূলক ও সৃষ্টিমূলক। এই দুইটির প্রভেদ সহজেই বুঝা যাইবে। আগে দেহের দিক ধরা যাক। যে বিস্ময়কর শারীরিক ক্রিয়া-শৃঙ্খলা জীবন ও স্বাস্থ্য বজায় রাখে, যেমন রক্তের উত্তাপের ও শ্বাসক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা, বিপাকের (metabolism) ক্রিয়া, গ্রন্থি ও ভিটামিনসমূহের অদ্ভুত কর্ম্মতৎপরতা, এগুলিকে সহজেই সংরক্ষণমূলক বলা চলে। অপরদিকে শারীরিক বৃদ্ধিসম্পর্কিত ব্যাপারগুলিকে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত ধরা যায়। একটি মাত্র কোষ (cell) হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল প্রাণী সৃষ্টির বিস্ময়কর বিধানে ক্রমশঃ এক বিশিষ্ট রূপসম্পন্ন দেহ গড়িয়া তুলে। প্রাণীর রূপ সর্ব্বদা পূর্ব্বপুরুষের মতই হইয়া থাকে ; তাহা হইতে আমাদের এই কথাই মনে পড়িয়া যায় যে এক্ষেত্রে এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই এষণা এবং স্মৃত্যুপস্থান সংযুক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি যে যথার্থ ই সৃষ্টি-মূলক প্রক্রিয়া, সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

মনের দিকে সংরক্ষণশীলতার ক্রিয়া সূক্ষ্মতর হইলেও কিছু কম নহে। আমাদের প্রত্যেকের 'আমিত্ব' বোধের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, এই বোধ সচরাচর আমাদের জীবনের সমুদয় ঘটনা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এটি হারানোর মত (যেমন মস্তিষ্কবিকৃতির অবস্থায়) ভয়ানক বিপদ কমই আছে। তাহা ছাড়া, আমরা পরিচিত কার্য্যকলাপ ও সামাজিক আবেষ্টনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। আমাদের পুরাতন অভ্যাস, বন্ধুবান্ধব, পুস্তক, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি আমাদের অনুরাগ দেখা যায়। এ সবের মধ্যেও এই অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি উপন্যাস নাটক কবিতা লিখেন না, সুরসৃষ্টি করেন না, নূতন যন্ত্র আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করেন না, এমন লোকের কাজকে সৃষ্টিমূলক বলিলে তিনি দৃঢ়ভাবে তাহা অস্বীকার করিবেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এই মনোভাব ভ্রান্ত। উদাহরণ স্বরূপ, কথা বলার বিষয় ধরা যাক। শিশু এই যে ক্রিয়াটি শিখে, তাহার পশ্চাতে সমগ্র জাতির বিপুল এক সৃষ্টিমূলক সাধনা আছে। তাহার বিকাশ শতাব্দীর

পর শতাব্দী ধরিয়া চলিলেও, বিশেষ কোনও একটি সময়ে উহার আকার অপেক্ষাকৃত স্থিরই থাকে। ছোটবেলাতেই শিশু ভাষায় প্রচলিত নিয়মগুলি শিখিয়া লয়, অবিরাম পুনরুক্তিদ্বারা সেগুলিকে আয়ত্ত করে। কিন্তু এইভাবে বহুকাল হইতে সংরক্ষিত ভাষার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া তাহার প্রয়োগ সে কি ভাবে করিবে, তাহা পূর্ব্বে বলা যায় না। অতি বুদ্ধিহীন লোকও নিজ প্রয়োজন, আকাজ্ক্ষা ও ভাবসমূহ প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ইহার নূতন নূতন প্রয়োগ করিবে। এই ক্রিয়াগুলি ক্ষুদ্র হইলেও অভ্রান্তভাবে সৃষ্টিমূলক। কথা বলার বেলায় যেমন, তেমনই আমাদের মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের অন্য সকল দৈনন্দিন ক্রিয়ার পক্ষেও এই কথাই খাটে। বস্তুতঃ আমাদের খুব সামান্য পর্য্যায়ের সংরক্ষণমূলক কার্য্যকলাপেরও সৃষ্টিমূলক দিক সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। অপর দিকে আবার সংরক্ষণমূলক অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়া কোনও সৃষ্টিমূলক কার্য্য হইতে পারে না। যে গণিতজ্ঞ গণিতের এক নূতন প্রতিজ্ঞা (theorem) আবিষ্কার করেন, তাঁহাকেও প্রচলিত গুণের নামতা মনে রাখিতে হয়। পুরাতন তথ্যের নবরূপ দিয়া বা বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি হইতে থাকে। সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পে যিনি নবধারার প্রবর্ত্তন করেন, তিনি পুরাতনের যতটা বাদ দেন, তাহার চেয়েও বেশী রাখেন নিজ নূতন সৃষ্টির মধ্যে। এক কথায় যাবতীয় আত্মসাম্মুখ্যের ক্রিয়ার অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করার (self-assertion) মধ্যে সংরক্ষণ ও সৃষ্টি দুই বর্ত্তমান আছে। আর কোনও কার্য্য সৃষ্টিমূলক বা সংরক্ষণমূলক কোন শ্রেণীতে পড়িবে, সে বিচার করিতে গেলে এই কথা ভাবা চলে না যে কার্য্যটিতে সৃষ্টি বা সংরক্ষণ প্রয়াস, উভয়ের একটির অস্তিত্ব আছে বা নাই ; ক্রিয়াটিতে কোনটির তুলনা-মূলক প্রাধান্য বেশী, তাহাই ভাবিতে হইবে।

যে শক্তি মানবসমাজের ভিত্তি দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াসমূহই তাহার প্রাণস্বরূপ। এই পুরাতন কথাটির সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে, উদাহরণস্বরূপ কোনও কর্ম্মব্যস্ত আধুনিক নগরের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই চলিবে। সকালে উঠা, ব্যবসায়বাণিজ্য, বিদ্যালয় ও কর্ম্মস্থলে যাওয়া, খেলাধূলা, বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের নিয়মিত সময়তালিকা ; যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছিবার জন্য রেলগাড়ী, ট্রাম ও বাসে যাতায়াতের

সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা এবং সকল অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা, এ সকল ক্রিয়াব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের মধ্যে পুরাতন ও পরিচিত জিনিষগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার এক বিশেষ আগ্রহ আছে।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের জীবনধারায় এই স্থায়ী সংরক্ষণশীল ভিত্তির মধ্যেই সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াও চলিতে থাকে। গভীর স্তরের সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াগুলির ন্যায় ইহা নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নহে, নিজের অর্থাৎ ব্যক্তির 'আমিত্ব' বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ব্যক্তিগত শক্তি প্রতিভা প্রকাশ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়। আদিম বা অনুন্নত সমাজে কেহ যদি এই সকল সৃষ্টিমূলক গুণের পরিচয় দেন, তবে তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তা সত্ত্বেও অতীতে মাঝে মাঝে এমন পরিচয় অবশ্য দেওয়া হইয়াছে। কোন সমাজই সম্পূর্ণ নিশ্চল নহে, এক একবার কোনও শক্তিশালী পুরুষ ও তাঁহার অনুগত সাহসী অনুচরদের দ্বারা উহার উন্নতি ঘটিয়া থাকে। প্রাগৈতিহাসিক কালের এরূপ বহু উন্নতি মনুষ্যজাতির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, মানবের জয়যাত্রার এগুলি এক একটি বিজয়স্তম্ভস্বরূপ। যেমন, উদ্ভিদ্ ও পশুপালন, ধাতু আবিষ্কার ও ব্যবহার, নৌকার প্রথম প্রচলন, ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে দ্রুতগতিতে এই ধরণের বহুসংখ্যক অভিনব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এগুলির বিশেষত্ব এই যে, সামাজিক জীবনের সংরক্ষণশীল ভিত্তির পরিবর্ত্তন ইহারাই ঘটায়, এবং কালক্রমে উহার বাহ্যরূপ বলাইয়া দেয়। এই ভাবে বেতার, টেলিফোন ও বিমান বর্ত্তমান যুগে অতি সাধারণ বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ব্যবহার সভ্যজগতে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অংশ। অথচ এখনও এমন অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহারা এগুলির ব্যবহার প্রথম হইতে বিস্ময়ের সহিত, কখনও হয় ত বা একটু অস্বস্তির দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কবিতা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সৃষ্টিপ্রতিভার যথার্থ অভিব্যক্তি, ইহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও সেই সৃষ্টি ও সংরক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ দেখা যাইবে। যেমন, কবিতা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি যে কোনও যুগের মানুষের এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। উহার মধ্যে নূতন সৃষ্টি-প্রতিভার অভ্যুদয় হয়। তাহার প্রভাবে সে যুগে যাহা কিছু পূর্ব্ব হইতে

সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, সে সবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে, নবজীবনের আবির্ভাব হয়। আবার এই সব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি যথাকালে জাতির সংরক্ষণমূলক ভিত্তির মূল হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টিমূলক ও সংরক্ষণমূলক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ করা চলে না।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও শ্রেণীগত সমস্যাসমূহে এগুলির তাৎপর্য্য কি, সে আলোচনা আমরা পরে করিব। এখন শুধু দুটি কথা বলিলেই চলিবে। প্রথমটি হইল এই যে, জাতির সমগ্র জীবন ও সভ্যতার সংরক্ষণমূলক ভিত্তির সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে খানিকটা বোধ ও অনুরাগের সঞ্চার করা বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। এবং সে ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিবার শক্তিও যেন ছাত্রদের হয়। ইহা করিতে না পারিলে সে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, বিদ্যালয়ের এমন গুণ থাকা চাই, যাহার প্রভাবে ছাত্রগণের মনে জীবনে অন্ততঃ উৎসাহ জাগে, আর সেই সাহসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবও তাহাদের না হয়। নহিলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

এখন আমরা সকল এষণাচালিত ক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব। ক্রিয়াটি সৃষ্টিমূলক হউক বা সংরক্ষণমূলক হউক, দৈহিক, মানসিক বা সংযুক্তভাবে দেহ ও মনের সহিত সম্পর্কিতই হউক, সকলের মধ্যেই এই গুণটি বিদ্যমান। তাহা এই যে, জীবমাত্রেরই এষণাচালিত ক্রিয়াগুলি আপনা হইতেই একত্র মিলিয়া নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী ও শৃঙ্খলা গড়িয়া তুলে। এমনভাবে এগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হয় যে, উচ্চতর এষণামূলক ব্যবস্থার মধ্যে যেন তাহারা নিজস্ব পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পাঠকের এই বাক্যাংশটির অর্থবোধ করার চেষ্টা হইতেছে, এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য অনুধাবনরূপ বৃহত্তর এষণামূলক প্রচেষ্টার অংশ। সেটি আবার এই পুস্তকটি আয়ত্ত করিবার জটিলতর প্রচেষ্টার অংশীভূত। এই ক্রিয়াশৃঙ্খলা সম্ভবতঃ আরও উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কারণ পাঠককে হয়ত তাঁহার শিক্ষকতাবৃত্তিতে যোগ্যতালাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাসূত্র আয়ত্ত করিতে

হইতেছে। আবার এই শিক্ষার চেষ্টাও এক সুদীর্ঘ এষণাপ্রক্রিয়ার অংশমাত্র, যেটি তাঁহার সমগ্র শিক্ষকজীবন ব্যাপিয়া চলিবে।

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহার অন্তর্গত প্রক্রিয়াগুলি শুধু এষণামূলক নহে, ইচ্ছামূলকও বটে। অর্থাৎ এগুলি কোনও অনুভূত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সংজ্ঞাত (conscious) প্রচেষ্টা। কিন্তু ক্রিয়াশৃঙ্খলাটি অনুভূত হইলেও তাহার অংশীভূত সকল ক্রিয়াগুলিই যে উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা নহে। মনে করা যাক্ যে, এক ব্যক্তি কোনও বন্ধুর সাক্ষাৎ মানসে বাইসিক্লে চড়িয়া বাহির হইল। তাহার এই অভিযান ইচ্ছামূলক ক্রিয়া। বাইসিক্লে যাওয়ার ব্যাপারটিও সেই ক্রিয়ার অঙ্গীভূত আর এক ইচ্ছামূলক ক্রিয়া। কিন্তু বাইসিক্ল চালনার মধ্যে দেহ ও অঙ্গসমূহের বহু ক্রিয়া আছে। এগুলি সব ইচ্ছামূলক নহে, যদিও বাইসিক্ল চালনা শিক্ষা করিবার সময়ে এগুলি সেই শ্রেণীর ছিল। ইহার অধিকাংশ ক্রিয়াই প্রথমে সুস্পষ্টভাবে আরোহীর ইচ্ছা বা চেষ্টা দ্বারা চালিত হইলেও এখন স্বতশ্চালিত (automatic), অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় হইতেছে। যেমনই লোকটি বাইসিক্ল চালনায় দক্ষতা লাভ করিল, তেমনই এগুলি এক এষণামূলক ক্রিয়াশৃঙ্খলার মধ্যে সমগ্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইল।

এমন আমরা মানবজীবনের ইতিহাসে দুইটি পৃথক ধারার কথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব। প্রথমটি হইল তাহার এষণামূলক বৃত্তিগুলির পরিণতি। ইহার ফলে এই বৃত্তিগুলি প্রারম্ভে মাত্র শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ নির্জ্ঞান বা অতি অস্পষ্ট জ্ঞানের অবস্থা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাত ইচ্ছার পর্য্যায়ে উপনীত হয়। অপরদিকে এষণার পরিণতির ফলে তাহারা ক্রমশঃ বৃহত্তর ও জটিলতর এষণামূলক ক্রিয়াশৃঙ্খলারূপে শ্রেণীবদ্ধ হয়। মানুষ প্রথমে জননীদেহে ডিম্বকোষরূপে তাঁহারই শরীরের অংশমাত্র থাকে। অতি শীঘ্রই সে পরজীবী (parasite) রূপ প্রাপ্ত হয়। তখন মাতার শোণিত ও খাদ্যের দ্বারা সে পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু তখনই সে নিজস্ব সত্তা ও ভাগ্য লইয়া এক পৃথক প্রাণী হইয়া গিয়াছে। তাহার সৃষ্টি ও সংরক্ষণমূলক উভয়বিধ এষণাগুলি তখনও প্রধানতঃ উপলব্ধিবিহীন। যখন সে মাতৃশরীর ত্যাগ করে, তখন তাহার ইচ্ছামূলক ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইতে

থাকে; প্রথমে এগুলি থাকে অন্ধ বা প্রায় অন্ধ আবেগের মত, ক্রমশঃ হয় সুস্পষ্ট বাসনা। পরে এগুলিই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা ও তাহা হইতে ক্রমে বহুদূরাগত আদর্শ অনুসরণ করিবার সঙ্কল্পে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে এষণার এই অংশের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃত্তিগুলির সংগঠনে শ্রেণীশৃঙ্খলার পরিণতিও সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে। প্রথমে ইহা দেহের অবয়বগুলির পুষ্টি ও তাহাদের ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় সাধনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পরে ইহা দেখা যায় ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও সমন্বয়ে। এবং সর্ব্বোপরি মানুষেয় মধ্যে যে বিশাল ইচ্ছামুলক কর্ম্মশ্রেণী সংগঠিত হয়, তাহাতে ইহার পরিচয় আমরা পাই। ইহারই দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় এবং তাহার জীবনের সমগ্র সার্থকতা নিরূপিত হয়।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই দ্বিবিধ বিকাশের তাৎপর্য্যও দুই দিকে দেখা যায়। প্রথমতঃ, ইহারই ফলে শিশু বড় হইবার সময় বহির্জগতের সহিত নিত্য নূতন সংস্পর্শে আসিয়াও নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। অপরদিকে আবার ইহারই সহায়তায় সে নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই দুইটির মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি দ্বিতীয়টির অধীনে থাকিয়া উহার সহায়তা করে। শিশুর পরিণতির এই উভয় দিকের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক আছে, বিশেষভাবে আছে দ্বিতীয়টির সহিত, তাহা পুর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। এই জন্যই বলা হয় যে শিশুর মনে আগ্রহ বা সখ সৃষ্টি করা এবং বর্দ্ধন করাই হইতেছে শিক্ষার কার্য্য। আজকাল আর এ উক্তিটি কাহারও ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ কথাটির অর্থ ইহা নয় যে, বিদ্যালয় আমোদপ্রমোদের স্থান। ইহার অর্থ হইল এই যে, বিদ্যালয় শিশুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা দিবে। যে এষণাশ্রেণী এরূপ ক্রিয়ার উৎস, তাহা বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলে শিশু যখন বিদ্যালয়ের বাহিরের জগতে প্রবেশ করিবে, তখনও সে উহাকে কাজে লাগাইতে এবং উহার আরও পূর্ণতর পরিণতি সাধন করিতে পারিবে।

এষণামূলক ক্রিয়াকে যদি আমরা শারীরিক বা মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করি, তাহা হইলে এ কথা বলা যায় যে কোনও বিশিষ্ট

ভঙ্গী বা প্রকৃতির (pattern) মধ্যেই এ শক্তি প্রকাশ পায়। ধরা যাক যে এক ব্যক্তি রাস্তা পার হইতেছে। এ সময়ে হর্ণের শব্দে সে পিছনে মোটরগাড়ী আসিতেছে ভাবিয়া সতর্ক হইবে। সে যদি চিন্তামগ্ন থাকে, তবে সহসা এই শব্দে সে হয়ত মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইবে। কারণ ইহাতে মোটরগাড়ীর নিকটে আসার কথা সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইবে না। সেজন্য কোনও শৃঙ্খলাযুক্ত ক্রিয়ারও উদ্ভব হইবে না। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার মধ্যে এষণামূলক প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে। আত্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তি (self-preservation) এক সুস্পষ্ট ভঙ্গীকে প্রকাশ পাইবে। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী উহারই দ্বারা চালিত হইবে। এই ভঙ্গীর খানিকটা চিন্তামূলক (cognitive), কারণ লোকটি চিন্তা দ্বারা বুঝিল যে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিকে গাড়ীটি বেগে ছুটিয়া আসার ফলে তাহার জীবনের আশঙ্কা হইয়াছে। ইহার কতকটা আবার ক্রিয়ামূলক (active), কেন না তাহার শারীরিক ক্রিয়াগুলি এত বিশিষ্ট ধরণে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের শক্তিসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, নূতন নূতন আকার বা ভঙ্গীতে তাহাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়। আমাদের জীবন মূলতঃ সৃষ্টিমূলক বলিতে এই কথাই বুঝায়। কিছু পূর্ব্বে যে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার কথা বলা হইয়ছে, তাহার দ্বারাই প্রধানতঃ এই ভঙ্গী বা প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। এই ভঙ্গীসমূহ আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যেও দেখা যায়। আর ইহাদের অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ রাখাই হইল সংরক্ষণমুলক ক্রিয়ার কার্য্য। এইভাবেই পৃথিবীতে মানুষের সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, কারুকলা, শারীরিক ও ক্রীড়াগত দক্ষতা ও সাফল্য, ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা সত্য, সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠতা নামে অভিহিত করি, সে সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে।

পরবর্ত্তী আলোচনার সুবিধার জন্য আরও দুইটি বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ এষণার বৃত্তিসমুহ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তাহারা আরও জটিল হইয়া উঠে। তেমনই আবার সেগুলি অধিকতর অভিব্যঞ্জকতা (expressiveness) লাভ করে। অভিব্যঞ্জকতা বলিতে এখানে কি বুঝায় তাহা উদাহরণদ্বারা দেখা যাইবে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর ছবির অভিব্যঞ্জকতা দৃশ্যটির চেয়েও বেশী, অর্থাৎ উহার মধ্যে অধিক অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই।

তাহার কারণ দৃশ্যটির যে সমস্ত সৌন্দর্য্য সাধারণ দর্শকদের নজরে পড়ে না, নিপুণ শিল্পী তাঁহার সৃষ্টিকৌশলে সেইগুলিই তাহাদের চোখের সামনে ধরেন ; তেমনই প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকৃষ্ট চিত্রের অভিব্যঞ্জকতা নিকৃষ্ট আর একখানির চেয়ে বেশী। ঠিক এই ভাবেই শিশুর আগ্রহ ও অপর সমুদয় বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ পাইলে, প্রারম্ভে সেগুলি যেমন দেহ ও মনের কতকগুলি স্থূল ক্রিয়া মাত্র ছিল, তাহার তুলনায় অধিকতর অভিব্যঞ্জকতা লাভ করে। এই সূত্রে পূর্ব্বের এক উক্তির পুনরুল্লেখ করা যায়। তাহা এই যে, শিল্পীর উদাহরণেই আমরা প্রাণাজীবনের যেটি প্রকৃত ভঙ্গী ও আদর্শ, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই আসে। এই নীতির সফল প্রয়োগ যে শিক্ষায় হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহার সমর্থনে বহু যুক্তি এই গ্রন্থে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) নামক পদ্ধতিকে মনোবিদ্যার যে সব পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছে, উহা হইতে সমগ্র মানব মনের এষণামূলক ভিত্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে, আমাদের সংজ্ঞাত আচরণে এমন এষণামূলক বৃত্তিসমূহের বিশেষ প্রভাব আছে ; যেগুলি আমাদের উপলব্ধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত। অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছামূলক ক্রিয়া বলা হয়, প্রায়ই তাহা পূর্ণ সংজ্ঞাত ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে। উহার মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই এমন প্রেরণা থাকে, যাহার স্থান আমাদের অতি জটিল সত্তার নিম্নতর স্তরে। আবার অপরদিকে মনঃসমীক্ষণ হইতে এষণাবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ অতি সুন্দরভাবে বুঝা যায়। উহাতে আমরা দেখি যে বয়স্ক ব্যক্তির মনকে তুলনা করা চলে, একটি জীবন্ত বস্তুর যে বহির্ভাগটি আমাদের চোখে পড়ে, তাহার সহিত। নিম্নস্তরে যে এষণামূলক বৃত্তিসমূহ রহিয়াছে, সেগুলির উৎপত্তি শৈশবে বা তাহারও পূর্ব্বে। কোনও কোনও অবস্থায় ইহাদের সংযমশৃঙ্খলা ভাঙিয়া পড়ে, তখন এগুলির উদ্দাম রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল কথা স্বতঃস্মৃতি সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তাহাই এখন আরম্ভ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবন্ত অতীত

মানুষের সংজ্ঞাত জীবনে স্মৃত্যুপস্থান বা স্বতঃস্মৃতির সব চেয়ে স্পষ্ট পরিচয় তাহার স্মৃতিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেই মানুষের অতীত সঞ্জীবিত থাকে ; শুধু আমার কেন, আমার জন্মের বহু পূর্ব্বে যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের অতীত জীবনও এইভাবে বাঁচিয়া আছে। ইতিহাসকে বলা যাইতে পারে সামাজিক স্মৃতি, আর ইহাতে দেখা যায় যে, মানুষের বর্ত্তমান ক্রিয়াকলাপে অতীতের প্রভাব অনবরত চলিতেছে। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞাত জীবনে এমন বহু ক্রিয়া দেখা যায়, যাহার সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তি কথাটি প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, এ কথা যদি বলা যায় যে, পাঠক এই বাক্যটি পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার অন্তর্গত শব্দগুলির অক্ষরসমূহ স্মরণ করিতেছেন, বা শব্দগুলির অর্থ স্মরণ করিতেছেন, তাহা হইলে উৎকট শুনাইবে। কিংবা পথে যদি কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে এ কথা বলা চলিবে না যে বন্ধুর চেহারাটি স্মরণে আসিল। উপরের উদাহরণগুলিতে, স্মৃতিশক্তি এক সময়ে সংজ্ঞাতভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তা একটি উদ্দীপকে (stimulus) সাড়া দিলেন, অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণগোচর করিবার প্রয়োজন হইল না। তাই বলা যায় যে তিনি অংশটি পড়িলেন, কিংবা বন্ধুকে চিনিলেন বা শুধু দেখিতে পাইলেন।

ইতর প্রাণীদের কথা চিন্তা করিলে স্মৃতির চেয়ে বিস্তৃত অর্থসূচক শব্দের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক অনুভূত হয়। যেমন, ঘোড়া বা কুকুর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে অনেক কিছু শিখে। কিন্তু উহাদের সে শিক্ষায় সংজ্ঞাত স্মৃতির খুবই অল্প স্থান রহিয়াছে বলিতে হইবে। আবার নিম্নস্তরের প্রাণীদের কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সেক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি শব্দটি ব্যবহার করাই চলে না। তথাপি পরীক্ষাদ্বারা অভ্রান্তরূপে দেখা গিয়াছে যে, কোনও বিশেষ

অবস্থায় এই সকল প্রাণীরও আচরণ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা, অর্থাৎ অতীতের অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া উহাদের যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর সুপরিচিত আচরশ বর্ণনা করিবার জন্য আমাদের স্বতঃস্মৃতির মত একটি শব্দের প্রয়োজন। স্মৃতি কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহা, উহার সহিত এই শব্দটির যে সম্পর্ক, তাহা এষণার সহিত ইচ্ছার সম্পর্কের অনুরূপ ; অর্থাৎ এই শব্দটির দ্বারা প্রাণীর এক সাধারণ গুণ সূচিত হয়, সংজ্ঞাত স্মৃতি উহারই একটি বিশেষ ও সাময়িক অভিব্যক্তি মাত্র।

স্মৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ও শিক্ষার দিক হইতে তাহার গুরুত্ব কিরূপ, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন স্বতঃস্মৃতির বিষয়টিই লওয়া যাক। ইহার ক্রিয়া কিভাবে হয়, তাহা আরও ভালরূপে বুঝিবার জন্য প্রথমে একটি উদাহরণ দিলে সুবিধা হইবে। একটি কুকুরছানা একদল ছেলেকে দেখিয়া আনন্দে ডাকিয়া উঠিল, আর ইহার উত্তরে ছেলেরা তাহাকে ইট ছুঁড়িয়া মারিল। কুকুরটি আহত ও ভীত অবস্থায় বাড়ী পলাইয়া গেল। এই ঘটনার পরে বহু মাস বা বৎসর পর্য্যন্ত কোনও মানুষকে হঠাৎ মাটিতে ঝুঁকিতে দেখিলেই সে লেজ গুটাইয়া পলাইত।

এই ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, কুকুরটির কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট প্রবণতা (tendency) ও শক্তি আছে। যেমন, একদল শিশুর চেঁচামেচি ও কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার এবং উহাতে মন দিবার শক্তি, তাহাদের চেঁচামেচিতে খানিকটা আহ্লাদে খানিকটা বিবাদের ছলে ডাকিয়া উঠিবার স্পৃহা, তাহাদের নানাবিধ ক্রিয়ার মধ্যে হেঁট হওয়া ও ইট ছোঁড়া, এই ক্রিয়াদ্বয়কে পৃথকভাবে চিনিবার ক্ষমতা, হঠাৎ আঘাত পাইলে বেদনা ও ভয় অনুভব করিবার শক্তি এবং এইরূপ অনুভূতির উদ্রেকে পলায়নের প্রবণতা, এ সকলই তাহার রহিয়াছে। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া উহাতে কুকুরছানাটির কিরূপ প্রতিক্রিয়া (reaction) হইবে, তাহা নির্ভর করিবে এই সকল ও আরও অনেক শক্তি ও বৃত্তির উপর। মনোবিদ্‌গণের সুষ্ঠু ভাষায় আমরা এগুলির সমষ্টিকে কুকুরটির স্বভাব (disposition) বলিতে পারি। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,

অভিজ্ঞতার সহিত স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং প্রারম্ভে উহার যে অবস্থা ছিল, পরবর্ত্তী রূপের সহিত তুলনায় তাহাকে প্রাথমিক স্বভাব (primary disposition) বলা যায়। কুকুরটি বাড়ী ফিরিয়া তাহার বিপদের কথা যে স্মরণ রাখিল বা চিন্তা করিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল পরেও যদি তাহার সামনে কোনও অচেনা লোক কোন জিনিষ কুড়াইবার জন্য কিংবা হয়ত জুতার ফিতা বাঁধিবার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকে, তবে কুকুরটি মহাভয়ে সেস্থান হইতে পলায়ন করে, যেন সে লোকটির ঝুঁকিবার ক্রিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাই নয়, তাহাতে ঢিল ছুঁড়িয়া মারাও হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাহার প্রাথমিক স্বভাব রূপান্তরিত হইয়া এই গৌণ স্বভাবে (secondary disposition) পরিণত হইয়াছে। ইহা যেন সেই অপেক্ষায়ই ছিল যে, এমনই এক সুযোগে এই নূতন প্রতিক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইবে। এখন প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্ত্তনটি কি ধরণের? তাহার সহজ উত্তর হইল এই যে, কুকুরটির অভিজ্ঞতার ফলে তাহার প্রাথমিক স্বভাবে চিহ্ন বা রেখা থাকিয়া গিয়াছে, উহারই ফলে এই পরিবর্ত্তন। মনোবিদের ভাষায় ইহার নাম স্নায়বিক সংস্কৃতি * (engram), আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সহজ 'রেখা' কথাটিই এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিব। কিন্তু ব্যাপারটি ভালরূপে বুঝিতে গেলে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ ঘটনার দিন ঢিল ছোঁড়া, আঘাত অনুভব করা, এবং যন্ত্রণা ও ভয়ের তাড়নায় পলায়ন করা, এগুলি কুকুরের প্রত্যক্ষ জীবনে সর্ব্বপ্রথম যে একসঙ্গে ঘটিল; শুধু তাহাই নয়— ব্যাপারগুলি যে পরস্পর সংযুক্ত, এই অভিজ্ঞতাও তাহার হইল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মূল অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্নায়বিক সংস্কৃতি বা রেখাসমূহ, যেমন কাহাকেও ঝুঁকিতে দেখা, বেদনা অনুভব, প্রভৃতি কুকুরটির মনে এক সঙ্ঘবদ্ধ রূপ লইয়াছে। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ আকারে ইহাকে বলা হয় স্নায়বিক সংস্কৃতিস্কন্ধ (engram complex), এই অর্থে সহজ 'রেখাসমন্বয়' কথাটি ব্যবহার করা যাইবে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে, যখনই প্রথমে অনুভূত উত্তেজনাগুলির কোনও একটির পুনরাবৃত্তি হয় (যেমন লোকের মাটিতে

* শব্দটি বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত।

ঝুঁকিয়া পড়া), তখন সমগ্র রেখাসমন্বয়টিই সক্রিয় হইয়া উঠে। ফলে প্রাণীরও এমনই আচরণ দেখা যায় যেন প্রথম ঘটনাটির সম্পূর্ণ পুনরনুষ্ঠানই হইতেছে।

প্রাণীজগতের ক্ষুদ্রতম জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের আচরণে পর্য্যন্ত এই পরিচয় অসংখ্য পাওয়া যায় যে, সে অভিজ্ঞতা দ্বারা শিখে এবং সার্থকরূপে নিজের উন্নতিসাধনের ও জগতের সহিত নিজের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করে। এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য আমরা রেখাসমন্বয়ের কথা ভাবিলে বুঝিতে পারিব। এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার প্রকাশ বহু ও বিভিন্নরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ, রেখাসমন্বয় সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্দীপক (stimulus) সমূহের যে একই সময়ে আসা প্রয়োজন, তাহা নয়, একটির পর একটি আসাও সমান সম্ভব হইতে পারে। স্মৃতির সাহায্যে কবিতা আবৃত্তি বা সঙ্গীত আলাপ করার শক্তির মধ্যে এই জাতীয় রেখাসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি এমন ভাবে মনে সন্নিবিষ্ট থাকে যে একটি কথা বা সুর উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে পরবর্ত্তী কথা বা সুরগুলি পর পর আসিয়া পড়ে। কাপড় পরা ও ছাড়া, অভ্যস্ত দেরাজ বা সিন্দুকটি খোলা, ইত্যাদি অভ্যাসগত কার্য্যের বেলায়, এবং গৃহপালিত ও বন্য পশুদের যে সমস্ত ক্রিয়া ও খেলা শিখান হয়, সে সকলের পক্ষেও এই কথাই খাটে। ইহার কোনটির মধ্যে সংজ্ঞাত স্মৃতির ক্রিয়া যদি বা থাকে, ত তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, রেখাসমন্বয়ের উপাদানসমূহ জীবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তর হইতে আসিতে পারে। শারীরবিৎ পাভলোভের (Pavlov) একটি পরীক্ষায় ইহার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। পাভলোভ এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, একটি ঘণ্টা বাজাইবার ঠিক দুই মিনিট পরে একটি কুকুরকে খাইতে দিবেন। কুকুরটি এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়ার পর তিনি এক একবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়াও তাহাকে খাদ্য দিতেন না। কিন্তু তথাপি অভ্যাসমত ঠিক দুই মিনিট পরেই কুকুরের মুখে প্রচুর লালার সঞ্চার হইত। এই দুই মিনিটের মধ্যে ঠিক কি ঘটে, শরীরবিদের কাছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু ইহাকে কুকুরটির রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়া বলিয়াই ধরিতে হইবে। এ ক্রিয়াটির মধ্যে অতি বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টাসমূহ রহিয়াছে। তথাপি ঘণ্টাধ্বনিরূপ

একটি মাত্র উদ্দীপকেই সমগ্র ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃ যে লালার সঞ্চার হইল, এরূপ ক্রিয়াকে বলা হয় সাপেক্ষ প্রতিবর্ত্ত (conditioned reflex)।

শিক্ষার্থী সহজেই প্রতিদিনকার বহু ঘটনা সম্পর্কেও এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আবার প্রাণীর বৃদ্ধি ও বংশগতির (heredity) রহস্য সম্পর্কেও এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটি আরও চিত্তাকর্ষক লাগিবে। ইহা বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ডিম্বকোষ প্রাণীর পূর্ব্ববর্ত্তী এক পৃথক সত্তা নহে, উহা প্রাণীরই পূর্ব্বাবস্থা। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিব উহারও নিজের স্বভাব আছে, তাহা এক হিসাবে প্রাণীটিরই মুখ্য স্বভাব ; তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পুরুষদের জীবনের রেখাসমন্বয়ের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে। এই ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ডিম্বকোষ হইতে পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হওয়ার দৈহিক প্রক্রিয়াটির সহিত স্মৃতির সাহায্যে কবিতা আবৃত্তি বা গান করার অনেকখানি সাদৃশ্য রহিয়াছে। অবশ্য আবৃত্তি ও সঙ্গীত সজ্ঞানে হয়, শারীরিক বৃদ্ধি উপলব্ধি করা যায় না। তাহা ছাড়া এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য শুধু এই একটি যে, কবিতা বা সঙ্গীতের বেলায় স্বতঃস্মৃতির ভিত্তিটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় গঠিত হইয়াছে, কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির মূল রেখাসমন্বয়ের সৃষ্টি বহু পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বপুরুষদের কালে হইয়াছিল।

প্রাণিগণের সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) বেলায়ও (পরে দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমরা এই স্বতঃস্মৃতিরই উদাহরণ দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রে বংশগত (inherited) সংজ্ঞাত অজ্ঞাত উভয়বিধ ক্রিয়াই থাকে। এ প্রসঙ্গে সেমোঁর (Semon) উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে, সেটি হইতেছে পাখীদের বাসা বাঁধিবার প্রবৃত্তি। নীড়গঠনে অবশ্য এমন এক অন্তর্নিহিত প্রেরণার অভিব্যক্তি দেখা যায়, যাহা সন্তান প্রজনন ও পালনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ এষণাবৃত্তিসমূহের অঙ্গীভূত। নীড় নির্ম্মাণের উপকরণ পক্ষীর নজরে পড়িলে তাহা উদ্দীপকের কাজ করে, ফলে অতি আশ্চর্য্য ও জটিল ক্রিয়াসমূহের উৎপত্তি হয়, আর নীড়গঠনে সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রায়ই সে নীড়ের মধ্যে সুন্দর গঠননৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। পাখীগুলির এই কার্য্য দেখিয়া

যথার্থই মনে হয় যেন তাহারা সজ্ঞানে পূর্ব্বগত সংস্কার স্মরণ করিয়া তদনুযায়ী গৃহনির্ম্মাণ করিতেছে।

মানুষের মানসিক বা দৈহিক ক্রিয়ায় জাতিগত স্বতঃস্মৃতির (racial mneme) এমন অভ্রান্ত কোনও উদাহরণ বাহির হইতে চোখে পড়ে না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে নজর করিলে ইহার যথেষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কথা আছে, "বধূ যখন মাতৃত্বে উপনীত হন, তখন তাঁহার সকল চিন্তা ও অনুভূতি, তাঁহার সমগ্র অস্তিত্বেরই রূপান্তর ঘটে।" তাঁহার মহত্তম আচরণের মূলেও যে এই মাতৃত্ব প্রবৃত্তিই রহিয়াছে, সে কথা বলিতে কেহ দ্বিধা করিবে না। সুতরাং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে (instincts) তাহার জাতিগত পরিচয় পাওয়া যায় (দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), এ কথা বলিলে অন্যায় বা অস্বাভাবিক হয় না। অবশ্য মানুষের বুদ্ধি অধিক হওয়ায় তাহার প্রবৃত্তিমূলক আচরণেও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের পুরাণ ও উপকথার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, অনেক লেখকের মতে এ ব্যাপারটির মূলেও জাতিগত স্বতঃস্মৃতি রহিয়াছে।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জাতিগত স্বতঃস্মৃতির ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া এক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, শিক্ষানীতির পক্ষে ইহার কিছু মূল্য আছে। তাহা এই যে, ব্যক্তির মানসিক পরিণতি জাতির মানসিক বিকাশেরই সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (recapitulation), অর্থাৎ শিশু ক্রমে ক্রমে বয়স্ক মানুষে পরিণত হইবার সময়টিতে, মানবজাতি তাহার আদিম বন্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সুসভ্য অবস্থায় উপনীত হইবার দীর্ঘকালটিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, সে সবগুলিরই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই মতের প্রধান সমর্থক ষ্ট্যান্‌লী হল (Stanley Hall) তাঁহার খেলার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বহু বিখ্যাত মনোবিৎ এই সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদ সমর্থন করেন না। কিন্তু সাধারণভাবে প্রয়োগ করিলে ইহার যে শিক্ষার দিক হইতে বিশেষ মূল্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

এষণা ও স্বতঃস্মৃতির সম্পর্ক

আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা এষণা ও স্বতঃস্মৃতির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এগুলি প্রাণীর একই ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন দিক মাত্র, এবং কার্য্যতঃ এগুলিকে পৃথক করা যায় না। আত্মসাম্মুখ্যের (self-assertion) সকল ক্রিয়াতে এষণা ও স্বতঃস্মৃতি উভয়ই রহিয়াছে ; উহার যে দিকটিতে সংরক্ষণমূলক বা সৃষ্টিমূলক ক্রিয়া আছে, সে দিকটি হইল এষণা, আর অন্য যে দিকে প্রাণীর নিজ বা জাতিগত ইতিহাসের অন্ততঃ আংশিক প্রভাব আছে, উহাকেই স্বতঃস্মৃতির ক্রিয়া বলা যায়। অর্থাৎ, প্রাণীর রেখাসমন্বয়গুলিকে নির্জ্জীব পদার্থ অথবা উহার সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ায় ব্যবহার করিবার সম্ভাব্য উপাদান মনে করিলে চলিবে না। প্রাণীর যে স্বভাব (disposition) হইতে সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, এই গুলি তাহারই জীবন্ত অংশ। অথবা আর এক ভাবে প্রাণীর সকল সংরক্ষণমূলক ও সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার বাহনও ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে।

এই মূল্যবান সত্যটীর পরিচয় আমরা পাই, যখন আমরা দেখি যে শিল্প ও আবিষ্কারে, বিজ্ঞান ও দর্শনে, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে ও নীতিধর্ম্মের ক্ষেত্রে চিরদিন যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কখনও পুরাতনকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় নাই। যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষ ও সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা উহাদের প্রাণহীন অংশ হইতে পারে না, তাহা সজীব ও সক্রিয়রূপে বৃদ্ধিশীল স্বতঃস্মৃতি। পাঠককে এই কথা বলা যাইতেছে যে, বিশেষতঃ তিনি যদি শিক্ষক হন, তিনি মানবজাতির উন্নতির কোনও গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে এই 'জীবন্ত অতীতের' ক্রিয়া ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইবেন।

প্রতিদিনকার কার্য্যাবলীতেও এই নীতি সর্ব্বত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও তাঁহার লক্ষ্য করা দরকার। একটি চিঠি লেখার উদাহরণ লওয়া যাক।

ভাব বিনিময়ের এই অতি কৃত্রিম প্রণালীর প্রেরণাটি স্বতঃস্মৃতিসম্ভূত। এ কার্য্য সাধনের জন্য যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যেমন শব্দ, শব্দের অর্থ বা বানান মনে রাখা, লেখনী চালনা, এগুলিও স্বতঃস্মৃতির ব্যাপার। তাহা ছাড়া যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে এই প্রেরণা বা এষণার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও মুখ্যতঃ ঐ শ্রেণীর। কারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন, ক্রটিস্বীকার, অনুরোধ, স্নেহ বা ক্রোধ প্রকাশ করা ইত্যাদি প্রচলিত কর্ত্তব্যসাধনই পত্রলেখকের অভিপ্রায়। সুতরাং স্বতঃস্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এষণার উৎপত্তি ও ক্রিয়া চলিতে থাকে। ক্রমপরিণতির সহিত উহা সুস্পষ্ট রূপ ও আকার লাভ করে। যেমন, পত্রলেখকের যে বিশ্বাস রহিয়াছে যে তিনি যাহা বলিতে চান, উহা তাঁহার জানা আছে, তাহার অর্থ ইহা নয় যে কি কি শব্দ তিনি লিখিবেন তাহা তিনি পূর্ব্বে ভাবিয়া লইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এখনকার যে পরিস্থিতি তাঁহার এই প্রেরণার (অর্থাৎ চিঠি লেখার প্রেরণা) সৃষ্টি করিয়াছে, উহার খানিকটা নূতন হইলেও, খানিকটা অংশ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। এই প্রেরণাটি সংশ্লিষ্ট (ভাব বা শব্দ প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদির) রেখাসমন্বয়গুলির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া সেগুলিকে সচল করে। কারণ ঐ পরিস্থিতির পরিচিত ও অপরিচিত উভয় অংশের মধ্যে পত্রলেখার প্রেরণাটিকে আত্মসাম্মুখ্যের (self-assertion) যথার্থ বাহন করিতে হইলে এই সকল রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কবিতা রচনা, সঙ্গীতের সুর সংযোজনা, অথবা যে কোনও সমস্যার সমাধানপদ্ধতি সম্বন্ধেও সাধারণভাবে এই কথা বলা যায়। শুধু এই সকল বৃহৎ ক্রিয়ার বেলায়ই নয়, সাধারণ বাক্যালাপের পক্ষেও এ মন্তব্য সমানভাবে খাটে। একটু ভাবিলে বুঝা যায় যে কথা বলা যেন এক অজ্ঞাত অভিযানের মত। কারণ কথা আরম্ভ করিবার সময় কোনও ব্যক্তিই সঠিকভাবে বলিতে পারেন না যে সে কথা কি ভাবে শেষ হইবে। কথাটি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কতখানি বলা যায়? প্রথমতঃ, এষণা ও স্বতঃস্মৃতি, এই উভয়ের ক্রিয়াযুক্ত কোনও বিশেষ রেখাসমন্বয়ের প্রভাবে কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কথার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা সেই রেখাসমন্বয়ের দ্বারাই চালিত হয়। তৃতীয়তঃ, কথা বলার সময়ে সে রেখাসমন্বয়টি অপরিবর্ত্তিত থাকে না। নিজ ক্রিয়ার ফলেই উহার আকার এমনভাবে

পরিবর্ত্তিত ও বিস্তৃত হয় যে অনেক সময়ে ইহা নবরূপ পাইয়া থাকে। এই ভাবে ব্যক্তির আত্মসাম্মুখ্যের নূতন উৎসের সৃষ্টি হয়।

মনের রেখা সমন্বয়ের এই যে চালনাশক্তি আছে, মনোবিদ্‌গণ তাহাকে নিয়তি (determining tendency) বলেন। কয়েকটি সহজ ব্যাপারে ইহার পরীক্ষাও হইয়াছে। পাঠক আর এক ব্যক্তির নিকট না ভাবিয়াই যে কোনও একটি শব্দ বলুন। ইতিপূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া দরকার যে শব্দটি শোনামাত্র যে কোনও শব্দ তাঁহার মনে আসিবে, তিনি যেন তাহা বলেন। ইহাকে বলা হয় অবাধ ভাবানুষঙ্গপদ্ধতি (free association)। উদ্দীপক কথাটির (stimulus word) উত্তরে ঠিক কি সাড়া (reaction) পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বে জানিবার কোনও উপায় নাই। কারণ মানুষের মন অসংখ্য শব্দের মধ্যে অবাধে যে কোনও একটি বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষক যদি এখন বলেন যে উদ্দীপক শব্দটি হইবে একটি শ্রেণীর নাম, এবং উত্তরে ঐ শ্রেণীভুক্ত কোনও শব্দ বলিতে হইবে, তাহা হইলে পরীক্ষার ফল সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইবে। কারণ এখন সাড়ার মূল ভাবানুষঙ্গটি অবাধ রহিল না। উহার নিয়তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এজন্য উহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, উদ্দীপক শব্দটি যদি প্রাণী হয়, প্রতিক্রিয়া শব্দ হইবে হয় ত 'কুকুর'। মুদ্রা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া সম্ভবতঃ হইবে 'টাকা'।

এক্ষেত্রে ঠিক কি ঘটিল তাহা বুঝা দরকার। উদ্দীপক শব্দটি শোনামাত্র শ্রোতার স্মৃতিতে যে কতকগুলি শব্দ উত্থিত হয়, এবং সে সজ্ঞাতরূপে তাহার একটি বাছিয়া লয়, তাহা নহে। স্মৃতি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই একটি উপযোগী শব্দ যোগাইয়া দেয়। এই ব্যাপারের কারণ বুঝিতে হইলে আমাদের এই কথা মনে করিতে হয় যে এক্ষেত্রে যে রেখাসমন্বয়ের এষণায় নিয়তি সক্রিয় হইয়াছে, উহা উদ্দীপিত হওয়ায় শুধু উহার সংশ্লিষ্ট রেখাগুলিই চালিত হইল। এই ভাবানুষঙ্গের বেলায় যাহা ঘটিল, সকল মূল ক্রিয়ার বেলায়ও বস্তুতঃ তাহাই ঘটে। চিন্তা, আবিষ্কার বা কল্পনার ক্রিয়াই হউক, অথবা দৈনন্দিন প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার ব্যাপারই হউক, সর্ব্বক্ষেত্রেই এগুলিকে এই সীমাবদ্ধ ভাবানুষঙ্গের পরীক্ষার সরল প্রতিরূপ মনে করা যাইতে পারে।

এই সকল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া গ্রেহাম্ ওয়ালাস্ (Graham wallas)

এক চিন্তাপদ্ধতি (art of thought) রচনা করিয়াছেন ! তিনি বলেন যে শিক্ষার্থীগণের ইহা মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করা উচিত, বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও ইহা শিখান দরকার। এই প্রণালীর মূলনীতি এই যে গঠনমূলক চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে চারটি বিশিষ্ট পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রথমটি হইল 'প্রস্তুতি' (preparation)। এই পর্য্যায়ে সমস্যা বা বিষয়টি স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা হয়, যদি প্রয়োজন হয় ত বিভিন্ন শাখায় ভাগ করিয়া লওয়া হয়। ইহার ক্রিয়া চলিবার সময়ে সমস্যাটির পক্ষে সহায়ক ধারণাসমূহ মনের গভীর প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতেও পারে ; তবে অধিকাংশ স্থলেই এত সহজে সাফল্য আসে না। অনেক সময়েই সমস্যাটির কথা ভুলিয়া থাকিবার বা উহা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিবার প্রয়োজন হয়। ইহাকে অন্যভাবে বলা যায় যে এখানে আমাদের মনের নিয়তির গঠনমূলক প্রভাবে সমস্যার উত্তরটির বিভিন্ন অংশগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য এই সময়ের প্রয়োজন হয়, আর এ ক্ষেত্রে নিয়তিটি হইল সমস্যাটি সাজান এবং উহা সমাধানের ইচ্ছা। এই পর্য্যায়ের নাম 'তাপসঞ্চার' (incubation) বা 'পরিপোষণ' রাখা চলে, অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হওয়ার পূর্ব্বে যেমন তাপ দেওয়া হয় সেইরূপ। ইহা অনেকক্ষণ চলিতে পারে, মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে তাহার কোনও নিদর্শনও সে সময়ে পাওয়া যায় না। অবশেষে, হয়ত কোনরূপ পূর্ব্বাভাস না দিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে 'আলোকপাত' (illumination) পর্য্যায়ের আবির্ভাব হয়, তখন নির্জ্জন মন হইতে সমাধানটি উপলব্ধিতে আসে। সর্ব্বশেষ পর্য্যায় 'যাথার্থ্যনির্ণয়' (verification), সমস্যাটির প্রথম বিশ্লেষণের ন্যায় ইহাও পূর্ণ চেতনা সহকারে হইয়া থাকে। ভাবটিকে স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া এবং উহার কার্য্যকারিতা প্রমাণ করাই হইল ইহার কাজ।

শিক্ষা ও শিক্ষালাভ সম্পর্কিত কতকগুলি কঠিন বাধা অতিক্রম করার কৌশল আমরা উল্লিখিত মতবাদ হইতে শিখিতে পারিব। সাধারণতঃ যে ছাত্র পাঠ্যভুক্ত কোনও সমস্যা পাইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া যায়, সমস্যাটির সমাধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আর অগ্রসর হইতে চায় না, তাহাকেই আমরা ভাল বলি। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার চেয়ে কম নিষ্ঠায় অনেক স্থলে সাফল্য হয় বেশী। তাহার কারণ উপরের মতবাদটি হইতে বুঝা যায়, এবং আমরা অভিজ্ঞতা

দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাই। যেমন, আমরা হয়ত গণিতের কোনও সমস্যার উত্তর পাইতেছি না, বা বিদেশী ভাষায় রচিত কোনও কঠিন পাঠ্যাংশের অর্থবোধ হইতেছে না। সে সময়ে উহা লইয়া আর চেষ্টা পরিশ্রম না করিয়া, পাঠের সহজ কোনও অংশ ধরা ভাল। কারণ দেখা যায় যে, পরে আবার উহাতে মনোনিবেশ করিলে তখন প্রায়ই সমস্যাটি অনেক সহজ হইয়া পড়ে। তখন দেখি যে দুরূহ অঙ্ক বা কঠিন সন্দর্ভটি সহজেই বোধগম্য হইল। বরং তখন আমাদের বিস্ময় লাগে যে প্রথমে কেন উহা এত দুঃসাধ্য মনে হইয়াছিল! ইহার উত্তর এই যে, ইতিমধ্যে পরিপোষণ হইয়াছে, সে সময়ে পরবর্ত্তী মানসিক ক্রিয়াগুলির ফলে দুর্ব্বোধ্যতা দূর হইয়াছে।

পরিপোষণ ক্রিয়াটির সহিত সম্পর্কিত আর একটি ব্যাপারের কথা বলি। মনের রেখাসমন্বয়ের একটি গুণ এই যে ক্রিয়ার বিরতিকালে উহার দৃঢ়সংযোগ বা সন্নিবদ্ধতা (consolidation) হয়। গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন যে, মানুষের মনের ক্রিয়ার যখন বিরতি হয়, তখনই তাহার প্রতিভার অগ্রগতি ও বৃদ্ধি ঘটে। পাঠকও হয়ত এমন লক্ষ্য করিয়াছেন যে আমাদের যে সকল ক্রিয়ায় সহজ নৈপুণ্য এখনও আসে নাই, সেগুলির বেলায় অভ্যাসের অব্যবহিত পরে না চেষ্টা করিয়া অনুশীলনের খানিকটা বিরতির পরে করিলে অধিক সাফল্য পাওয়া যায়।

মুখস্থ বিষয় মনে রাখার সম্পর্কে ব্যালার্ড (Ballard) যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ইহার উদাহরণ দেখা গিয়াছে। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কবিতা মুখস্থ করিবার চেষ্টার ঠিক পরেই যে কবিতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ স্মরণ করা যায় তাহা নহে, পক্ষান্তরে ইহার পরিমাণ কয়েকদিন ধরিয়া বাড়িতে থাকে, মুখস্থ যে সমস্ত শব্দ ও বাক্যাংশের প্রথমে বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, তাহারই অনেক কিছুকাল পরে স্মৃতিমধ্যে ফিরিয়া আসে। এই শ্রেণীর স্মরণশক্তি শিশুদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়, আবার বয়স বাড়ার সহিত কমিয়া যায়। বয়স্ক মানুষের এ শক্তি নাই বলিলেও চলে।

এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করার পূর্ব্বে এষণা ও স্বতঃস্মৃতির পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে আর একটি কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি যে স্মৃতি আমাদের সময়ে সময়ে যে বিপদে ফেলে, তাহা শুধু ভুলিয়া যাওয়ার জন্য নহে।

যাহা স্মরণ আছে মনে করা যায়, তাহাও ভুল হইয়া পড়ে। যেমন, আমাদের দেখা কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা পরে বর্ণনা করিবার সময় প্রায়ই উহা অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ ঐ ব্যাপারে আমাদের নিজের ক্রিয়া যদি আশানুরূপ সন্তোষজনক না হয়, তবে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। কারণ এই অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষভাবে ও নিজেদের অজ্ঞাতসারে ব্যাপারটিকে এমনই রূপ দিয়া থাকি, যাহাতে উহা দ্বারা আমাদের আত্মশ্রদ্ধার কম হানি হয়। শিশুদের মধ্যে এই গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, আর ইহার ফলে অযথা তিরস্কারও তাহাদের সহ্য করিতে হয়।

পরিপোষণ ও সন্নিবদ্ধতার কথা হইতে স্বতঃই আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়টি আসিয়া পড়িতেছে। উহাতে দেখা গেল যে, কোনও একটি নিয়তি আমাদের উপলব্ধির বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরেও নির্জ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কোনও কঠিন সমস্যার কথা যদি আমরা ভুলিয়া থাকি, তবে হয়ত পর দিন সকালে আবার উহাতে মনোনিবেশ করার সময় দেখা যায় যে, উহার সমাধান আপনা হইতেই মিলিয়া গিয়াছে। ইহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এবং সকলেই বোধ হয় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অনেক সময় কোনও বিষয় স্মৃতিপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল হওয়া গেল না। অথচ পরে এক সময়ে বিষয়টি হঠাৎ আপনা হইতেই মনে আসিয়া গেল, যেন উহা স্মরণ করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। এই ধরণের ঘটনা হইতে এমন ধারণা হয় যে ভাবানুষঙ্গ কখনও সম্পূর্ণ অবাধ হইতে পারে না, আর আমরা দৈবাৎ যে সমস্ত কথা ও ভাব আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসিতে দেখি, সব ক্ষেত্রেই সেগুলির মূলে এমন সব রেখাসমন্বয় থাকে, যাহার ক্রিয়া চলে মনের অন্ধকার প্রদেশে। আধুনিক মনোবিদ্যার অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা মনঃসমীক্ষার (pycho-analysis) উদ্ভাবনকারী ভিয়েনার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড Siegmund Freud), জুরিকের কার্ল ইয়ুঙ (Carl Jung) ও ইঁহাদের অনুগামীগণের মতে অনেক স্থলে এই কথাই সত্য। তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা যে সব তথ্য

আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আধুনিক মনোবিদ্যার এক অতি গুরুতর ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে।

এখানে আলোচ্য বিষয়টি পাঠকের ঠিকভাবে বুঝা প্রয়োজন। মনোবিদ্যায় একটি সাধারণ কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, চিন্তা ও স্মৃতির প্রক্রিয়াটি ভাবানুষঙ্গ বা ভাবসংযোগের কয়েকটি নিয়মের (law of association) অধীন। এই নিয়মগুলির স্বরূপ কি সেই প্রশ্ন ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ তুলেন। আগেকার মত এই ছিল যে ভাবানুষঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিগত ব্যাপার, ভাবগুলি যত সম্প্রতি এবং যতবার অভিজ্ঞতাগোচর হইয়াছে তাহারই উপর উহাদের অনুষঙ্গ নির্ভর করে। কিন্তু এই নূতন মতবাদে (এই গ্রন্থের যুক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখা যাইবে) সে প্রক্রিয়ার মধ্যে এষণা ও স্বতঃস্মৃতি, উভয়েরই ক্রিয়া আছে। অর্থাৎ চিন্তা ও স্মৃতি কতকগুলি সক্রিয় রেখাসমন্বয় দ্বারা পরিচালিত হয়, মনঃসমীক্ষকেরা এগুলিকে বলেন গূঢ়ৈষা (complex)। আর ভাবগুলি যতবার বা যত সম্প্রতি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসিয়াছে, তাহার উপর চিন্তা বা স্মৃতির ক্রিয়া ততটা নির্ভর করে না, যতখানি নির্ভর করে আমাদের এষণাজীবনে এই গূঢ়ৈষাগুলি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপর। সুতরাং বলা যায় যে মানুষ একটি ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেছে, উহার কারণ যে ঘটনাটি সম্প্রতি বা বহুবার তাহার অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে তাহা নহে, সে উহা স্মরণ করিতে চায় বলিয়াই স্মরণ করিতে পারে। এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইলেও মিথ্যা হইবে না। একটি গূঢ়ৈষা যদি আত্মসাম্মুখ্যের শক্তিমান বাহন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহার ক্রিয়া যদি অত্যধিক প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে উহার প্রভাব আমাদের চিন্তা ও স্মৃতির মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িবে।

কুশলী পরীক্ষক যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে কোনও ব্যক্তি এক সুনির্ব্বাচিত উদ্দীপক শব্দসমষ্টির ফলে কি সাড়া দেন, তাহা হইলে তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে কোন্ রেখাসমন্বয় তাঁহার আত্মসাম্মুখ্যের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক আছে বা ছিল। কখনও হয়ত এগুলি আবিষ্কৃত হইলে সে ব্যক্তি বিস্মিত হন না। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে ইহাদের আধিপত্য তাঁহার মানসিক জীবনে যে এত বেশী, সে কথা মনে করা

দূরে থাক, ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। পাঠক হয়ত নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যেও এইরূপ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃষ্টান্তের কথা মনে করিতে পারিবেন।

মনের গভীর অংশে নিহিত রেখাসমন্বয় বা গূঢ়ৈষার আরও গুরুপূর্ণ প্রভাব এই যে ইহার ফলে অনেক চিন্তা ও বিষয় আমাদের উপলব্ধি হইতে চলিয়া যায়। পরীক্ষাধীন ব্যক্তি যদি উদ্দীপক শব্দ শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, বা সাড়া দিতে অত্যধিক সময় লয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া চলে যে ইহার মূলে এমন একটি গূঢ়ৈষা আছে যাহা চেতনায় ফিরিয়া আসিলে দুঃখকর হইবে। এই গূঢ়ৈষাটি আসংজ্ঞান (fore-conscious) স্তরের হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত ভাবগুলির বিস্মৃতি ঘটিলেও লোকটি সেগুলি স্মরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, এটির উৎপত্তি এমন এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা অপ্রীতিকর ভাবের মধ্যে, যেটিকে চেষ্টা সহকারে মন হইতে দূরীভূত করা হইয়াছে, অথবা ইহার সহিত এমন কোনও আত্মসাম্মুখ্যের ব্যাপার সংশ্লিষ্ট আছে, যেটি হইতে সে ব্যক্তি নিজের পরিণতির সঙ্গে জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন।

এখানে যে ব্যাপারটির কথা বলা যাইতেছে, মনোবিদ্যার পরিভাষায় উহাকে অবদমন (repression) বলা হয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে অনেক সময়ে অবদমনই সাধারণ বিস্মৃতির কারণ ; অর্থাৎ, লোকে আপন অজ্ঞাতসারে ভুলিয়া যাইতে চায় বলিয়া বিস্মৃতি ঘটে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনঃসমীক্ষক আর্নেষ্ট জোন্স (Ernest Jones) বলিয়াছেন যে ইহাই সকল বিস্মৃতির কারণ। যে চিঠিখানি লিখিতে আমি ক্রমাগত ভুলিয়া যাইতেছি, বা লেখা হইলেও ডাকে দিতে ভুল হইতেছে, সেটি হয়ত প্রীতিকর নহে। যে ব্যক্তিকে আমি অভ্যাসমত নববর্ষের অভিবাদন জানাইতে অকারণে ভুলিয়া গিয়াছি, দেখা গেল তাঁর নাম ও সদ্য পরলোকগত এক বন্ধুর নামের সাদৃশ্য আছে। অভ্যাসগত ও সাময়িক বিস্মৃতির এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর। অন্য লোকের নাম যে আমার মনে পড়ে না, তাহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে আমার নিজের নামটি বড়ই অদ্ভুত বা সাধারণ বলিয়া উহা আমার নিজ

আত্মসম্মানের হানি ঘটায়। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিতে হইবে যে দুটি গূঢ়েষার দ্বন্দ্বের ফলেই এই গোলযোগের সৃষ্টি। একটি সংজ্ঞানে আসিতে চেষ্টা করিতেছে, অন্যটি তাহাকে অবদমিত করিতেছে। বহু ছোটখাট ভুল ত্রুটি, কথা বলা ও লেখার ভুল, ছাপার ভুল, জিনিষপত্র হারান, কোনও মানুষ ও বস্তু চিনিতে ভুল করা, এ সমস্তই অবদমিত রেখাসমন্বয় বা গূঢ়েষার প্রভাবে ঘটিতে পারে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই সম্পর্কে লেখক নানের (Nunn) নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। পাঠক নিজের এমন ঘটনার কথাও নিশ্চয়ই মনে করিতে পারিবেন। একবার এক বিখ্যাত দন্তচিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সখ বা দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার হইয়াছিল। যথাসময়ে তিনি এই বাবদ বহু টাকার বিল পান। সুযোগমত টাকা পরিশোধ করা যাইবে, এই ভাবিয়া তিনি সেটিকে দেরাজে রাখিয়া দেন। কিন্তু যখন পরিশোধের কথা মনে হইল, তখন দেখেন বিলটি অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইয়াছে। দেরাজটি একাধিকবার খোঁজা হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তারপর কিছুকাল তিনি ব্যাপারটি ভুলিয়া রহিলেন। শেষকালে লজ্জার দায়ে তিনি বিলটির একটি নকল চাহিলেন এবং উহা শোধও করিলেন। কিন্তু কালক্রমে যখন টাকার শোক কমিয়া গিয়াছে, তখন প্রথম বিলটি দেরাজেই পাওয়া গেল। এবং এত সহজেই সেটি পাওয়া গেল যে উহা ইতিপূর্ব্বে চোখে না পড়াটাই আশ্চর্য্য ঠেকিল।

এই সকল উদাহরণে গূঢ়েষা চিন্তা বা ক্রিয়ার উপর যে প্রভাব আরোপ করিতেছে উহা প্রত্যক্ষ। অন্যান্য ক্ষেত্রে উহার প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তখন ইহার ক্রিয়া এমন কয়েকটি রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া চলিতে থাকে যেগুলির আমাদের সংজ্ঞানে প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে নিহিত গূঢ়েষার অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ নয়, প্রতীকমূলক (symbolic)। নানা অদ্ভুত আচরণ, মুখচোখের ভঙ্গী প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই এইভাবে পাওয়া যায়। এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হইলেও, মনঃসমীক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে এগুলিকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি নিহিত গূঢ়েষা আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। যখন রান্নাঘরে বাসনপত্র ভাঙ্গার ধুম পড়িয়া যায়,

তখন হয় ত বুঝিতে হইবে যে কর্ত্রীর তিরস্কারে দাসীর মনে যে অসন্তোষ রহিয়াছে, ইহা তাহারই প্রতীক। বেচারা দাসী হয়ত নিজেই জানে না যে তাহার আক্রোশের মাত্রা কতখানি। এবং সম্পূর্ণ সাধু উদ্দেশ্যেই সে এইরূপ দুর্ঘটনার কারণ দেখাইবার চেষ্টাও করিতে পারে, যেমন শীতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল, জল বেশী গরম ছিল, বা এইরূপ আর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ।

এমন লোক অল্পই আছেন যাঁহার দৈনন্দিন চিন্তা ও আচরণে কিছু না কিছু এই ধরণের মনঃসমীক্ষণের উপকরণ না পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন যে মানুষমাত্রেরই মানসিক জীবনের একটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে নিহিত গূঢ়ৈষার অর্থাৎ অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার প্রতীকমূলক ক্রিয়া মোটেই দুর্লভ নয়, বরং অতি সাধারণ ব্যাপার। উহা হইল স্বপ্ন। একজন স্বপ্নকে ব্যঙ্গচিত্র রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এ বর্ণনা অতি সুষ্ঠু। যথার্থই উহার মধ্যে কুশলী ব্যাখ্যাকার অনেক সময়ে অদ্ভূত অর্থ পাইয়া থাকেন। সেইজন্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণ আজকাল স্বপ্নের তাৎপর্য্য যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করেন।

স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ প্রদত্ত মতবাদে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। ফ্রয়েড বলেন যে স্বপ্ন সব ক্ষেত্রেই শৈশবের অবদমিত (repressed), অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। এই কারণে স্বপ্নের বাহ্যরূপটি সর্ব্বক্ষেত্রেই এক প্রচ্ছন্ন শিশুসুলভ ইচ্ছার ছদ্মবেশ মাত্র। একই ছদ্মবেশ লইয়া ইচ্ছাটি প্রতীকরূপে চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়। ইয়ুঙও স্বীকার করেন যে স্বপ্নের বাহ্য রূপ ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে; এবং বাল্যের বিস্মৃত ঘটনার প্রভাব উহাতে বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার মতে স্বপ্নের মূল অতীতে নিহিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা ভবিষ্যৎ মুখী ক্রিয়া। আমাদের সংজ্ঞাত জীবনের ক্রিয়াকলাপ সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হইলে, বা বিপদের পথে গেলে, সে বিষয়ে প্রতিবাদ বা সতর্কতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রতীকস্বরূপ স্বপ্ন আবির্ভূত হয়। উভয় মতবাদেরই স্থলবিশেষে সার্থকতা রহিয়াছে। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে প্রাণীর আত্মপোষণ নীতি তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগে রেখাসমন্বয়ের ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা বলা গিয়াছে, ইয়ুঙ প্রদত্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি তাহার সমর্থক।

মানসিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় স্বপ্নের কতখানি মূল্য আছে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রিভার্স (Rivers) প্রদত্ত এক বিবরণে পাওয়া যায়। সেনাবিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বদ্ধস্থানাতঙ্ক ব্যাধি (claustrophobia) ছিল। যে কোনও বদ্ধস্থানে থাকিতে হইলে, বিশেষতঃ সেখান হইতে বহির্গত হওয়ার পথ বন্ধ থাকিলে, তাঁহার অহেতুকী ভয় হইত। এই কষ্টকর ভীতি ছেলেবেলা হইতে তাঁহার ছিল, তবে ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহার মনে হয় নাই। কিন্তু ফ্রান্সে সৈন্যদলে যোগদান করিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অন্য সকলে স্বচ্ছন্দে ভূগর্ভস্থ পরিখার মধ্যে বাস করে; অথচ সে অবস্থা তাঁহার পক্ষে এরূপ অসহনীয় হইল যে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রিভার্সের চিকিৎসায় আসার পরে তাঁহাকে বলা হইল যে তিনি যে তাঁহার স্বপ্নগুলির কথা লিখিয়া রাখেন, আর বিশেষতঃ নিদ্রাভঙ্গের ঠিক পরেই স্বপ্নের কথা চিন্তা করার সময়ে যে কথাগুলি তাঁহার মনে আসে, স্মৃতির মধ্যে সেগুলিরও অনুসরণ করিয়া সমস্ত লিপিবদ্ধ করেন। এই ভাবে তাঁহার ব্যাধির মূলে একটি যে বহুকালবিস্মৃত ঘটনা ছিল, তাহা বাহির হইল। দেখা গেল যে তিন চার বৎসর বয়সে তিনি একবার একাকী কোন স্থানে যাইতেছিলেন। একটি দীর্ঘ ও অন্ধকার গলি দিয়া তাঁহাকে যাইতে হয়। ফিরিবার সময় দেখেন যে গলির মুখে দরজাটি বন্ধ। তিনি এত ছোট ছিলেন যে দরজা খুলিয়া লওয়ার তাঁহার সাধ্য ছিল না, আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি কুকুর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; ইহাতে তাঁহার অত্যধিক ভয় হইয়াছিল।

এই স্বপ্ন দ্বারা যে সমস্ত বিস্মৃত ঘটনা পাওয়া গেল, সেগুলির সত্যতা পরে প্রমাণিত হয়। ফলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে রোগীটির জীবন যে গূঢ়ৈষার ক্রিয়ায় এরূপ বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যথার্থ সন্ধান পাওয়া গেল। এই ঘটনা সম্পর্কে শুধু আর একটি কথা বলা যাইবে, কিন্তু সে কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। যখনই রোগীর অযৌক্তিক (irrational) ভয়ের মুল কারণ জানা গেল, তখন হইতে উহার উৎপাতও দূর হইল। তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বচ্ছন্দচিত্তে থিয়েটারগৃহের মধ্যে বসিতে বা সুড়ঙ্গপথগামী রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইলেন। ইহাতে ফ্রয়েডের একটি নীতির

দৃষ্টান্ত দেখা গেল যে, কোনও অবদমিত গূঢ়ৈষা যে প্রতিবন্ধ (resistance) বা বাধার দ্বারা নিরুদ্ধ থাকে, সেটিকে দূর করিতে পারিলে সচরাচর উহার ক্ষতিকারক প্রভাব চলিয়া যায়।

এক দুষ্ক্রিয়াসক্তা (delinquent) বালিকার স্বপ্ন ও জাগরস্বপ্নের (day-dreams) বিবরণ সিরিল বার্ট (Cyril Burt) দিয়াছেন। এটি আরও সারগর্ভ, কারণ শিক্ষামূলক ব্যাপারের সহিত ইহার সাক্ষাৎ যোগ রহিয়াছে। তা ছাড়া বার্ট তাঁহার বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিগুলি অতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ কাহিনী হইতেছে পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্তা ষোল বছরের একটি মেয়ের। তাহার বুদ্ধি কিছু অল্প, প্রকৃতিও বেয়াড়া। বাল্যে বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে অবাধ্যতা ও কলহপ্রিয়তার দুর্নাম তাহার ছিল। মেয়েটি বার বার কর্ত্রীর গহনা চুরি করিয়া শেষে ভয়ানক বিপদে পড়ে। বার্ট তাহার দুইটি স্বপ্নের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। স্বপ্ন দুটি সম্বন্ধে একটুখানি বলিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমটি এক আজগুবী গল্প। তাহাতে ছিল একটি বুড়ো গরু, একজন শুশ্রূষাকারিণী (nurse), এবং সৈনিকের পোষাক পরিহিত এক যুবক। স্বপ্নে গরুটির চক্ষু খসিয়া পড়িল এবং বালিকাটি এক চকোলেট দেওয়া কেকের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উহাকে হত্যা করিল। দ্বিতীয় স্বপ্নে ছিল যে ঝড় বজ্রপাত হইতেছে, এক ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৃত্ত মেয়েটিকে হরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া যাইতেছে। এমন সময় বাজ পড়ায় তাহারা উভয়ে এক নালায় গড়াইয়া পড়িল। ব্যাপারটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে বালিকাটির মুখে বাহ্যতঃ আজগুবী এই সব কাহিনী ধৈর্য্যের সহিত শুনিয়া আর ইহার প্রভাবে যে যে সব ভাব ও স্মৃতি তাহার মনে জাগিল, সেগুলি অনুসরণ করিয়া বার্ট বালিকার মনের গূঢ় ইতিহাস এতখানি পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইলেন যে উহার সাহায্যে বালিকাকে তাহার চরিত্রের কথা ও তাহার চুরির আসল তাৎপর্য্য অন্তত: খানিকটা বুঝাইয়া দিতে পারিলেন। বালিকার জীবনে অন্য প্রধান ব্যক্তিদের বিবরণ এইরূপ। প্রথমে তাহার পিতা, বালিকার তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ থাকিলেও সে ছিল বড়ই উচ্ছৃঙ্খল। দ্বিতীয় স্বপ্নে সেই দুর্ব্বৃত্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। তারপর ছিল তাহার মাতা। তাহার হাতে প্রায়ই শাস্তি ভোগ করিতে হইত বলিয়া বালিকার তাহার

উপরে বড় আক্রোশ জন্মিয়াছিল। একবার সে তাহাকে ‘বুড়ো গরু’ বলিয়াছিল এবং প্রকাশ্যেই তাহার মৃত্যুকামনা করিত। এখানেও স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা দরকার। আর ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সে সেনাদলে যোগ দিয়াছিল। এই ভ্রাতাই স্বপ্নের যুবকটি। মেয়েটির পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার পরে তাহার পিতা নিরুদ্দিষ্ট হয়, পরে বলা হয় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন বালিকার স্নেহ এই ভ্রাতারই উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল। পরে আসিল তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও তাহার কর্ম্মস্থলের কর্ত্রী। মেয়েটির নির্জ্ঞানে (unconscious) তাহার মাতার সহিত এই দুইজনের একাত্মীকরণ (identification) সাধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ মাতার প্রতি যে মনোভাব ছিল, এখন তাহা ইহাদের উপরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার কারণ দুজনেই তাহার উপরে প্রভুত্ব করিত এবং প্রায়ই তাহাকে তিরস্কার করিত। এই একাত্মীকরণের আরও সহায়তা হইয়াছিল এই জন্য যে তিন জনেই নাকে টেপা চশমা (pince-nez) পরিত, এবং বিদ্যালয়ের মেয়েরা অবজ্ঞাচ্ছলে শিক্ষয়িত্রীকে বলিত ‘বুড়ো গরু’। সুতরাং এই পন্থায় সহজেই বালিকার শৈশবের বিদ্রোহভাব তাহার মনে সংবদ্ধ (fixed) হইল এবং সারা সমাজের উদ্দেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার চুরিও অংশতঃ এই মনোভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝা গেল।

মেয়েটির জাগরস্বপ্নের (day-dream) অর্থাৎ আকাশকুসুম কল্পনার অত্যন্ত অভ্যাস ছিল। তাহার মনগড়া কাহিনীটি ভালরূপ পর্য্যালোচনা করার ফলে তাহার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ হইল। এই অভ্যাস দুর্লভ নয়। ক্রমাগত বাজে উপন্যাস পড়িয়া সে এই জাগরস্বপ্নের খোরাক যোগাইত। কিন্তু এগুলির আসল উৎপত্তি ছিল নিঃসঙ্গ, বিক্ষুব্ধ শিশুর স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা সিণ্ডারেলার (Cinderalla)* কাহিনীতে পাই। জাগরস্বপ্নে তাহার নিরুদ্দিষ্ট পিতা

---

* শিশুগণের প্রিয় এই গল্পে আছে যে সিণ্ডারেলা ছিল এক নিঃসঙ্গ, দুঃখী মেয়ে। তাহার দুষ্টপ্রকৃতির বিমাতা ও ভগ্নীরা তাহার উপর নির্য্যাতন করিত। শেষে তাহার পরীমা তাহার উপর সদয় হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহে সে প্রকাণ্ড গাড়ী, সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কার পাইল শেষে সেই দেশের রাজপুত্র তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন।

হইয়া দাঁড়াইত রাজবংশীয় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী ; মাতা তাহার বিমাতায় পরিণত হইত। মেয়েটি নাকি এসব শুনিয়াছিল এক অপরিচিত যুবকের মুখে। একখানি থালা ভাঙিয়া ফেলায় রুক্ষ কর্ত্রীর সহিত তাহার ঝগড়া হয়। তাহার ঠিক পরেই সেই যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। যুবকটি তাহাকে লণ্ডন লইয়া গিয়া উত্তমরূপে ভোজন করায়, উৎকৃষ্ট পোষাক ও অলঙ্কার কিনিয়া দেয়। এবং শেষকালে নিজ পরিচয় দেয় যে সে স্বয়ং যুবরাজ! মেয়েটির আসল কাহিনী ত কেহ শুনিবে না, উহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার পন্থাই হইল তাহার এই সব চুরি। রাজার মেয়ে, যুবরাজের বাগদত্তা বধূ, সোনা মুক্তার আড়ম্বর তাহার নিজস্ব প্রাপ্য। এইজন্য কর্ত্রীর অলঙ্কার কখনও কখনও শুধু ব্যবহারের জন্য 'ধার লওয়া' হইত, কিন্তু প্রায়ই সেগুলি কাছে থাকিয়াই যাইত! এই চৌর্য্যবৃত্তির দ্বিবিধ তাৎপর্য্য। একদিকে তাহার উপবাসী আত্মানুরাগ তৃপ্তিলাভ করিত ; অপরদিকে মাতা, শিক্ষয়িত্রী ও কর্ত্রীর কাছে যে অন্যায় ব্যবহার পাইয়াছিল, আর সারা জগৎ তাহাদের এই অবিচার সমর্থন করিয়াছিল, তাহারও প্রতিশোধ লওয়া হইত।

যে সকল ব্যক্তি চুরিমাত্রকেই অপরের দ্রব্য অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই সকল কথা পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে এই বিবরণ দ্বারা বালিকার দুষ্কৃতি সমর্থিত হইতেছে, তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই তাহার অন্যায়ের স্বরূপ অনেকটা বুঝা যায়। সমাজকে অপরাধীর হাত হইতে রক্ষা করা যে স্থূল বিচারনীতির কার্য্য, তাহার পক্ষেই অপরাধের স্বরূপ নির্ণয় করা যদি আবশ্যক হয়, তবে যে উচ্চতর বিচারবিধির উদ্দেশ্য অপরাধীকে তাহার নিজের গ্রাস হইতে মুক্ত করা, তাহার পক্ষে উহা অপরিহার্য্য নহে কি? এ ক্ষেত্রে স্বপ্নকল্পনা বিশ্লেষণের দ্বারা বালিকাটি নিজ প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়ার ফলে তাহার চরিত্র যে সম্পূর্ণ সংশোধিত হইল, একথা বার্ট বলেন না। তবে দেখা গেল যে তাহার চুরি বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত ও অনুরূপ অন্যান্য বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে অল্পবয়সে অপরাধ প্রবণতা বা দুষ্ক্রিয়তা (delinquency) সম্বন্ধে এইরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে বাল্যে লালনপালন ও পরিবেশ মন্দ হইলে তাহার সক্রিয় প্রভাব যে শুধু

শিশুর সচেতন চিন্তা ও স্মৃতির মধ্যেই থাকে, তাহা নহে; মনের গভীর প্রদেশেও উহা প্রবেশ লাভ করে। সেখান হইতে তাহারা যে ভাবে ক্রিয়া করে, তাহা ব্যক্তির দৃষ্টি এবং বোধশক্তির বাহিরে বলিয়া আরও বেশী অনিষ্টকর।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্ত্তমান অধ্যায়ে যে তথ্যগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহাতে প্রাণী সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা প্রারম্ভেই করিয়া লইয়াছি, উহা সমর্থিত হয়। বিশেষতঃ মানুষের আচরণে চেতনার স্থান কি, সে সম্পর্কে যে সমস্ত ত্রুটি ও ভুল ধারণা সচরাচর দেখা যায়, ইহা দ্বারা সেগুলি সংশোধনের সহায়তা হইবে। জীবপ্রকৃতির আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion), তাহা সংরক্ষণমূলক হউক বা সৃষ্টিমূলকই হউক, উহা সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রকাশ পাওয়াই হইল চেতনা, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অর্থে ইহার যতখানি তাৎপর্য্য ও মূল্য রহিয়াছে, তাহা কমাইবার চেষ্টা করা অন্যায়। কিন্তু প্রাণীজীবনের কথা বিবেচনা করিলে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে জীব যে আবেষ্টনের মধ্যে পুষ্ট হয়, উহার সহিত সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে চেতনা শুধু একটি। সংজ্ঞান আমাদের উচ্চতর ক্রিয়াবলীর উৎপত্তিস্থল, বাস্তবের সহিত যোগসূত্র। ইহার পিছনে বিশাল এষণাশৃঙ্খলা সজ্ঘবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি কখনও প্রত্যক্ষভাবে সংজ্ঞানে আসে না। অবশিষ্টাংশের মধ্যে আবার কতকগুলি এক কালে চেতনার অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহারা স্বাভাবিকভাবে নিজরূপে চেতনায় প্রবেশ লাভ করিতে অক্ষম। তাহা হইলেও জীবের এই সদাজাগ্রত আত্মসাম্মুখ্যের সেবা করিবার জন্য চেতনার যে ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এই সজ্ঘবদ্ধ এষণাগুলিকে বাদ দিয়া সম্ভব নয়, কারণ চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে এগুলির প্রকৃতি ও স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ পায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বলিয়াছি মানুষের ব্যক্তিতাকে পরিণত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে শৈশবলব্ধ গূঢ়ৈষাসমূহের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। এই প্রভাব আমাদের অভ্যাসের (habit) মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। উইলিয়াম জেমস (William James) এ বিষয়ের অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তাঁহার Principles of Psychology গ্রন্থ

দ্রষ্টব্য); যাঁহারই এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহার উহা পাঠ করা উচিত।

কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণায়, প্রধানতঃ মনঃসমীক্ষণকারীদের চেষ্টায় ইহার সম্পর্কিত আরও কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষার বিষয়ে উহাদের গুরুত্ব এত বেশী যে উহার একটু আলোচনা প্রয়োজন।

এই সকল ব্যাপারের উৎপত্তির কারণ এই যে, শৈশবের কতকগুলি প্রবল আকাঙ্ক্ষা মন্দ বা অশোভন বিবেচিত হওয়ার ফলে অবদমিত (repressed) হইয়া মনের নিভৃত অংশে থাকিয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি নির্জ্ঞানে (unconscious) থাকিয়া অনবরত অন্যায়, বিদ্রোহ ও অসন্তোষ ঘটাইতে পারে ; তবে যদি এগুলির মধ্যে অবরুদ্ধ শক্তির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া এমন কার্য্যে নিয়োজিত করা যায় যাহা বড়দের চক্ষে সুসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়, তবে আর এ আশঙ্কা থাকে না। এ পরিবর্ত্তনের নাম উদ্গতি (sublimation)। ফ্রয়েডের মতাবলম্বী মনঃসমীক্ষক লেখকগণের মতে যাঁহারা শিশুপালনের সহিত সংশ্লিষ্ট, এই প্রক্রিয়াটির বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথা খুবই সঙ্গত। অবশ্য ইহাও বুঝা দরকার হয় মানুষের সাধারণ শক্তি যদি এক দিক হইতে অন্যদিকে চালিত করা যায়, যেমন হয়ত এক যুবক অতিরিক্ত খেলার নেশায় বহু শক্তি ক্ষয় করিয়া শেষে উহা জনসেবা বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিল, তাহা হইলেই তাহাকে উদ্গতি বলা চলে না। আমাদের কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট এষণা যখন নূতনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নবরূপ পায়, ও তাহাদের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে উদ্গতি বলা হইবে। শিক্ষকের যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে তিনি শিশু বা কিশোরের সংজ্ঞাত জীবনের অন্তরালবর্ত্তী অতৃপ্ত এষণাসমূহের সন্ধান পাইবেন, এবং সেগুলিকে বাঞ্ছনীয় ও মহৎ আত্মসাম্মুখ্যের পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে যোগ্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিটিকে সমাজ হারাইতে বসিয়াছিল, সে হয়ত রক্ষা পাইবে। এখানে বলা যায় যে এই পদ্ধতিতেই হোমার লেনের (Homer Lane) "ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে" (The Little Commonwealth) তরুণ দুষ্ক্রিয়দের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হোমার লেন শৈশবের অতৃপ্ত

স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি অবদমিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপে পরিণত বয়সে সমাজবিরোধী ক্রিয়াতে পরিণত হয় তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করেন। সিরিল বার্টও সমান উদার সহানুভূতি ও আরও ঢের বেশী নির্ভুল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাসমূহ চালাইয়া এই কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তিতার স্বকীয় বিকাশই যে শিক্ষার কেন্দ্রগত লক্ষ্য, এই কথাটি মনঃসমীক্ষণের সত্যসমূহ দ্বারা যে বিশেষভাবে সমর্থিত হয়, তাহাতে কোনও সংশয় থাকে না। এই তথ্যগুলি হইতে প্রকাশ পায় যে ব্যক্তিতার ভিত্তি কত গভীর, ইহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে কত বৈচিত্র্য আছে, এবং ব্যক্তির বিকাশমুখী চরিত্রকে জোর করিয়া উহার সমগ্রতার নীতির বিরুদ্ধ কোনও রূপ দিতে গেলে তাহার পরিণাম কি ভীষণ দাঁড়াইতে পারে।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে এই সত্যের প্রতি এতদিন আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই কেন, এবং এখনও ইহা এত কম স্বীকৃতি পায় কেন, তাহার উত্তর এই যে, সাধারণ ক্ষেত্রে শৈশবের বিদ্রোহী বা অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার উদ্গতিসাধন অনায়াসেই গৃহ ও বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থার সাহায্যে সাধিত হয়। ইহার প্রভাবে শিশু সহজভাবে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। যেটিকে 'বেয়াড়া বয়স' বলা হয়, সেই বয়সটিতে শিক্ষার্থী সম্পর্কে শিক্ষকের সহিষ্ণুতা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সে নির্ব্বিঘ্নে উহা পার হইবে, এবং হয়ত এই উচ্ছৃঙ্খল অভিজ্ঞতাসমূহ হইতে কিছু সুফলতা লাভ করিতে পারিবে। ইহা শিক্ষকের পরম সন্তোষের বিষয় হইবে। অপরদিকে সব বিদ্যালয়েই কতকগুলি ছেলে মেয়ে থাকে, যাহাদের লইয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। শিক্ষক বা সহপাঠী, কাহারও সহিত তাহাদের বনে না, পড়ায় তাহাদের আদৌ মনোযোগ থাকে না, অন্য কোনও রূপেও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনের প্রভাব তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। এই অন্যায়কারীদের প্রহারদ্বারা বশে আনার চেষ্টা করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাতে যেটুকু সাফল্য দেখা যায় তাহা বাহ্য, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী অনিষ্টই হইয়া থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণই ধরা হইল, রোগের কারণ নহে। আমাদের মনে না হইলেও রোগের মূলে অনেক স্থলেই এমন কতকগুলি গভীররূপে নিহিত কামনা

থাকে যেগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। আর উদ্দাম রূপগুলি স্বভাবতঃই দমিত থাকায় সেগুলি মাঝে মাঝে শিশুকে এমন বিদ্রোহমূলক কার্য্যে প্রণোদিত করিতে থাকে যাহার কারণ শিশু নিজেই বুঝিতে পারে না; এবং কখনও বা তাহাকে শিক্ষা বা সামাজিকতার অযোগ্য করিয়া তুলে। কোন কোন চরম অবস্থায় অবদমিত আকাঙ্ক্ষা উদ্গতির অভাবে এমন হইয়া উঠে যে উহার ফলে কোনও শিশুর জীবন তাহার সমবয়সীদের জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একজন অতি বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষক সেইরূপ একটি উদাহরণ দিয়াছেন। কোনও বিদ্যালয়ের একটি বালিকা তের বৎসর বয়সেও পড়িতে বা লিখিতে শিখে নাই। বিদ্যালয়ে নিজে হইতে তাহাকে কখনও কোনও কথা বলিতে শুনা যায় নাই। কিন্তু সেই মেয়েটিকে যখন এমন এক পরিবেশে স্থানান্তরিত করা গেল যেখানে অবাধ বিকাশের সুযোগ ছিল, তখন দেখা গেল যে তাহার বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী এবং শীঘ্রই তাহার নিজস্ব শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য-সমূহের দ্রুত বিকাশ হইল।

তরুণ বয়সের সকল অবস্থাতেই এই সকল অভিজ্ঞতা দ্বারা শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবার পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে, তবে বিশেষভাবে কৈশোরের (adolescence) প্রথম দিকে এগুলির বিশেষ দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা। এই সময়ে মনে যে সকল নূতন ভাবের সঞ্চার হয়. সেগুলির সহিত নির্জ্ঞানমধ্যস্থ পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষাসমূহের সহজেই বিরোধ ঘটিতে পারে; ফলে এমন মানসিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে উদ্গতি ব্যতীত তাহার কোনও প্রতিকার থাকে না। বিদ্যালয় বালক-বালিকাকে নির্ব্বিঘ্নে এই উদ্গতিসাধনের বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে, ফলে কৈশোরের মানসিক দ্বন্দ্বের এমনই রূপান্তর ঘটে যে উহাতে কোনও বিরোধ থাকে না এবং উহার শক্তিসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ বিদ্যালয় ভালভাবে পরিচালিত হইলে একদিকে বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পুষ্টিসাধনের জন্য নব নব ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে পারে, আবার অপরদিকে এমন এক স্বাস্থ্যকর সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলে যাহা তরুণ বয়সের শক্তিসমূহকে পরিচালিত করিতে ও পরিণত রূপ দিতে পারে। বৃদ্ধির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে এই বয়সে মানুষের শক্তিসমূহ তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল গৃহ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিতে আরম্ভ

করে। এই বয়সের বালকবালিকারা এই সুযোগ অধিক পাইলে ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক উন্নতিও অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে।*

---

* এখানে শিশুসহায়ক ব্যবস্থার (Child-Guidance) উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার উৎপত্তি আমেরিকায়, পরে অন্যান্য দেশেও ইহার বিস্তার হইয়াছে। ইহাতে যে সমস্ত চিকিৎসালয় (clinics) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে শিক্ষক ও মাতাপিতাগণ শিশুপরিচর্য্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাইতে পারেন। যে সকল শিশু ঠিক দুষ্ক্রিয় নয়, তবে বেয়াড়া, যেমন হঠাৎ অকারণে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়, অন্যায়াচরণ করে, তাহাদের সম্বন্ধে যথাযথ বিধান দেওয়া হয়। বাড়ীর অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয়। এবং এগুলির বাহ্য প্রভাবের সহিত শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশেও এগুলির প্রভাব কিরূপ, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। এই ব্যবস্থার যে কি অশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুনরাবৃত্তি

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানুষের ক্রিয়াসমূহকে সংরক্ষণমূলক ও সৃষ্টিমূলক, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেখানে উহার উদ্দেশ্য হইল পরিবর্ত্তনের মুখেও পুরাতন আকার বজায় রাখা, সেখানে উহাকে সংরক্ষণমূলক বলা যাইবে; আবার যখন নূতন কিছু করা হয়, তখন উহা সৃষ্টিমূলক। এই পার্থক্য ও এষণা এবং স্বতঃস্মৃতির মধ্যে প্রভেদটি যে এক, তাহা মনে করিলে অবশ্য ভুল হইবে। এষণার ক্রিয়ার মধ্যেই সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এই দুটি দিকই রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এষণামূলক প্রেরণা, সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ায় যেমন, সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াতেও তেমনই প্রকাশ পায়। মানুষ অনেক সময়ে যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করে, অথচ যাহা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাহার আগ্রহের অভাব দেখা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে, সংরক্ষণমূলক এবং সৃষ্টিমূলক ক্রিয়া উভয়ই মানুষের সক্রিয় বাহ্য প্রকাশের পক্ষে সমান স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে শেষ পর্য্যন্ত প্রথমটির পোষকতা করাই দ্বিতীয়টির কার্য্য, তাহা বুঝা যায়।

শিক্ষার দিক হইতে এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার বয়স হইবার বহু পূর্ব্বে, ক্ষুদ্র শিশুর আচরণেও, এই সংরক্ষণমূলক এবং সৃষ্টিমূলক বৃত্তিগুলির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শিশুচরিত্রে সংরক্ষণমূলক বৃত্তির প্রাধান্য কতখানি হইতে পারে, সে আলোচনা করিব। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সৃষ্টিমূলক বৃত্তিসমূহ কেমন ভাবে প্রকাশ পায়, সে কথা বলা যাইবে।

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, ক্ষুদ্র শিশুদের নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও প্রবল সংরক্ষণশীলতা অদ্ভুতভাবে বর্ত্তমান থাকে। যে শিশু আমাদের পুরাতন প্রচলিত ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিয়া নূতন জীবনযাত্রাপ্রণালীর সূত্রপাত করিতে চায়, সেই শিশুই আবার বিধান শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার প্রবল সমর্থক। যে স্ত্রীলোককে কখনও অপরের শিশুদের দেখাশুনা করিতে হইয়াছে,

তিনিই জানেন যে মুখ হাত ধোওয়া, কাপড় ছাড়া ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করা, বা আহার নিদ্রার পুরাতন নিষ্ঠা লঙ্ঘন করা কি ভয়ানক ব্যাপার! শিশুকে কোনও পরিচিত গল্প বলিবার সময়ে যদি কাহিনীর একটু এদিক ওদিক হয়, তৎক্ষণাৎ শিশু সেই ভয়ঙ্কর ত্রুটির কথা জানাইয়া দিবে।

এই ধরণের আচরণে যে শুধু পরিবর্ত্তনের অনিচ্ছা সূচিত হয় তাহা নহে, উহার সঙ্গে আছে অতীত ক্রিয়ার পুনঃসংঘটন ও পরিচিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির অনুরাগ। সকল দেশের শিশুদের খেলা, ছড়া, গল্প, কাহিনীতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা বলিব পুনরাবৃত্তি প্রবণতা (routine tendency)।

এই যে সরল পুনরাবৃত্তি শৈশবের আনন্দানুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, ইহারই পরিণত ও মার্জ্জিত রূপ দেখা যায় নৃত্য সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে তালছন্দসমন্বিত পুনরাবৃত্তিতে। পুনরাবৃত্তি প্রবণতা যে সমগ্র জীবজগতেরই মূলাধার, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, মাংসপেশীসমূহের ক্রিয়া, অহরহ এই পুনরাবৃত্তির ছন্দেই সাধিত হয়। বিশ্বজগতে পুনরাবৃত্তির নিয়মে দিন ও বৎসর আসে যায়; মানুষের জীবনও তাহারই সহিত এক তালে চলে। সুতরাং ছন্দের অনুভূতি ও সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ আছে, এবং শিল্পের বিকাশে ইহার যে বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে, তাহা স্বাভাবিক। আদিম জাতিগণের সঙ্গীতে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উহার তাল বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ধ্বনি বা সুরগত পরিণতি কিছুই হয় নাই; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

পুনরাবৃত্তি প্রবণতার মধ্যে শিশুর যে সমস্ত খামখেয়ালী বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সেগুলিই সভ্য আচরণ ও সামাজিকতার আদর্শে পুনর্গঠিত হয়। এই প্রবৃত্তির সহিত নৈতিক বোধের যে সম্পর্ক আছে, তাহার কথা আমরা পরে বলিব; ইহার সহিত বিদ্যালয় ও শ্রেণী পরিচালনার যে গুরুতর সম্পর্ক আছে, তাহারই উল্লেখ সর্ব্বাগ্রে করিব।

গ্রেহাম ওয়ালাস (Graham Wallas) বলেন যে বিদ্যালয়ের শ্রেণী-শৃঙ্খলার মূলে অধিকাংশ স্থলে আছে অর্দ্ধচেতন (semi-conscious) অনুকরণস্পৃহা। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা

হইতে এরূপ মনে হইলেও, বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনাশ্রিত স্থায়ী শৃঙ্খলার ইহা আংশিক কারণমাত্র। এ শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাকে এই পুনরাবৃত্তিস্পৃহারই একটি ক্রিয়া বলিয়া মনে করিতে হইবে। জীবনযাত্রার কোনও একটি ধারা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই স্পৃহাই তাহাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রবল চেষ্টা করে। বিবেচনাশীল শিক্ষক এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, শ্রেণীশাসন সম্পর্কে এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ হইয়া গেলে এই স্পৃহাই তাহাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রবল চেষ্টা করে। বিবেচনাশীল শিক্ষক এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, শ্রেণীশাসন সম্পর্কে এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে প্রথমে চেষ্টা করিতে হইবে যেন বিদ্যালয় ও শ্রেণীর যাবতীয় কার্য্য এক সম্পূর্ণ অথচ সরল বিধান মানিয়া চলে। পরে সে বিধান অবাধে আপনা হইতেই যাহাতে অনুসরণ করা হয়, যত দূর সম্ভব সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিধানের কোনও পরিবর্ত্তন যদি নিজে হইতেই হয় এবং তাহাতে কোনও দোষ না থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে তাহাতে বাধা দেওয়া ঠিক হইবে না। আবার নিজে উহার কোনও অপ্রয়োজনীয় বা বিরক্তিকর পরিবর্ত্তন করা অনুচিত হইবে। এমন কি, যে নিয়মাবলী পুনরাবৃত্তি প্রবণতা দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহা মন্দ হইলেও তাহাকেই উপস্থিত চলিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। এবং পরে উহার সংশোধনের জন্য ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করা ও সতর্কভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের প্রতিও তাঁহার আচরণ এরূপ হওয়া উচিত নহে যেন এক সর্ব্বশক্তিমান্ নরপতির বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে; ইহাই বুঝিতে দেওয়া দরকার যে তিনিও অন্য সকলেরই সমান একজন, শুধু সকলকার সুবিধার জন্য শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এক কথায়, যন্ত্রের মধ্যে যেমন মূল চক্র (fly-wheel) থাকে, উহার অবিরাম-গতিই যন্ত্রকে সবল ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, এবং মুহূর্ত্তের জন্য যদি যন্ত্রের প্রধান শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তবে উহাই যন্ত্রটিকে চালিত রাখে, এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতার কার্য্যও বিদ্যালয় জীবনে, বা ব্যাপক সামাজিক ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত।

উচ্চতর স্তরের কার্য্যাবলীতেও ইহার প্রভাব দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মর্য্যাদা

ও সুনাম রক্ষার ব্যাপারে। কারণ যাহাকে প্রকৃত বিদ্যালয়শৃঙ্খলা বলা যায়, শুধু শান্তভাবে আদেশপালনই তাহা নহে, আর সে শৃঙ্খলার এই গুলিই আসল ভিত্তি। এই প্রভাবে কিছুকাল থাকিলে ইহা তরুণ ছাত্রদের মনে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে।

সংরক্ষণশীলতা শৈশবে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা রূপে যখন এতখানি সুপরিস্ফুট, তখন এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, অধিক বয়সের তুলনায় বাল্যে ইহার কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে। এ অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত। বার্দ্ধক্যে যে আমরা পরিচিত ও অভ্যস্ত জিনিষ আঁকড়াইয়া থাকি, তাহার কারণ নূতন পথে আমাদের চিন্তা ও ক্রিয়া চালাইবার মত শক্তি তখন আর আমাদের থাকে না। তখন যেন পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, সে অবস্থায় কোনরূপে নিজেকে চালাইয়া লইয়া যাওয়ার কার্য্যেই আমাদের আত্মসাম্মুখ্য সীমাবদ্ধ থাকে। বিপরীতরূপে কিন্তু শৈশবে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা অতিরিক্ত শক্তির পরিচায়ক। দেহ বা মনের শক্তি বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য শিশু ব্যাকুল, অথচ প্রয়োগের উপায় তাহার অতি অল্পই জানা আছে। সেইজন্য সে পরিচিত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে চায়—ইহাতেই পরিপূর্ণ ও সফলভাবে তাহার আত্মসাম্মুখ্যের পরিতৃপ্তি হয়।

এই উক্তির বিশেষ কার্য্যকরী গুরুত্ব আছে। আধুনিক শিক্ষকগণ অনেক সময়ে শিশুর নিজস্ব চেষ্টা ও ক্রিয়ায় উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতার গুরুত্ব ভুলিয়া যান। আগে শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সব ভুল করা হইত, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁহারা পরিচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তিকেও অন্যায় মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে উহা যন্ত্রবৎ ক্রিয়া, মুখস্থ বিদ্যা ; আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে শিশু ইহাতে যে আনন্দ পায়, জীববিদ্যায় তাহার অতি সঙ্গত কারণ আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের আধিপত্য বিস্তারের ইহাই অপরিহার্য্য পন্থা। সেইজন্য নবীন শিক্ষক নিশ্চিন্তচিত্তে এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে পারেন যে নামতা, তারিখের তালিকা, ব্যাকরণের সূত্র, শব্দরূপ পাটীগণিত ও বীজগণিতের প্রক্রিয়াদি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা শিক্ষানীতি অনুমোদিত নহে, এগুলি শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে হয়। যে শিশু ছেলেবেলায়

প্রিয় ছড়া আবৃত্তি করিয়া আমোদ পায়, সে এই পুনরাবৃত্তির সাহায্যেই আরও কঠিন বিষয় আয়ত্ত করার বেলায়ও আনন্দ পাইবে।

এই যুক্তিদ্বারা অবশ্য এ কথা বুঝায় না যে, শিক্ষক শিশুর পুনরাবৃত্তি প্রবণতার বুদ্ধিসঙ্গত প্রয়োগ করিবেন না। যেমন, ইতিহাসের সাল তারিখ মুখস্থ করাইবার উদ্দেশ্য হইল, ইতিহাসের ঘটনা ও তথ্যগুলি ঘটিবার সময় ঠিকভাবে না জানিলে সেগুলি অর্থহীন ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িবে। ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করাইবার সময়ে চেষ্টা করিতে হইবে যে, ছাত্রগণ ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ হইতে যাহা পাইয়াছে, সেই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে। অন্য সব ক্ষেত্রেও তাই। কেহ কেহ বলেন যে কবিতা বা গদ্য মুখস্থ করার বেলায় এ নিয়ম খাটে না, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিশু মুখস্থ করা অংশটির অর্থ ভালভাবে না বুঝিলেও চলিবে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে শিশু যখন পুনরাবৃত্তিতেই আনন্দ পায়, তখন ইহার সাহায্যে তাহার মনে এমন সকল সন্দর্ভ সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত, যেগুলির তাৎপর্য্য ও সাহিত্যিক মূল্য সে আরও কয়েক বৎসর গেলে বুঝিতে পারিবে। এই যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। একথা ঠিক যে, অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য দেখিতে সহজ হইলেও তাহার তাৎপর্য্য ও সৌন্দর্য্য এত গভীর হয় যে, অল্পবয়সে তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও উহার মধ্যে যদি শিশুর বোধগম্য কোনও অর্থই না থাকে, তাহা হইলে শুধু আবৃত্তির দ্বারা উহা শিখান উচিত নহে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উপরের নিয়মগুলি কলা ও কারুশিল্প শিক্ষাদানের বেলাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, শিল্পের কোনও একটি গঠনপদ্ধতি শিশু আয়ত্ত করিয়া লইলে আর তাহাকে সেটির পুনরাবৃত্তি করান চলে না। তখন তাহাকে নূতন একটি প্রণালী ধরানো প্রয়োজন। ইহাতে তাহার স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়ার নব সমন্বয় ঘটিবে, মনে নূতন ভাবও জাগিবে। এ যুক্তি যথার্থই ভ্রান্ত। পরে দেখা যাইবে যে, শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিতে হইলে শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিতেই হইবে। বারবার অনুশীলন করিয়া যতক্ষণ না পরিচিত পদ্ধতিগুলি আমাদের সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও গঠনমূলক শিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, একটুও যথার্থ

উন্নতি সম্ভব নয়। এই সঙ্গে শুধু একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। তাহা এই যে শিল্পশিক্ষা কখনও যেন এমন না হয় যে সৃষ্টির কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে ব্যাকরণ মুখস্থের মত হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রথম শিক্ষার্থীর সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার স্বরগ্রামও শ্রুতিমধুর হওয়া চাই; এবং শিল্পে গঠনপদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইলে যাহার নিজস্ব কোনও আকর্ষণ আছে, এমন সব জিনিষ গড়িয়াই উহা শিখিতে হইবে। শিক্ষা অগ্রসর হইলে শিল্প-পদ্ধতিকে খণ্ড পদ্ধতি হিসাবে শিখানো চলিতে পারে, যেমন ছুতোরের কার্য্যে জোড় দেওয়া, সূচীকার্য্যে বোতামের ঘর সেলাই করা, প্রভৃতি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা এমনই হওয়া চাই, যেন তরুণ শিল্পী কোনও বাস্তব জিনিষ উদ্দেশ্যেই এইগুলি অভ্যাস করিয়া লইতে পারে। দেহসঞ্চালনের ব্যায়াম-কৌশলেও এই কথা খাটে। আর বর্ত্তমানে তাই উহার পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। শিক্ষায় প্রয়োজনীয় দৈহিক ভঙ্গীগুলি এখন বেশীর ভাগ এমন সব খেলার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয় যেগুলি বিজ্ঞানসম্মত অথচ উহাতে আনন্দ ও উত্তেজনার অভাব নাই। নীরস ড্রিলের প্রচলন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

উপরের বিষয়টি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের (Freud) যে মতবাদ রহিয়াছে, তাহার কতকাংশ আমাদের যুক্তির সহিত মিলে, আবার কতকটা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি দেড় বৎসর বয়স্ক এক ছেলের খেলার কথা লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। শিশুটি মাতার একমাত্র সন্তান এবং তাঁহাকে সে বড় বেশী ভালবাসিত। এই শিশুর প্রকৃতি এদিকে ভাল, কিন্তু তাহার এক বেয়াড়া অভ্যাস ছিল যে, নিজের খেলনা বা অন্য ছোট জিনিষ সে ঘরের আর এক-দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিত। সঙ্গে সঙ্গে এক চীৎকারধ্বনি করিত, সম্ভবতঃ "চলে যাও" এই কথাটি বলিবার চেষ্টা। ইহা হইতে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ছেলেটি এইভাবে নিজ প্রিয়বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। এই খেলার পুনরাবৃত্তি করিয়া আসলে সে নিজের মাতাকে ছাড়িয়া থাকার কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস করিতেছে। কারণ মাতা নানা সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতেন বলিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ বেচারাকে প্রায়ই ভোগ করিতে হইত। ভ্যালেণ্টাইন (Valentine) বর্ণিত তিন বছরের একটি ছেলের আচরণেও এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইতে পারে। এ ছেলেটি বারবার তাহার পিতাকে সিংহ সাজিয়া

তাহাকে তাড়া করিতে বলিত, এমন কি যখন এ খেলাটি ভীষণ ও কান্নাকাটির মধ্যে শেষ হইত, তখনও আবার সেই খেলা খেলিতে চাহিত। ছোট ছেলেরা নানাবিধ ভূতুড়ে ভয়ের কাহিনী বারবার শুনিয়া যে ভয় মিশ্রিত আনন্দ লাভ করে, সেও হয়ত এই জাতীয়। ফ্রয়েড শৈশবের এই আচরণের সহিত পরিণত বয়সের একটি সুপরিচিত অভ্যাসের তুলনা করিয়াছেন। আমরা জানি যে কোনও কঠিন আঘাত পাইলে স্বপ্নে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা হয়। এই সমস্ত হইতে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করেন যে জীবের পুনরাবৃত্তির এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা আছে। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি (repetition compulsion)। বহির্জগত হইতে যে সমস্ত প্রভাব আসিয়া প্রাণীর শান্তিভঙ্গ করে, সেগুলির শক্তি কমাইয়া সেগুলিকে তাহার সহনীয় করাই ইহার জীববিদ্যা মূলক উদ্দেশ্য।

আমাদের যুক্তির সহিত এই মতবাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কারণ ইহাতে পুনরাবৃত্তি প্রবণতা বা অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তিকে মানসিক জীবনের ভিত্তিরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিশুর নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করিবার কৌশলরূপেও ইহাকে ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই মতবাদকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে এই বৃত্তি শিশুকে বড় হইবার বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। আবার ফ্রয়েড যে বলিয়াছেন শিশু এই বৃত্তির সাহায্যে দুঃখকর অভিজ্ঞতা সহ্য করিতে সমর্থ হয়, এ যুক্তিতেও যথেষ্ট সত্যতা আছে তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত মিল থাকিলেও, মোটের উপরে এই বিষয় সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্যের সহিত এই গ্রন্থে প্রদত্ত মতবাদের গুরুতর বৈষম্য রহিয়াছে। ফ্রয়েডের যুক্তি দার্শনিকপ্রবর শোপেনহয়ারের (Schopenhauer) কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয়ের অসাধারণ প্রতিভারও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাঁহারই মত ফ্রয়েডেরও যেন ধারণা যে, প্রাণীর জগতে আসাই ভুল, দেহ ধারণ করা পরম দুঃখের বিষয়। বোধ হয় এই কথা বলিলে আরও সঙ্গত হয় যে, তিনি প্রাণীজীবনে এই প্রমাণই পাইয়াছেন যে প্রাণী নিজেই বুঝিতে পারে যে জন্মিয়া সে ভুল করিয়াছে। বাহির হইতে যদিও মনে হয় সে নিজ জীবন উপভোগ করিতেছে, তবু সে ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হইতে বাহ্য ঘটনার নির্ম্মম

প্রভাবের ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সে সর্ব্বদাই সেই শান্তির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াসী। এই অনুকর্ষী পুনর্ব্বৃত্তি প্রাণীকে জীবনের অভিশাপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহন করিবার সামর্থ্য যোগায়। আবার জীব যে প্রাণীজীবনের উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থাতে ফিরিয়া যাইবার জন্যই ব্যাকুল, তাহাও এই বৃত্তিতে প্রকাশ পায়। যেমন, প্রাণীর প্রবৃত্তিসমূহ (instincts) দেখিয়া এই ভ্রমাত্মক ধারণা হয় যে এগুলি বুঝি পরিবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য লালায়িত। আসলে এগুলি পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইবার অতি প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

এই মতবাদে তীব্র দুঃখবাদের সুর ধ্বনিত হইতেছে। ইহার উপর কোনও মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। পাঠক নিশ্চয় জানেন যে, আমাদের সকলেরই কোনও কোনও সময়ে এই মনোভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু যথার্থভাবে বিবেচনা করিলে জীবনকে অভিশাপের পরিবর্ত্তে বর বলিয়াই মনে হইবে। আরও বুঝা যাইবে যে, প্রবৃত্তিগুলি যে অনুকর্ষী পুনর্ব্বৃত্তিরূপে দুঃখময় জীবনের আবর্ত্তনচক্র চালাইয়া যাইতেছে তাহা নহে, প্রাণী যে অসীম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তাহারই পথ ইহারা উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে।

এখন আমরা আর এক শ্রেণীর নিয়মবদ্ধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিব। ইহার পরিচিত দৃষ্টান্ত নানা উৎসবগুলিতে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, বিবিধ পূজানুষ্ঠান, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানগুলির রূপ ও পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল হইতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া একভাবে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়াসমূহের এবং এগুলির সার্থকতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আগেকার ক্রিয়াগুলির নিজস্ব মূল্য আছে, অর্থাৎ ক্রিয়াগুলি বাঞ্ছিত এবং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানসমূহের ক্রিয়া হিসাবে স্বকীয় কোনও গুরুত্ব নাই, কেবল প্রতীকরূপেই ইহাদের মূল্য আছে। এক কথায় আমাদের জীবনে এই ক্রিয়াসমূহের উপকারিতা হইল এই। যখনই এগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তখনই অনুষ্ঠাতা ও দর্শক উভয়েরই মনে যে ভাব বা প্রক্ষোভ (emotion) উদিত হয়, প্রায়ই সেগুলির যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব থাকে।

এই সব আনুষ্ঠানিক উৎসব সংযত ও সভ্য মানুষের জীবনেও কতখানি

স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমরা সচরাচর উপলব্ধি করি না। কিন্তু আদিম জাতিসমূহের আবার যে সমস্ত বিশাল অনুষ্ঠানব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় অতি ভাবপ্রবণ সভ্যজাতির অনুষ্ঠানগুলিও প্রায় কিছুই নহে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন কালের ঋতুপরিবর্ত্তন উৎসবের উল্লেখ করা যায়। সেকালের অরণ্যচারী, কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতিগণের মধ্যে উৎসবগুলির বিভিন্ন প্রকারভেদ ছিল। এবং এগুলির বিশুদ্ধ সংস্কারবদ্ধ সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, শস্যকর্ত্তন ইত্যাদির অতি মনোরম প্রাচীন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আছে। এগুলির সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা খুবই বেশী, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে এগুলির পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, আর অন্যান্য বহুস্থানে নানাভাবে এগুলি অনুষ্ঠিত হইতেছে। জাতীয় জীবনে এগুলির উপকারিতা যথেষ্ট। সেকালের লোকের পক্ষে এগুলি বড়ই মঙ্গলকর ছিল। কারণ সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করিলে ধরিত্রীর অনুগ্রহে যথাসময়ে ফলটি পাওয়া যাইবে। আধুনিক মনোবিদ্যার দিক হইতে এই আচারসমূহের কার্য্যকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। এগুলি সাক্ষাৎভাবে শস্য উৎপাদন অবশ্য করিত না, কিন্তু গৌণ ভাবে এগুলিরই ফলে লোকের মনে খাদ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে অস্পষ্ট দুশ্চিন্তাটি এক বিরাট সামাজিক প্রক্ষোভে পরিণত হইত, আর সেজন্য ব্যক্তিগত চেষ্টার অনুপ্রেরণা এবং সুসমন্বয় সাধনও সহজেই ঘটিত।

কোন কোন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেন যে প্রাচীন ধর্ম্ম ও শিল্পকলার আরম্ভ এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে হইয়াছিল। অবশ্য বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও শিল্পের উৎপত্তি সম্পূর্ণভাবে এই সব প্রাচীন আচার হইতে হইয়াছে, এ কথা বলিলে বড়ই ভুল হইবে। তাহা হইলেও, সংক্ষিপ্তাবৃত্তিবাদে (recapituation-theory) সত্য যদি কিছু থাকে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তাহা হইলে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিলে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াও বিদ্যালয়জীবনে গুরুতর কার্য্যকরিতা রহিয়াছে। রথযাত্রা, রামলীলা, প্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব, গ্রামের নৃত্য উৎসব ইত্যাদি আর অতীতের এই সব অনুষ্ঠান বজায় রাখিবার ও পুনঃপ্রচলিত করিবার বিষয়ে সকলের আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যায় যে বৃহত্তর জগতেও জনসাধারণের মনে ভাব সঞ্চারিত ও উদ্দীপিত করিবার শক্তি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে

আছে। সুতরাং আমরা পূর্ণতর বিশ্বাসে ইহাকে শিশুর শিক্ষায় অধিক স্থান দিতে পারি এবং ইহার সাহায্যে শিশুদের সামাজিক ভাবকে গভীর ও পবিত্র করিয়া তুলিতে পারি। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমে চাই যে উপলক্ষ্যটি মহৎ হইবে এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে আন্তরিকতা থাকিবে। শেষোক্ত গুণটি ব্যায়াম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে রহিয়াছে, কিন্তু আরও সুন্দর বা বৈচিত্র্যময় উপলক্ষ্য এগুলির চাই, চেষ্টা করিলে সহজেই তাহা পাওয়া যাইবে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর আবাহনে গান, শোভাযাত্রা, নৃত্যানুষ্ঠান করিয়া শিশুরা আনন্দ পাইবে। একটু অধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের কোন বিশেষ ঘটনা, যেমন পারিতোষিক বিতরণ ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন, স্বাধীনতা দিবস অথবা জাতীয় ও নাগরিক জীবনের বা ইতিহাসের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দেখা দরকার যে, অনুষ্ঠানে বাহ্য কর্তৃত্বের ছাপ যেন বিশেষ নজরে না পড়ে; বিদ্যালয়সমাজের সভ্য যাহারা, তাহাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টাকে উন্নত ও মার্জ্জিত করিয়া তাহারই সাহায্যে অনুষ্ঠানটি যেন সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, শিল্পীদের কাজ থাকিবে। আবার যে ছেলেমেয়েদের কোনও বিশেষ কোন গুণ নাই, যাহারা শুধু পতাকা বহিতে বা সমবেতভাবে গান গাহিতে পারে তাহাদেরও সুযোগ দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

খেলা

আমরা দেখিলাম যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পুনরাবৃত্তি শিশুজীবনের মূলধর্ম্ম। এবং এগুলিতে শৈশবের সংরক্ষণশীলতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াবলীরও এক পরিচিত বিশিষ্টরূপ আছে। তাহা হইল খেলা। খেলার স্বকীয় গুণ অতি আশ্চর্য্য। জীবনের এমন সব অংশে ইহার প্রভাব দেখা যায় যেখানে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই ছিল না। তবে আমরা সকলেই জানি যে, শৈশবই খেলার বিশেষ ক্ষেত্র। এই সময়ে উহা যে ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অর্থাৎ বাহ্য প্রয়োজন ও প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত। এইজন্য সচরাচর খেলাকে 'অতিরিক্ত শক্তি' (superfluous energy) নির্গমনের পন্থা বলিয়া ধরা হয়। এই কথা বলা হয় যে বাল্যে ও যৌবনে প্রাণীর যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকে, উহা তাহার জীবনধারণ এবং দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে অতিরিক্ত, এই উদ্বৃত্ত শক্তিই প্রধানতঃ খেলায় ব্যবহৃত হয়।

এই অর্থে ক্রীড়াকে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের সহিত তুলনা করা যায়। কয়লা হইতে এঞ্জিনের এত শক্তি আসিয়া গিয়াছে যে গাড়ী টানার কাজে লাগিয়াও কিছু বাকী থাকে। সুতরাং বাষ্প ছাড়িয়া দিয়া সেই শক্তি বাহির করিয়া দিতে হয়। কিন্তু একদিক হইতে এই উপমাটি ভুল হয়। আধুনিক রেল-গাড়ীর এঞ্জিনে গাড়ী টানার উদ্বৃত্ত শক্তির অনেকটা ব্রেক চালানো, গাড়ী-গুলিকে গরম বা ঠাণ্ডা রাখা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এমন কল্পনা করা চলে না যে, ঐ শক্তির সাহায্যে এঞ্জিনটির নিজেরই উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু দেহমনধারী জীবের বেলায় খেলা ঠিক সেই ধরণের কার্য্যই করিয়া থাকে। শিশু প্রথমে বিছানায় শুইয়া হাত পা আঙুল নাড়ে, পরে দৌড়া-দৌড়ি করে, আরও পরে খেলার মাঠে প্রচলিত ক্রীড়াদিতে যোগ দেয়। এই

সকল খেলার দ্বারা শিশু ক্রমশঃ নিজের দেহকে বশে আনে এবং উহার শক্তি যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করে। আবার খেলার সাহায্যে সে নিজ বুদ্ধি প্রতিভার উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধন করে। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রধানতঃ কোন্ বিষয়ে তাহার আগ্রহ হইবে, অনেক সময়ে খেলার ভিতর দিয়া সে তাহার সন্ধান পায়। সর্ব্বোপরি ইহাও আমরা জানি যে, পুরাকালে গ্রীকদের জীবন ও রীতিনীতির আদর্শ যেমন বিরাট ক্রীড়া ও অনুষ্ঠানক্রিয়াগুলির সাহায্যে পুষ্ট ও প্রসারিত হইত, ভারতে ক্ষত্রিয়সন্তানগণ যুদ্ধের ক্রীড়া ও অনুশীলন দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করিতেন, তেমনই এখনকার দিনেও বহু বালকের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানতঃ কৈশোরের দলবদ্ধ ক্রীড়াগুলিরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এ কথা ক্রমশঃ বালিকাদের বেলায়ও সত্য হইয়া উঠিতেছে।

এই সমস্ত পরিচিত ব্যাপারে এই একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে প্রাণীর খেলার ক্ষেত্রেও তাহার অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার নিয়মটি খাটিবে; উহা প্রাণীর ক্রীড়ার বেলায়ও যদি প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা রুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহার ফলে গঠনের সমগ্রতা, বা অভিব্যঞ্জকতা (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), অথবা বহুত্বের মধ্যে একত্ব সাধনের পূর্ণতর সাফল্যই সাধিত হইবে। ইহা হইতে এই ধারণাই হয় যে প্রকৃতিদেবী প্রাণীর শৈশবের অতিরিক্ত শক্তি নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া দিবার জন্যই শুধু খেলার সৃষ্টি করেন নাই, প্রাণীকে জীবনের কঠিনতর ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করাও খেলার কার্য্য।

খেলা যে প্রাণীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই মতবাদ গঠন ও সমর্থন করেন কার্ল গ্রুস (Karl Groos)। গ্রুসের মতবাদে দুইটি যুক্তি আছে। প্রধানতঃ তিনি বলেন যে, ক্রীড়া সেই সমস্ত জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাহাদের জন্মকালে এতখানি পরিণত অবস্থা থাকে না যে মাতাপিতার সাহায্য ও যত্ন ব্যতিরেকে উহারা জগতের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে পারে। যেমন কুকুরছানা জন্মের সময় থাকে দৃষ্টিহীন, অসহায়, সে কয়েকমাস শুধু খেলিয়াই কাটায়, কিন্তু কুক্কুটশাবক জন্মের কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চাউলের দানা বা পোকা খুঁটিয়া খাইতে পারে, তাই প্রথম হইতেই তাহার আচরণে কতখানি গাম্ভীর্য্য। দ্বিতীয়তঃ, গ্রুস

আমাদের লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন যে, প্রাণী খেলা করিবার সময়ে নিজ ভবিষ্যত জীবনের পরিণত ক্রিয়াকলাপই সর্ব্বদা ক্রীড়াচ্ছলে অনুকরণ করে। বিড়ালছানা পরে যে ভাবে ইঁদুর শিকার করিবে, সেইভাবে এক পশমের বল লইয়া খেলে। কুকুরছানা ভবিষ্যতে যেরূপ শত্রুকে তাড়া করিবে বা শত্রুকে এড়াইবে, শৈশবে অন্য কুকুরছানার সহিত সেইরূপ খেলা করে। এই ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের ব্যাখ্যাও সহজ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ উচ্চতর প্রাণীদের অল্পবয়সে খেলা উহাদের জীবনসংগ্রামে সুসজ্জিত করিয়া তোলারই জীববিদ্যাসঙ্গত (biological) কৌশল। এইজন্য গ্রুস বলিলেন যে প্রাণী যতদিন ছোট থাকে, ততদিন খেলে, এ বলিলে ঠিক হয় না। বরং বিপরীতভাবে বলা উচিত যে, প্রাণীর পক্ষে যতদিন খেলা করিবার এবং খেলার দ্বারা পূর্ণ জীবনের কঠিন কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা করার প্রয়োজন থাকে, তাহার শৈশবও ততদিনই স্থায়ী হয়।

শিশুর খেলায় এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। ছোট মেয়ের পুতুলের প্রতি টান দেখা যায়। খেলার মধ্যে যে পরিণত জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস থাকে, তাহার ইহা অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির মধ্যেই যে সমস্ত খেলার ব্যাপক ও নিয়মিত প্রচলন রহিয়াছে, সে সবেরও এই একই অর্থ করা যায়। কিন্তু সকল মানসিক ব্যাপারের ন্যায় খেলার সম্পর্কেও মানুষ ও ইতর প্রাণীর বেলায় এক গুরুতর প্রভেদ আছে। ইতর প্রাণীদের ভবিষ্যত জীবনের ক্রিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তাহাদের রূপও অনেকটা নির্দ্দিষ্ট। সেইজন্য এক এক জাতির প্রাণীর খেলাও একই ধরণের, উহাতে বৈচিত্র্য বেশী দেখা যায় না। অপর পক্ষে, মানবশিশুর ভবিষ্যত জীবন অনেকটা অনির্দ্দিষ্ট থাকে। সেই জন্য প্রকৃতির বিধান এই যে, ইতর প্রাণীর শাবক যে সমস্ত ক্রিয়া ভবিষ্যতে সত্যই করিবে, খেলার সময়ে সে সেইগুলির মহলা করে। কিন্তু মানবশিশু খুব ছোটবেলা হইতেই সব রকম ভঙ্গী অভ্যাস করে এবং অসংখ্য ক্রিয়া অনুকরণ ও উদ্ভাবন করে। এইভাবে একটু বড় হইলে সে খেলাছলে কখনও হয় বিমান চালক, কখনও বা নাবিক, ডাকহরকরা, শিকারী বা এমনই বিচিত্র আর কিছু। শৈশবে অনবরত যে মনভুলান বিশ্বাসের (make-believe)

চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যায়, তাহার জীববিদ্যাসঙ্গত কারণও এইভাবে পাওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং গ্রুসের মতে প্রাণীজীবনে খেলায় আছে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস। ষ্ট্যান্‌লী হল (Stanley Hall) আর এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, অধিকাংশ স্থলে খেলাকে অতীতের স্মৃতি মনে করিলে আরও সঙ্গত হয়। তাঁহার মতে প্রাণীমাত্রের জীবনের ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্তাবৃত্তি (recapitulation) দৃষ্ট হয়, শৈশবের খেলাও তাহারই একটি অংশ। যেমন নয় বৎসরের বালক কল্পিত শিকার ও রক্তপাতের খেলায় মত্ত থাকে। তাহার খর্ব্বকায় দেহের ন্যায় সেই খেলাটিও জাতির ক্রমপরিণতির ইতিহাসের অতীত, অরণ্যচারী, ক্ষুদ্রকায় অবস্থার সাময়িক অভিব্যক্তি। যেমন বেঙাচির লেজের কোনও দরকার বেঙের নাই, তেমনি জাতির ক্রমবিকাশের এই সমস্ত ঘটনারও (অর্থাৎ যেগুলি খেলায় প্রকাশ পায়) পরিণত জীবনে কোনও প্রত্যক্ষ প্রয়োজন থাকে না। হল বলেন যে তাহা হইলেও স্বাভাবিকভাবে পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে গেলে এগুলির স্বল্পকালের জন্য আসার প্রয়োজন আছে। যেমন বেঙাচি ভদ্র বেঙে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার লেজ সৃষ্টি হওয়া দরকার।

সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে শৈশবের খেলা এইভাবে জাতির অতীত জীবনের এমন অবস্থাসমূহ স্মরণীয় করিয়া রাখে, যেগুলি ভুলিয়া গেলেই ভাল হইত। জীববিদ্যার দিক হইতে ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ষ্ট্যানলী হল বলেন যে এগুলি অনেক সময়েই বিরেচক (cathartic) হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ আমাদের আদিম, স্থূল ও বৃত্তিগুলির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া উহাদের সুসভ্য রূপ দেয়। মানুষ তাহার পূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা ও পাপাচরণের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে না, তাই খেলার ছলে উহাদের বিরেচন সাধিত হয়, ও উহাদের অনিষ্টকারিতা দূর হইয়া বৃত্তিগুলি নৈতিক প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়।

একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে উল্লিখিত দুইটি মতবাদ পরস্পরের পরিপূরক, বিপরীত নহে। অর্থাৎ এ কথা যেমন সত্য যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলায় প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তেমনি ইহাও সত্য যে জাতির অতীত ইতিহাস প্রত্যেক মানুষের জীবনে পুনর্জ্জীবিত হওয়ার কারণ এই যে বর্ত্তমানেও মানুষের পরিণত জীবনের পক্ষে উহার প্রত্যক্ষ মূল্য আছে।

তাহা হইলে আমরা দুইটি মতবাদকেই যে ক্ষেত্রে যেটি খাটে সেইভাবে প্রয়োগ করিতে পারি। যেমন, নৃত্য বা দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি যে সমস্ত খেলার মূল বস্তু শারীরিক ক্রিয়া বা অঙ্গচালনা, সেখানে হলের ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুতির মতবাদটি বড়ই সুবিধাজনক। তিনি যে বলিয়াছেন শারীরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বংশগতির স্পষ্টতম অভিব্যক্তি খেলায় পাওয়া যায়, সে কথাটি এখানে বিশেষভাবে সহায়ক। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে আধুনিক মানুষ ধরাবাঁধা ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে যদি নৃত্য ও অভিনয়ের চর্চ্চা করে, তাহা হইলে যে তাহার আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, শুধু তাহাই নয়। শরীরকে আয়ত্ত করিবার যে প্রণালী সে পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুশীলন এই ভাবে হয়। পক্ষান্তরে, যে ক্ষেত্রে খেলায় শরীরের চেয়ে বুদ্ধির প্রয়োগ বেশী, সে ক্ষেত্রে গ্রুসের শিক্ষার অতীতের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কিত মতবাদটি অধিক উপযোগী, আর শিক্ষার দিক হইতেও বেশী মূল্যবান, তাহা পরে দেখা যাইবে।

খেলাকে অতিরিক্ত শক্তি নির্গত করিবার পন্থা যে মতবাদে বলা হইয়াছে, তাহা শুনিতে ভাল লাগিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন ধরা যায় যে, একভাবে পথ চলিয়া শিশুর যখন পায়ে ব্যথা হইয়া গিয়াছে, তখন সে লুকোচুরী খেলিতে পাইলে সে কথা ভুলিয়া যায়। অথবা লোকে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ডস্ বা টেনিস খেলিবার পর নূতন উদ্যম লইয়া কাজে লাগে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত শক্তি বাহির করিয়া দেওয়া খেলার উদ্দেশ্য নহে, খেলার দ্বারা প্রাণীর মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে। ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ সচরাচর বলা হয় এই ধরণের যে খেলায় বিনোদন (recreation) হয়, অর্থাৎ ক্লান্তি দূর হইয়া নূতন শক্তি আসে, তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর অব্যবহৃত অংশগুলি হইতে শক্তির সঞ্চার হয়। আর সেই অবসরে ক্লান্ত অংশগুলিতে ব্যবহারজনিত যে সব রাসায়নিক বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি দূর হইয়া উপস্থিতি অর্থাৎ দেহের স্বাভাবিক ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা (anabolism) দ্বারা তাহাদের ক্ষতিপূরণ হয়। উপরের উদাহরণগুলি, বিশেষতঃ প্রথমটি হইতে বুঝা যায় যে এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। কারণ খেলার প্রভাবে শিশু ইতিপূর্ব্বে

যে ক্রিয়ায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ক্রিয়াই যে শুধু সে চালাইয়া যাইতেছে তাহা নহে, উহাতে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে।

মনোবিদ্যা ও শিক্ষার বিষয়ে উইলিয়াম ম্যাকডুগাল (William Mc-dougall) যে সকল গভীর ও সুন্দর তথ্য দান করিয়াছেন, মনে হয় যে তাহারই মধ্যে ইহার আরও উপযোগী ব্যাখ্যা মিলিবে। ক্লান্তি সম্বন্ধে একটি সুলিখিত নিবন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা কোনও একটি কার্য্যে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা ঐ কার্য্যে আমাদের যেটুকু অংশ ঐ কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত আছে, তাহারই শক্তিটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তির সহিত অন্যান্য অংশের শক্তিও যুক্ত হয়, তাহা না হইলে অনেক দীর্ঘকালব্যাপী একটানা পরিশ্রমের কারণ বুঝা যায় না। এই অতিরিক্ত শক্তির উৎপত্তি হয় সহজাত প্রবৃত্তি-সমূহের (instincts) মধ্যে, যেগুলি মানুষ ও পশু উভয়েরই ক্রিয়ার প্রধান উৎস (দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ণিত বিনোদনের খেলা (recreatlve play) ম্যাকডুগালের বর্ণিত দৃষ্টান্তের অনুরূপ, এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ, একটি কার্য্য করিবার সময়ে উহার নিজস্ব প্রেরণাটির শক্তি যদি পর্য্যাপ্ত না হয়, তবে উহার চেয়ে বৃহত্তর বংশগত মানসিক রেখাসমন্বয় (engram-complex) অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত শক্তির দ্বারা কার্য্যটি সম্পন্ন হইবে। যেমন নদীপথে বেড়াইতে গিয়া যে শ্রম হইল, তাহা বন্ধুগণের প্রীতিকর সংসর্গ হইতে যে নূতন শক্তি আসিল, তাহার দ্বারা আনন্দে সহ্য করা গেল। তেমনই যে বালক শ্রেণীতে সব চেয়ে পিছনে পড়িয়া থাকে, সে বিতর্কসভায় বা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নিজের শ্রেণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিতে পারে।

বিদ্যালয়ে যে সব খেলাধূলার প্রচলন আছে, সেগুলিকে সচরাচর বিনোদনের খেলা বলা হয়। এই শ্রেণীর খেলার যে সার্থকতার উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এগুলিরও যে তাহা আছে, সে কথা স্বীকার করা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথমতঃ, এগুলি অনেক সময়েই অতিরিক্ত শক্তি নির্গমনের কার্য্যে লাগে। দ্বিতীয়তঃ, এগুলির এমন আর একটি ক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় যাহা এই অতিরিক্ত শক্তি নির্গমন অথবা বিনোদন উভয় হইতে

বিভিন্ন, এই ক্রিয়াকে বলা যায় বিশ্রাম (relaxation)। জীববিদ্যার দিক হইতে ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে গেলে প্রথমেই আমাদের ফুটবলখেলা, নৃত্য, শিকার, মাছধরা, ইত্যাদি খেলা ও সখের আসল রূপ কি, তাহা লক্ষ্য করা দরকার। কাল্পনিক উদ্ভাবিত খেলার সহিত ইহাদের প্রভেদ রহিয়াছে। কারণ, এই খেলাগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়মাবলী দ্বারা চালিত, আর শেষোক্ত দুইটিকে পূর্ব্বোল্লিখিত হলের মতবাদ অনুযায়ী আদিম মনোবৃত্তির অভিব্যক্তিরূপে সহজেই গণ্য করা যায়। সুতরাং সবগুলিই জীবস্বভাবের অতি গভীর অংশোদ্ভূত বৃত্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। অর্থাৎ খেলা ও সখের মূলে যে এষণাসমূহ থাকে, সেগুলি দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ (consolidated) হয়। তাহা ছাড়া এগুলির উৎপত্তিও অনেক স্থলে খুব প্রাচীন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় কেন এই ধরণের খেলার সাহায্যে অতিরিক্ত শক্তি নির্গমনের কাজটি এত সহজে হয়। আরও বুঝা যাইবে যে বয়স্ক ও তরুণ সকলেই কেন এই খেলায় বিশ্রামসুখ পায়। ব্যবসায় বা অন্য কোনও বৃত্তির লোকের দৈনন্দিন কার্য্যে, বিশেষতঃ আধুনিক সুসভ্য সমাজে, দেহে মনে অত্যধিক চাপ পড়ে। এ জন্য অতি জটিল এষণাসজ্যের ক্রিয়া ও পরিপোষণ আবশ্যক হয়। তাই মাঝে মাঝে মানুষ বিশ্রাম পাইবার জন্য নিজের জীবনযাত্রা সরল করিতে চায়। সেই জন্য বৈচিত্র্য হিসাবে যে সব ক্রিয়ায় কম জটিল ও দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ এষণাবলীর প্রয়োজন হয়, তেমনই কার্য্য সে বাছিয়া লয়। খেলা ও সখেই উহা পাওয়া যায়। তাই সে অফিস ছাড়িয়া টেনিসের মাঠে চলিয়া যায়, আইনব্যবসায়ের কর্ত্তব্য শেষ হইলে গ্রামে নির্জ্জন নদীর ধারে মাছ ধরিতে বসে। এই হেতুই বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেণীশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়া কখন খেলার মাঠে বা নদীতীরে পৌঁছিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তের আশায় বসিয়া থাকে।

শিশুর সবল ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য খেলার প্রচুর সুযোগ থাকা প্রয়োজন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুবিদ্যালয়ে (Nursery School) শিশুরা অবাধ, সাবলীলভাবে খেলা করিয়া বহুক্ষণ কাটায়। মনোযোগী শিক্ষকেরা সেখানে লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই খেলা অনেক সময়ে ফ্রয়েড বর্ণিত অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তির (repetition-compulsion) আকার

গ্রহণ করিয়া থাকে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহার দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। চার বৎসরের একটি মেয়ে প্রত্যহ স্নানের সময় এত চেঁচামেচি আপত্তি করিত যে তাহার মাতা অস্থির এবং পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া উঠিত। অনেক সময় তাহাকে স্নান করানই যাইত না। শিশুবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার পর দেখা গেল যে তাহার একমাত্র খেলা পুতুলকে স্নান করান, উহার চুল ভিজান ও মুছান। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই শিশুর মাতা স্বস্তিলাভ করিয়া যখন শিক্ষয়িত্রীদের ধন্যবাদ দিতে আসিলেন, তখন বুঝা গেল যে তাঁহাদের চেষ্টায় নয়, মেয়েটির স্বনির্ব্বাচিত খেলার গুণেই স্নানের যাহা কিছু কষ্ট দূর হইয়াছে ; এখন সে স্নান করিতে ভালবাসে। আর একটি মেয়ে, তাহারও বয়স চার বৎসর, তাহার সমস্যা ছিল আরও কঠিন। তাহার এক বিশ্রী অভ্যাস ছিল যে সে খুব ছোট শিশুদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এত জোরে তাহাদের জড়াইয়া ধরিত যে তাহারা কাঁদিয়া উঠিত। তখন মেয়েটি তাহাদের চোখ ভীষণ জোরে টিপিয়া মুছিয়া দিত। কিন্তু একদিন খেলাঘরে একটি খেলার ঝাড়ু ও বালতি তাহার নজরে পড়িল। তখন হইতে সেগুলি লইয়া মেঝের জল পরিষ্কার করিতে ও মুছিতেই তাহার বহুক্ষণ কাটিতে লাগিল। নিজের মনের মত এই কার্য্যটি পাওয়ার ফলে আর সে বড় একটা ছোট ছেলেদের আঘাত করিবার বা চোখ টিপিবার চেষ্টা করিত না।

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে শিশুবিদ্যালয়ের স্থির, আনন্দময় প্রভাবে, খেলার নানাবিধ উপকরণের প্রাচুর্য্যে, শিশুর স্বনির্ব্বাচিত ক্রিয়ার সাহায্যে কোনও কোনও শিশুর মনে আচরণে যে সব বক্রতা ও জটিলতা থাকে, তাহা দূর হয়। মনঃসমীক্ষণকারীরা তাঁহাদের নিজস্ব পদ্ধতি শিশুদের উপর প্রয়োগ করার বেলায় কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা শিশুর অস্বাভাবিকতার (abnormality) মূলগত কারণ অনুসন্ধান করিতে যান ; এবং সে জন্য এমন সব তথ্য তাঁহারা আবিষ্কার করেন, যে তাঁহাদের সমালোচকেরা কখনও কখনও মনে করেন যে সেগুলি ভিত্তিহীন।

বিষয়টি এবারে অন্য আর এক দিক হইতে আলোচনা করা যাক। অভিজ্ঞতা হিসাবে, অর্থাৎ যে খেলে, তাহার অনুভূতির দিক দিয়া খেলার

বিশেষত্ব কি? এ প্রশ্নটির এই উত্তর প্রায়ই দেওয়া হয় যে, খেলা ক্রিয়াটি নিজের জন্যই সাধিত হয়, উহার ফলকে কোনও মূল্য দেওয়া হয় না। খেলা ও কাজের মধ্যে প্রভেদটিও এইভাবেই দেখান হয়; যাহাকে আমরা কাজ বলি, সে ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি উহার বহির্ভূত কোনও ফলের আশায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কথায় কিছু সত্যতা আছে মানিতে হইবে। বয়স্ক মানুষ নিজের খেলা ও কাজের মধ্যে এমন পার্থক্য প্রায়ই করিয়া থাকে, এমন কি ছোট শিশুদের মনেও এইরূপ এক ধারণা অস্পষ্টভাবে থাকিতে পারে। যেমন, কোনও এক বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ বলেন যে তাঁহারা বিদ্যালয়ে কাজ ও খেলার মধ্যে খুব ধরাবাঁধা প্রভেদ রাখিতে চান না। শুধু এইটুকুই পার্থক্য থাকিবে যে, শ্রেণীকক্ষের পড়াশুনার বেলায় কাজের একটা নির্দ্দিষ্ট মান রাখা প্রয়োজন হইবে, কিন্তু খেলার মাঠে তাহা হইবে না।

এ কথাটি সারগর্ভও গুরুত্বপূর্ণও বটে, কিন্তু ইহা হইতে কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। অন্ততঃ যাহারা খেলে, তাহারা সর্ব্বদা একথা মনে করে না যে খেলার শুধু খেলা ছাড়া আর কোনও সার্থকতা নাই। বিদ্যালয়ে শুধু বালকেরা নহে, শিক্ষকেরাও মনে করেন যে কাজের ন্যায় খেলারও স্বকীয় ক্রিয়াবহির্ভূত মূল্য আছে। খেলার দ্বারা লক্ষ্য ও শৃঙ্খলাযুক্ত প্রচেষ্টার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সব কথা মনে করিয়া ব্র্যাডলী (Bradley) বলেন যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিতে খেলা ও কাজের সম্পূর্ণ প্রভেদ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। তাহা হইলে এই দুইটি ক্রিয়ার স্বরূপ কি? এ সম্পর্কেও ব্র্যাডলীর মত অনুসরণ করা ভাল। তিনি বলেন যে আমাদের সকল ক্রিয়ার মধ্যে দুইটি বস্তু বিভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে এবং ইহাদের মাত্রার তারতম্যের উপরই ক্রিয়াটির মানসিক প্রভাব নির্ভর করে। ইহাদের একটি হইল কর্ত্তার উপর বাহ্য বাধ্যবাধকতার প্রভাব, দ্বিতীয়টি তাহার ক্রিয়ার অবাধ স্বাধীনতা। এ দুইটির প্রভেদ যে কোনও ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে। যেমন, আহার্য্য গ্রহণ কার্য্যটি বাধ্যতামূলক। প্রকৃতির বিধান যে খাইতেই হইবে, না খাইয়া কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তবু এ বিধানের মধ্যে অন্ততঃ অল্পসংখ্যক লোকেরও এই স্বাধীনতা আছে যে, তাঁহারা কি খাইবেন এবং কি ভাবে খাইবেন, তাহা নিজে স্থির করিয়া

লইতে পারেন। আমরা আরামে ঘরে বসিয়া সাদাসিধা আহার্য্যেও ক্ষুধা মিটাইতে পারি, অথবা আড়ম্বর সহকারে উৎকৃষ্ট ভোজনশালায় গিয়া প্রকাণ্ড ভোজও খাইতে পারি। এ সম্পর্কে অবশ্য ব্যক্তি অনুসারে স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার মাত্রার প্রভেদ হইয়া থাকে। ধনীর ভোজে হয়ত এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাঁহার সাদাসিধা আহারবিহারের প্রতিই ঝোঁক। বিলাস-ব্যসনের প্রতি তাঁহাদের রুচি নাই, তথাপি অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের এইরূপ ভোজনের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছে।

এই উদাহরণে বাহ্য বাধ্যবাধকতার মাত্রা চরম। আমি এখানে এইভাবে না খাইলেও কোথাও কোনরূপে ভোজন আমাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অন্য অনেক ক্রিয়ায় এমন চরম বাধ্যবাধকতা নাই। যেমন আমি যদি ফুটবল বা ব্রিজ খেলি, আমাকে খেলার নিয়ম মানিতে হইবে বটে, কিন্তু নিজেকে সে বিধানের মধ্যে আনা বা না আনা আমার স্বেচ্ছাধীন। আমি এ বিধান হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আদৌ না খেলিতে পারি, অথবা আমার সঙ্গীদের নূতন অন্য এক নিয়মাবলী অনুযায়ী খেলিতে সম্মত করিতে পারি। কিন্তু আমি যদি বিধিমত খেলিতে চাই, তাহা হইলে খেলার মধ্যে আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও ক্রীড়াকৌশল সম্পর্কিত নিয়মাবলী এবং আমার প্রতিপক্ষের নৈপুণ্য, এগুলির দ্বারা আমার খেলার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হইবে। তেমনই, আমি যদি সেক্সপীয়রের নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতে চাই, তবে কবির কথাগুলি অনুসরণ করা আমার পক্ষে বাধ্যবাধক হইবে, আর উহার ব্যাখ্যা করার মধ্যেই আমার স্বতঃস্ফূর্ত্ততা বা স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

সুতরাং কাজ ও খেলার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য করিবার বাধা কোথায়, তাহা এখন দেখা যাইতেছে। কর্ত্তা যখন কোনও ক্রিয়া ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন বা বন্ধ করিতে পারেন, অথবা পছন্দমত উহার বিধিপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন, তখনই তাঁহার কাছে উহা খেলা। কিন্তু যদি অনিবার্য্য কারণে কিংবা কর্ত্তব্য বা জীবিকার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তবেই তিনি উহাকে কাজ মনে করিবেন। কারণ প্রথম ক্রিয়াটি অবাধ স্বতঃস্ফূর্ত্ততা দ্বারা চালিত হইতেছে, কিন্তু শেষেরটিতে বাধ্যতামূলক বিধান দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্ততা ব্যাহত হইতেছে। কিন্তু যেখানেই আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ততা

এই বাধ্যবাধক ভাবকে জয় করিতে পারে, সেখানেই, ক্রিয়াটিকে কাজ বা খেলা, যে নামেই অভিহিত করি না কেন, অভিজ্ঞতার দিক হইতে ক্রিয়াটিতে খেলারই গুণ থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তার মনে খেলা ও কাজ এক এবং পার্থক্যহীন হইবে। যেমন, আমি যদি দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার, সুযোগ্য শিক্ষক বা কুশলী শল্যচিকিৎসক হই, তবে আমার কাজে আমি খেলার আনন্দই পাইব। কিন্তু আবার যদি আমার বৃত্তিতে আমার নৈপুণ্য না থাকে, তবে উহা আমার পক্ষে দুর্ব্বহ ভার মনে হইবে। এক কথায় যাঁহারই সহজ নৈপুণ্যে নিজের কাজটি করিবার শক্তি আছে, সে কাজ করিয়া যিনি আনন্দ পান, তাঁহার পক্ষে সেই কাজ খেলা মনে হয়।

অনেক ভাবাতেই সঙ্গীত ও নাট্যশিল্পের সম্পর্কে খেলা কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। ইহাকে ভিত্তি করিয়া অনেক মনীষী, প্রধানতঃ জার্ম্মান কবি শ্লিলার (Schiller) এমন একটি মতবাদ গঠন করিয়াছেন যাহা শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। শিল্পের সহিত খেলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলিলে শিল্পীর পরিশ্রমের অমর্য্যাদা করা হয় না। উভয়ের প্রকৃত সাদৃশ্য এই যে স্বতঃস্ফূর্ত্ততার আনন্দময় ব্যঞ্জনাই খেলার ন্যায় শিল্পকলারও প্রাণবস্তু। এমন কি যখন কবিতার মধ্যে কবি নিজ দুঃখকর অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করেন, সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে দুঃখকে পবিত্র ও মহৎ রূপদান করিয়া প্রচুর বিশুদ্ধ আনন্দ তিনি পান। আবার খেলার সহিত শিল্পকলার আর একটি সম্পর্ক আছে এই যে ইহার মধ্যেও শক্তিকে সুসংযত আকারে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উহার মর্য্যাদা ও মূল্য খেলার চেয়ে উচ্চ স্তরের। সুদক্ষ টেনিস খেলোয়াড় শুধু দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই আনন্দ পান না, খেলার নিয়মানুযায়ী সুশৃঙ্খল ভঙ্গীতেও তাঁহার শক্তি প্রকাশ করেন। তেমনই চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি নিজ প্রতিভা সার্থক আকারে সাফল্য সহকারে প্রকাশ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং শ্লিলারের এই সারবান্ উক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি যে, জাতির খেলার বৈশিষ্ট্য দ্বারা উহার শিল্পকলার গুণ ও মূল্য বুঝা যাইবে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আনুষ্ঠানিক উৎসব সম্বন্ধে যে কথা বলা গিয়াছে, তাহার সহিত শ্লিলারের মতবাদের সম্পর্ক কি, তাহা পাঠক মনে চিন্তা করিয়া

দেখিলে ভাল হয়। এখন আর একটি কথা এই যে, খিলার বিশুদ্ধ কলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অনেকটা সেই ধরণের যুক্তি অন্যান্য আধুনিক লেখক কারুকার্য্যের (craftsmanship) সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কারুকার্য্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও খেলারই মত, কারণ কারুকার গঠনকৌশলে দক্ষতা লাভ করিয়া যখন সহজে উহা প্রয়োগ করিতে পারেন, তখন তাঁহার আনন্দের সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া দেখা যায়। আদিম মানবজাতির শিল্পীগণ যে সকল কারুশিল্পে তাঁহাদের প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, যেমন পাথরের অস্ত্র বা মাটিব বাসন তৈয়ারী, তাহার প্রথম ক্রমোন্নতি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাক। এই জিনিবগুলির প্রথম আবিষ্কারে অসাধারণ সৃষ্টিপ্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি যতই বিরাট হউক না কেন, সে সময়ে কোনরূপে শুধু জিনিষগুলি গড়িয়া তুলিবার সমস্যাটিতেই তাহার সবটুকু প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। প্রথম তৈয়ারী বর্শার গুণ ছিল শুধু হিংস্র জন্তু বা শত্রুর দেহ বিদ্ধ করা, প্রথম বাসনগুলি শুধু জল রাখা আর তাপ প্রতিরোধ করিবার সামগ্রীই ছিল। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের পর যখন শিল্পীর নৈপুণ্য জন্মিল, উপকরণগুলিও আয়ত্তের মধ্যে আসিল, তখন কোনরূপে কার্য্যটি সমাধা করায় ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির প্রয়োজন হইতে লাগিল, অন্যদিকে লাগাইবার জন্য আরও শক্তি অবশিষ্ট রহিল। ধরা যাক যে শিল্পী তাঁহার কার্য্যে আনন্দ পাইতেন, তাঁহার অন্তরের প্রেরণাও ছিল সুমহান, সুতরাং এই অতিরিক্ত শক্তি যে কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হইবে, তাহাতে ভুল নাই। উল্লিখিত মতবাদে এই কথা বলা হয়। তখন পাথরের অস্ত্র, মাটির বাসন শুধু কাজের জিনিষ মাত্র রহিল না, তাহাতে সৌন্দর্য্যের সঞ্চার হইল।

সৌন্দর্য্যবোধ শিক্ষার পক্ষে এই মতবাদের সমধিক গুরুত্ব আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ক্ষমতা যে বিধাতা কৃপণের মত মাত্র কয়েকটি ভাগ্যবান ব্যক্তিকে দিয়াছেন, তাহা নহে। যেমন সকলেই অঙ্ক শিখিতে পারে, তেমনই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করাও সব মানুষের পক্ষেই সম্ভব; যদিও অবশ্য অন্যান্য সমস্ত শক্তির মত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে

ইহার তারতম্য আছে। যে অবস্থার মধ্যে থাকিলে শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ হয়, তেমনই অবস্থায় রাখিয়া ছেলেমেয়েদের সৃষ্টি করিবার সুযোগ দেওয়া দরকার। তাহাদের সামাজিক জীবন হইবে অবাধ ও উদার। আর মনের আনন্দে পুনরাবৃত্তি দ্বারা তাহারা এমন কারুনৈপুণ্য লাভ করুক যে শিল্পোকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার তাহাদের কাছে খেলা মনে হয়। তাহা হইলে তাহাদের শিল্পসামগ্রীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের সঞ্চার আপনা হইতেই হইবে, অবশ্য উহার মাত্রার তারতম্য থাকিবে।

খেলার আর একটি দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উহা হইল মনভুলান বিশ্বাস (make-believe)। তাহার আলোচনা এখন করা যাইবে। এ বিষয়টি চিন্তা করার সময়ে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে যে, বড়দের জীবন যে দৃষ্টিতে দেখা হয়. সেই দৃষ্টিতে আমরা শিশুর খেলার যেন বিচার না করি। বহির্জগতের নীরস, বাস্তব ঘটনা এবং মনোজগতের উদ্দেশ্য, চিন্তা এবং কল্পনার পার্থক্য বড়দের দৃষ্টিতে অতীব সুস্পষ্ট ও প্রবল। কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, শিশুর মনে এই পার্থক্যবোধ আপনা হইতেই আসে না। ধীরে ধীরে অনেক সময়েই বেদনাকর অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাকে এই জ্ঞান লাভ করিতে হয় ও ইহার স্বরূপ জানিতে হয়। সুতরাং শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সবটুকুই যে কল্পনাবলে রূপান্তর পাইয়াছে, তাহা নহে। শিশুর অজ্ঞতা এবং বাহ্য পৃথিবীর যথার্থ রূপ দেখিতে পারার অক্ষমতাও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

যেখানে দেখা যায় মনভুলান বিশ্বাসের ক্রিয়া আপনা হইতেই চলিতেছে, সে ক্ষেত্রে উহাকে ব্যাধিগ্রস্ত মনের দুইটী বিপরীতমুখী গূঢ়ৈষা (complex) বা ভাবপ্রক্ষোভ সমষ্টির দ্বন্দ্বের সহিত তুলনা করিলে ঠিক হয়। সচরাচর এই বিরোধী ভাবদ্বয়ের একটি অপরটিকে মনোযোগ হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইয়া দেয়। যেমন, একটি স্ত্রীলোক ক্রমাগত বলে সে দেশের রাণী; অথচ সে যে দাসীবৃত্তি করিয়া দিন চালায়, উহার সহিত সেই রাজকীয় মর্য্যাদার অসামঞ্জস্য তাহার চোখে পড়ে না। প্রকৃতিস্থ শিশুও খেলিবার সময়ে যে সমস্ত বাস্তব ব্যাপার তাহার মনের ধারণার বিরোধী মনে করে, তাহার সেগুলিকে এইভাবে উপেক্ষা করার শক্তি আছে। এই জন্য বাস্তব জগতের পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে বাস

করিয়াও উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিতে ও সেরূপ কথা বলিতে সে দ্বিধা করে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে—

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো !
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত ?
রূপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতীর দাঁত।···
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে॥

উন্মত্ততার বেলায় (insanity) দেখা যায় যে, বিরোধী গূঢ়ৈষাগুলি এমন সমমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে যে একটি অপরটিকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, সুতরাং উহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার আবশ্যক হয়। তাহা হয় এইভাবে। গূঢ়ৈষাগুলির মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে এমনই এক গৌণ ধারণা রোগী মনে মনে গড়িয়া লইয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাহা আঁকড়াইয়া থাকে। তাই যে স্ত্রীলোক নিজেকে দেশের আসল রাণী মনে করে, সে হয়ত নিজের মনে এমন বিশ্বাস গড়িয়া লইয়াছে যে, কোনও ষড়যন্ত্রের ফলেই তাহার ন্যায্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাহাকে আসলে হীন অবস্থায় থাকিতে হইতেছে, আর প্রতি পদে সেই চক্রান্তের প্রমাণও সে বাহির করে।

শিশুর বেলাতেও, যে সমস্ত ঘটনা বা ধারণার পরস্পর সংঘাত তাহার মানসিক শান্তি নষ্ট করিতে পারে, ঠিক এমনই কৌশলে, অনেকটা এমনই বিশ্বাসের সহিত সে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া লয়। শিশু যে অলীক কথা বলে, প্রকৃত ঘটনাকে কল্পিত কাহিনীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া মনে রাখিতে পারে না, ইহাই অনেক সময়ে তাহার কারণ। তাহা ছাড়া শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের খেলাতেও ইহা খুবই দেখা যায়। ষ্টিভেন্‌সনের (Stevenson) কাহিনীতে ইহার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গল্পটি এক ছোট ছেলের, সে ফুটবল খেলার সময়ে ভাবিত যে ইহা যুদ্ধ। বলটি দেখিয়াই তাহার কল্পনা প্রবল হইয়া উঠিত। আর খেলিতে গেলেই সে মনে মনে এক প্রকাণ্ড ইন্দ্রজালের কাহিনী রচনা করিয়া লইত।

তখন বলখেলার পরিবর্ত্তে মনে হইত যে আরবদেশীয় দুই জাতির মধ্যে এক মন্ত্রঃপূত কবচ লইয়া কাড়াকাড়ি যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে বয়স্ক উন্মাদের ন্যায়, ক্রীড়ারত শিশুর মনও এমন কতকগুলি ধারণার দ্বারা চালিত হয়, যেগুলির বাস্তব জগতের সহিত সংযোগ প্রায় নাই। অথচ উহারাই শিশুর সমগ্র চেতনার উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে। ষ্টিভেনসন বলিয়াছেন যে শিশু বাস্তব-জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাতেও সেই সময়ে তাহার মনে যে কল্পনাটিরও আধিপত্য চলিয়াছে, তাহার আশ্রয় না লইয়া পারে না, আর তাহা সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিতে পারে।

শিশুর মনভুলান বিশ্বাস ও উন্মাদ ব্যক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এ তুলনা সুসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহা খুব বেশী দূর বাড়ান চলে না। শিশুর মনে কল্পনার এতখানি আধিপত্য খুব কমই থাকে যে, প্রয়োজন হইলে সে নিজেকে উহার হাত হইতে মুক্ত করিতে না পারে। ষ্টিভেন্‌সন বলিয়াছেন একবার একটু কষ্ট পাইলেই সে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। তাহা ছাড়া মনভুলান বিশ্বাস ও উন্মত্ততার গূঢ় তাৎপর্য্যের মধ্যে এক মূলগত প্রভেদ আছে, এ দুটির বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া সে কথা ভুলিলে চলিবে না। পাগলের পাগলামীকে শুধু ভাঙ্গা বীণার বেসুর আওয়াজ বলিলে ঠিক হয় না। জীববিদ্যার দিক হইতে ইহার এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, পৃথিবীর সুকঠিন জীবনযাত্রা যখন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, সে অবস্থায় বাতুলতাকে দুর্ব্বল মনের আশ্রয়স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহার দ্বারা শক্তির পরাভব সূচিত হয়। যাঁহার চিত্ত সবল, তিনি বাধাবিপত্তির সহিত সামনাসামনি লড়িয়া তাহার অবসান করেন। কিন্তু দুর্ব্বলমতি লোক সমগ্র বাস্তব অবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষার চেষ্টাই ছাড়িয়া দেন এবং উহার অনেকখানি পছন্দমত বাদ দিয়া নিজ সমস্যার সমাধান করেন। পক্ষান্তরে শিশুর মনভুলান বিশ্বাস শক্তির অভাব নহে, প্রাচুর্য্যেরই অভিব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। যে শক্তিপ্রেরণা লইয়া শিশু জগতের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সবটুকু বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়াতে ব্যয় হয় না। ফলে সে নিজ অভিজ্ঞতা বাড়াইতে ও সমৃদ্ধ করিতে আর জীবনযাত্রার সহস্র দিকে

পরীক্ষা চালাইয়া নিজ মনের বিস্তার সাধন করিতে চায়। বাতুলতা হইল সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষয়, কিন্তু শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের খেলায় বিস্তার ও বৃদ্ধি সূচিত হয়। অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ শিশু কঠিন বাস্তবকে নিজ ইচ্ছানুরূপ করিয়া লইতে পারে না। বিষয়গতভাবে (objectively) সে নিজ সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। তাই আলাদিনের প্রদীপের মত সে মনভুলান বিশ্বাসের যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে। এইভাবেই সে নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ বাহির করে এবং হৃদয়ের সাধ মিটাইয়া লয়।

এই যুক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুর মনভুলান বিশ্বাসের অভ্যাস থাকিলেও সে যে তাহার কল্পনার জগৎকে বাস্তবের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহা নহে। এ বয়সে বাস্তব অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করার সামর্থ্য শিশুর থাকে না। এজন্য শিশু বড় হইবার সময়টিতে যাহাতে তাহার আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং যাহাতে সে বস্তুজগতের সমস্যাগুলিকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহারই জন্য ইহা এক জীববিদ্যাসম্মত কৌশলমাত্র।* সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে বয়স বাড়ার সঙ্গে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে ও জগতের উপর আমাদের আধিপত্য বাড়িবে, তেমনই মনভুলান বিশ্বাসের গুরুত্বও কমিয়া যাইবে। প্রকৃত ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশু যেমন নিজ পরিবেশের যথার্থ স্বরূপ চিনিতে আরম্ভ করে, তেমনই তাহার

* শিক্ষার দিক হইতে খেলার মূল্য সম্বন্ধে ফ্রেবেল (Froebel) এবং মন্টিসরির (Montessori) অনুগামীদের যে মতবিরোধ দেখা যায়, এই উক্তিটির তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই বিরোধের উৎপত্তি প্রধানতঃ এই কারণে যে উভয়পক্ষই মনভুলান বিশ্বাসকে খেলার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ফ্রেবেলপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার পক্ষে খেলার সমধিক গুরুত্ব আছে। তাই মনভুলান বিশ্বাস ভিন্ন খেলা হইতে পারে না মনে করিয়া শিশুকে সে বিষয়ে উৎসাহ দেন। কিন্তু মন্টিসরির শিষ্যেরা মনভুলান বিশ্বাসকে নিরর্থক ও মিথ্যাচরণ বিবেচনা করেন, এজন্য তাঁহার শিক্ষায় খেলার কোনও গুরুত্ব স্বীকার করেন না। উপরে যে যুক্তি দেওয়া গিয়াছে, তদনুসারে দেখা যাইতেছে যে ফ্রেবেল পদ্ধতির ভুল এই যে উহাতে অযাচিতভাবে, অর্থাৎ শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে না চাহিলেও তাহার উপর মনভুলান বিশ্বাস চাপাইয়া দেওয়া হয়। আবার মন্টিসরির শিষ্যদের ভুল এই যে যেক্ষেত্রে মনভুলান বিশ্বাসদ্বারা শিশুর যথার্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার বিস্তার ঘটিবে, সেক্ষেত্রেও শিশুকে উহার সুযোগ তাঁহারা দিতে চান না।

মনভুলান বিশ্বাসের খেলার মধ্যেও বাস্তবের প্রভাব ক্রমবর্দ্ধিত মাত্রায় সুস্পষ্ট-রূপে আসিতে থাকে।

কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিবেন না যে খেলার মধ্যে শিশুর মানসিক শক্তি যেরূপ প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বহুল পরিমাণে উন্নতি হইবে। বহু লেখক, আবিষ্কর্তা ও কৃতী পুরুষ এই কথাটির সাক্ষ্যস্বরূপ বড় দুঃখে বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহাদের মানসিক বিকাশের কোনও সহায়তা করে নাই, বরং অনেক সময়ে অনিষ্ট করিয়াছে। ইঁহাদের মনীষা অতি প্রখর ছিল বলিয়া নিজেদের খেলার স্বপ্ন তাঁহারা সফল করিতে পারিয়াছিলেন। তাই জলমগ্ন দেশের মধ্যে যেমন পর্ব্বতের চূড়াগুলি জলের উপরে জাগিয়া থাকে, তেমনই কেবল এই কয়টি লোকের কথাই জগৎবাসী জানিতে পারে, কিন্তু ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে ইঁহাদের চেয়ে কম শক্তির অধিকারী বহু লোকের প্রতিভা লুপ্ত হইয়া যায়। সঙ্কীর্ণ, কল্পনাবর্জ্জিত ও আড়ষ্ট শিক্ষাদানপদ্ধতি অনেক সময়ে এই ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষরূপে দায়ী। এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এ ক্ষতি যদি বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বুদ্ধিগত খেলার আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সযত্নে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। ইহার অর্থ এই নয় যে বুদ্ধির অস্থিরতাকে উৎসাহ বা প্রশ্রয় দিতে হইবে। ইহাতে বুঝায় এই যে জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিশুর পরীক্ষা করিবার আগ্রহই তাহার শিক্ষায় আমাদের পথ দেখাইবে। পূর্ব্বোক্ত কার্ল গ্রুসের (Kral Groos) নীতি অনুসরণে, শিশু যেমন নিজেকে কখনও কবি বা নাট্যকার, কখনও বা ইঞ্জিনীয়ার, রাসায়নিক, জ্যোতির্ব্বিৎ, নাবিক মনে করে, আমাদেরও তাহা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং আত্মসাম্মুখ্যের (self-assertion) এই সমস্ত কৌশলের সে যাহাতে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে তাহার শৈশবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্থলে যখন যুবকের সামাজিক মনোবৃত্তি আসিবে, স্পষ্ট মনভুলান বিশ্বাসের বয়স যখন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন এই পদ্ধতির আকারটি কিরূপ হইবে? তাহার উত্তর এই যে, শিক্ষার্থীর পাঠ্যসূচী এমন

ভাবেই রচিত হইবে যাহাতে সমগ্র সভ্যতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল মানব-প্রচেষ্টা, তাহারই মধ্যে সে পূর্ব্ব হইতেই কল্পনা এবং আশার মধ্য দিয়া অংশগ্রহণ করিতে পারে। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে উদার রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভাব থাকিবে। বিজ্ঞানের পাঠ এরূপ হইবে যেন সে পাস্তুর (Pasteur) এবং অন্য যে সমস্ত রসায়নবিৎ ও পদার্থতত্ত্ববিৎ পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার রূপান্তর ঘটাইয়াছেন, তাঁহাদেরই সহকর্ম্মীরূপে নিজেকে বিবেচনা করিতে পারে। গণিতের শিক্ষায় সে শিখিবে যে সূক্ষ্ম বা বিমূর্ত্ত চিন্তার (abstract thought) ব্যবহারিক জীবনে, বাণিজ্যে, পৌর ও জাতীয় শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কি মূল্য রহিয়াছে। কারণ, শিশুদের ক্ষেত্রে মনভুলান বিশ্বাস যেরূপ হয়, এই মনোভাব লইয়া কিশোরদের শিক্ষা দিলে তাহা উহাদের খেলার বৃত্তিটিতেও তেমনই প্রত্যক্ষ সাড়া জাগাইবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে গান্ধিজীর প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী শিক্ষায় (Basic Education) এই নীতি প্রয়োগের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। এই পদ্ধতির শিক্ষায় শিশু এক কেন্দ্রীয় বৃত্তির সূত্র ধরিয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান আবিষ্কার ও সৃষ্টি করিয়া লইবার সুযোগ পায় (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বশেষে বলা যায় যে শিক্ষার স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন জীবনের বিরাট লীলায় শিশু কোনও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। এই মতবাদের সমর্থনও উল্লিখিত সাধারণ যুক্তিতে রহিয়াছে। যে কল্পনা শৈশবে মানবপ্রচেষ্টার সমগ্র ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করিতেছিল, এক্ষেত্রে উহা একটি নির্ব্বাচিত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে। মনের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা এখন বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবে, মনভুলান বিশ্বাস গৌণ হইয়া পড়িবে।

উপরে শিশুর জীবনে মনভুলান বিশ্বাসের প্রথম অসংযত আকারের বর্ণনা দেওয়ার পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাতে উহার সংযত প্রভাবের বিষয়ও আলোচনা করা গিয়াছে। পাঠক মনে করিতে পারেন যে ইহাতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা উৎসারিত ও চালিত করিবার ব্যাপারে উহার সকল ক্রিয়ার কথা শেষ হইল। তিনি বলিবেন যে বয়স্ক নরনারীকে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, উহাতে কল্পনার যাদুমন্ত্রের কোনও স্থান

নাই। সুখের বিষয় এই যে বিধাতা অতখানি অকরুণ নহেন। মনভুলান বিশ্বাসের শক্তি মানুষকে বাল্যে রক্ষা করে, পরিণত বয়সেও তাহা সম্পূর্ণ চলিয়া যায় না। বর্ত্তমান বাস্তবের সম্বন্ধে মানুষ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধ থাকায় অনেক ভাল জিনিষ বিপদের সময়ে বাঁচিয়া গিয়াছে, বহু উৎকৃষ্ট আচারপদ্ধতি রক্ষা পাইয়াছে। ইহা না থাকিলে জগতের বহু কল্যাণসাধককে নৈরাশ্যে তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইত। এ কথা যেমন সত্য যে, আমাদের আসল স্বরূপ দেখিতে পাওয়া আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, তেমনই আবার অনেক সময়ে আমাদের এবং অন্যদের পক্ষেও আমাদের যথার্থ দুর্ব্বলতা ও নীচতার কথা ভুলিয়া থাকিতে পারাও অধিকতর কল্যাণকর। সে ক্ষেত্রে মনভুলান বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া চালিত হয়। খেলার গুণ অতি সূক্ষ্ম ও অতি ব্যাপক, এ কথা এই জন্যই বলা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষায় স্বাধীনতা

খেলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যে আলোচনা পূর্ব্ব অধ্যায়ে করা গিয়াছে, শিক্ষার দিক হইতে তাহার মূল্য অনেক। বস্তুতঃ একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে খেলার অর্থ ঠিকভাবে বুঝিলে শিক্ষার অধিকাংশ ব্যবহারিক সমস্যা সহজ হইয়া যায়। কারণ খেলা কথাটির সঙ্কীর্ণ অর্থে যদি ইহাকে প্রধানতঃ শৈশবের ব্যাপারই মনে করা যায় ত উহার মধ্যে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার অতি স্পষ্ট, সতেজ ও বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইজন্য দেখা যায় যে মুখ্যতঃ সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াবলীর সহিত খেলার প্রকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শিল্পকলা ও কারু-কার্য্য, এবং ক্ষুদ্রতর পরিমাণে ভৌগোলিক অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। বস্তুতঃ ব্যক্তিতার বিকাশসাধনে এগুলি খেলার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত। এমন কি, যে খেলার উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন বা বিশ্রাম, তাহাকেও দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের গুরুভার ও পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা মাত্র মনে করিলে চলিবে না। খেলা শিশুরই হউক আর বয়স্কেরই হউক, অবাধে নিজেকে প্রকাশ করিবার স্পৃহাই উহাতে লক্ষিত হয়। জীবনের এই প্রধান বৃত্তিটি সার্থক ও সন্তোষ-জনকরূপে চালিত হওয়া আবশ্যক। তাহারই ক্ষেত্রটির যতদূর সম্ভব বিস্তার করা শিক্ষা এবং সমাজের সর্ব্ববিধ প্রকৃত সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এই আদর্শটি এমন খোলাখুলি স্পষ্ট ভাষায় বলিলে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে হয়ত সহজে ইহার অনুমোদন করিতে দ্বিধা জাগিবে। কিন্তু পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে যুক্তি দেওয়া গিয়াছে, তদনুসারে দেখা যায় যে খেলা ও কাজ শব্দ দুটির প্রত্যেকটিতেই অতি বিভিন্ন মূল্যের ক্রিয়া বুঝায়। কোন খেলা শুধু সময় কাটাইবার সামান্য উপায়, কোনও খেলার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ গুণ আছে, আবার কোনও খেলার মধ্যে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যও দেখা যায়। তেমনই কাজের মধ্যেও বিশাল শ্রেণীবিভেদ আছে। সব কাজই সার্থকনামা

বলা চলে না। একদিকে রহিয়াছে বুদ্ধিবর্জ্জিত পশুবৎ পরিশ্রম, যাহাকে কাজ বলিলে কথাটির অমর্য্যাদা করা হয়। আবার অপরদিকে এমন কাজও আছে যাহার দ্বারা কর্ত্তার গৌরব বর্দ্ধিত হয়, এবং হয়ত জাতির বা সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি সাধিত হয়। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এ সমস্ত উচ্চ পর্য্যায়ের কাজে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, সেগুলি আসলে খেলারও অপরিহার্য্য অংশ। সুতরাং সর্ব্বোচ্চ স্তরে খেলা ও কাজ মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহাতে এই কথাই বুঝাইতেছে যে কর্ত্তা যখন নিজ ক্রিয়া পছন্দ মত বাছিয়া লইতে পারেন এবং সাফল্যের মানও নিজেই নির্দ্ধারিত করিতে পারেন, অর্থাৎ এক কথায় নিজ বিধাতাপ্রদত্ত সৃষ্টি ও আত্মসাম্মুখ্যের সুযোগ খুঁজিয়া লইতে পারেন, তখনই উহাকে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ের কাজ বলা যাইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরণের বিদ্যালয়ই হউক বা সাধারণতন্ত্রই হউক, উহাতে এমন শ্রেণীর ক্রিয়ারই ব্যবস্থা থাকিবে যে উহাকে কাজ বা খেলা যে কোনও নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

যে নীতির কথা একটু আগে বলা গিয়াছে, তাহাতে যদি খেলা কথাটির পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা, এবং কাজের পরিবর্ত্তে শৃঙ্খলা শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উহা আর আপত্তিকর মনে হইবে না। অথচ এ পরিবর্ত্তনে উহার অর্থের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। কারণ খেলা ও স্বাধীনতা অভিন্ন, আবার কাজ ও শৃঙ্খলার সম্পর্কও তেমনই ঘনিষ্ঠ। এক্ষেত্রেও উভয়েরই শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপ সার্থকতা দেখা যায়। একদিকে স্বাধীনতা যখন হইয়া দাঁড়ায় ক্ষণিকের খেয়াল অবাধে চরিতার্থ করা, তখন উহার কিছুই মূল্য থাকে না, উহাকে বলা যায় অসংযম। তেমনই অতি নিম্নস্তরের শৃঙ্খলা শুধু দমনমূলক হইয়া থাকে। আর সেনাবাসেই হউক বা বিদ্যালয়েই হউক, উহা যে শুধু স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা নহে। সহজেই উহা অনিষ্ট ও অবনতির মূল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যখন মানুষ সুমহান লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া, তাহারই অনুসরণে সুন্দর ভঙ্গী ও পদ্ধতির শৃঙ্খলা নিজে হইতেই মানিয়া লয়, তখনই উহাকে অতি উচ্চ পর্য্যায়ের স্বাধীনতা বলা যায়। যখন কোনও শ্রেষ্ঠ কবি জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনার ভাবটি ফুটাইয়া তুলেন, বা দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ সুর সৃষ্টি করেন, তাহারই মধ্যে

আমরা সর্ব্বোচ্চ স্তরের শৃঙ্খলা ও সংযমের পরিচয় পাই। প্রতিভার অবাধ স্ফুরণের বাধা হওয়া দূরে থাক, এই শৃঙ্খলা স্বাধীন বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি শিক্ষাতত্ত্বের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা-ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষায় খেলার পদ্ধতি (playway) সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বিশেষ জোর দিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সযত্নে নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের মধ্যে শিক্ষার্থীকে যতখানি সম্ভব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিবার ব্যবস্থা যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আছে, সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ। এই বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাধারাগুলির মধ্যে মারিয়া মন্টিসরির পদ্ধতি স্বকীয় গুণে পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বের অন্যান্য শিক্ষা-প্রণালীর ন্যায় মন্টিসরির পদ্ধতিতেও হয় ত এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার গুরুত্ব গৌণ ও সাময়িক, যাহা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিচার করিলে হয়ত স্থায়ী হইবে না। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। সেটি হইল এই। শিশুর শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব যথাসম্ভব তাহার নিজেরই উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং তাহার পরিণতিসাধনে অপরের হস্তক্ষেপের স্থান খুবই কম থাকিবে। সাহস ও দৃঢ়তার সহিত ইহা তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। মানুষ সামাজিক জীব; এজন্য কিরূপে অপরের সংসর্গে বাস করিতে হয়, কাজে ও খেলায় অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে হয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণগুলির বিকাশ কিভাবে হয়, শিশুদের এগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা মন্টিসরি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু হইল এই যে, তাঁহার উদ্ভাবিত কৌশলে, প্রধানতঃ শিক্ষামূলক খেলনার (didactic apparatus) সাহায্যে, অতিশৈশবে ও বাল্যে যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা শিশু নিজেই শিখিয়া লইতে পারে, যেমন ভঙ্গীগত নৈপুণ্য, ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও সামান্য পড়া ও লেখা এবং অঙ্ক। শিক্ষয়িত্রী বা পরিদর্শিকার (directrice) তত্ত্বাবধানে তাহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের সময়মত নিজেরা চলে, আপনাদের পছন্দমত কাজ বাছিয়া লয়, আর নিজেদের কাজের সমালোচনাও নিজেরাই করে। এইরূপে

এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীগণের তৎপরতা, আত্মনির্ভরতা ও একাগ্রতা গুণের অশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহারা নিজেকে ও অপরকে সম্মান করিতে শিখে। আর উদ্দেশ্যমূলক কার্য্যে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস তাহাদের হয়। প্রচলিত প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না।

মন্টিসরি মনভুলান বিশ্বাসের (make-believe) খেলা, ও সাহিত্যে উহারই প্রতিরূপ রূপকথার সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থার সারবস্তু যাহা, উহাতে খেলার নীতিকেই (play-principle) শিশুশিক্ষার এক সর্ব্বজনীন পদ্ধতিতে পরিণত করা হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও আরও বড় ছাত্রদের শিক্ষায় এই ধরণের প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়াছে, অবশ্য সেগুলি অতখানি ব্যাপক ও বিস্তারিত নহে। উহাদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আবিক্রিয়া পদ্ধতির (heuristic method) প্রসিদ্ধি সব চেয়ে বেশী। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনায় ইহার এক সময়ে যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই হইল যেন মৌলিক আবিষ্কারক। যথার্থ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সে জ্ঞানের সন্ধান করিতেছে। সুতরাং মূলতঃ এটিও খেলার নীতি। কতকগুলি কারণে, প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা অনবরত বাড়িয়া চলার ফলে, এই পদ্ধতির আদর বর্ত্তমানে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আবিক্রিয়া পদ্ধতির মধ্যে যে যথার্থ গুণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তিত আকারে ইহাকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যদি না রাখা হয়, তবে সে শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য নূতন পদ্ধতি হইল হেলেন পার্কহার্ষ্ট (Helen Parkhurst) প্রবর্ত্তিত ডল্টন প্রণালী (Dalton Plan); আমেরিকার একটি সহরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পাঠ্যসূচীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সময়তালিকার (time-table) ব্যবস্থা বাদ দিয়া শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্ত্তে যতখানি সম্ভব শিক্ষার্থীকে নিজ ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিতে দেওয়া এই পদ্ধতির বিধান। এই পদ্ধতিতে সুনির্দ্দিষ্ট পাঠ্যাংশ (assignment) স্থির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত আছে। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন বিষয় কতখানি অধ্যয়ন করিতে হইবে, উহাতে

সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য ও পাঠপদ্ধতি সম্বন্ধে সহায়তাও উহাতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা যখন যেভাবে ইচ্ছা একাকী বা দলবদ্ধরূপে এই পাঠ্যাংশ আয়ত্ত করে। কোনও বিশেষ পাঠ্য বিষয়ে যদি শ্রেণীগত অধ্যাপনার প্রয়োজন থাকে, তবেই শুধু উহার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং মেধাবী ছাত্রেরা শিক্ষকের সাধারণ নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পড়াশুনায় অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, আর শুধু যেটুকু দরকার, কেবল সেইটুকুই শিক্ষকের সাহায্য বা অধ্যাপনার সুযোগ লয়। অবশ্য সহজেই বুঝা যায় যে, বৃহৎ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার বহু বাধা ও জটিলতা আছে। এইজন্য যে সকল স্থানে ইহা প্রথমে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তেমন অনেক স্থানে পরে ইহাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে বা অন্ততঃ আগাগোড়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহা হইলেও এখনও অনেক বৃহৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে সামান্য বদল করিয়া ইহার অনুসরণ করা হয়। তাহা ছাড়া অন্য অসংখ্য বিদ্যালয়েও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ফলে শ্রেণীগত অধ্যাপনাকে পূর্ব্বে যে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হইত, তাহার তুলনায় সেখানে এখন পড়াশুনায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চেষ্টা ও নিজস্ব ক্রিয়াতৎপরতাকে অধিক মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে।

উল্লিখিত শিক্ষাধারাগুলিতে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ব্যাপারে স্বাধীনতা নীতির প্রয়োগ করা হইয়াছে। উহার সঙ্গে আর এক বিস্ময়কর পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়। তবে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলারক্ষা সম্পর্কেই কার্য্যকরী। এটি হইল হোমার লেন (Homer Lane) প্রতিষ্ঠিত 'ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র' (Little Commonwealth)। এই প্রতিষ্ঠান চৌদ্দ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়সের দুষ্ক্রিয় বা অপরাধপ্রবণ (delinquent) বালকবালিকাদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। একজন বিচক্ষণ বিচারক উহাদের লেনের হাতে অর্পণ করিতেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রতিষ্ঠানটি বাড়ার সঙ্গে অন্য অনেক নিরপরাধ শিশুও ইহার মধ্যে স্থান পাইতে আরম্ভ করিল। উহারা আসায় প্রতিষ্ঠানের সংশোধন প্রভাবের বিশেষ সুবিধা হইল। লেনের ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি প্রত্যেক নূতন সভ্যকেই একেবারে স্তম্ভিত করিয়া

দিত। উহা ছিল এই যে, সভ্যদের যাহা কিছু শৃঙ্খলা বা শাসন মানিয়া চলিতে হইত, তাহার সমস্তই তাহাদের নিজেদের দ্বারা গঠিত হইত এবং পরিচালনা-ভারও সম্পূর্ণভাবে তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গণতন্ত্রের ন্যায় অবাধে তাহারা নিজেদের সকল ব্যাপার নিজেরাই নির্ব্বাহ করিত।

অপরাধ সংশোধনের বিদ্যালয়সমূহ (Reformatory Schools) যে নিয়মে পরিচালিত হয়, উহা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছে। যে যুক্তিবলে উহা সম্ভব হইল তাহা সরল ও স্পষ্ট। লেন বলেন যে, অল্প বয়সে অপরাধ-প্রবণতা বিকৃত প্রকৃতিপ্রসূত নহে। কতকগুলি প্রবল বৃত্তি কুপথচালিত হওয়ার ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে ; বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক প্রকাশপথ না পাওয়ায় অবৈধ ও অসামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে। মনোবিদ্যায় বলা হয় যে নিষ্ঠুরভাবে জোর করিয়া এগুলির অবদমন (repression) করিলে উপযুক্ত প্রতিকার হয় না। ইহাদের উদ্‌গতি (sublimation) সাধন করিতে হয় (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। লেনের পদ্ধতিতেও এই সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে ছেলে মা বাপ ও শিক্ষককে নিরাশ করিয়াছিল, যে হয়ত এক বস্তীর আতঙ্কস্বরূপ ছিল ও যাহার সংশোধনের আশা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে আসিয়া পড়িল এক কৃষিক্ষেত্রে কতকগুলি সমবয়সীর মধ্যে। তাহারা প্রত্যেকেই এমন সব ক্রিয়ায় নিযুক্ত ও ব্যস্ত যে, উহা দেখিলে আপনা হইতেই কাজ করিতে ইচ্ছা যায়। বালকের শক্তি-প্রাচুর্য্যও এইভাবে কাজে লাগিবার সুযোগ পায়। সে দেখে যদি সে অন্যদের সঙ্গে কাজ করে, তবে সেও স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে পারিবে। আর তাহা না করিলে তাহাকে সমবয়স্ক বালকবালিকাদের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকিতে হইবে ও স্বভাবতঃই সকলে তাহাকে ঘৃণা করিবে। এখানকার আইন অমান্য করায় কোনও আনন্দ নাই ; কারণ এখানে একমাত্র আইন যাহাদের দ্বারা রচিত, তাহারাও পূর্বে ছেলেটির নিজের দুষ্ট দলের মতই ছিল। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নাই যে, এ অবস্থায় দুর্দ্দান্ত, ফাঁকিবাজ ও অলস বালকও পরিশ্রমী কৃষকে পরিণত হইল। যে পূর্ব্বে আইন ভঙ্গ করিত, সেই নিজেদের সৃষ্ট আইনের প্রধান রক্ষক হইয়া উঠিল।

মন্টিসরি, পার্কহার্ষ্ট ও লেনের মতবাদ বিস্তারিতভাবে দেওয়া গেল, কারণ পুরাতন আবিক্রিয়াপদ্ধতির ন্যায় এগুলির প্রভাবও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়াছে। ইহার ফলে অনেক স্থলেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই দিক হইতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারের সূচনা হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে এই সংস্কারের মূল কথা হইল এই যে, শিক্ষক ও পিতামাতার পুরাতন কর্ত্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব বদলাইতে হইবে; বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে অধিকতর দায়িত্ব শিশুদের নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে; অধ্যাপনার প্রণালী আরও নমনীয় করিতে হইবে, যাহাতে উহা বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রের পৃথক পৃথক প্রয়োজনের বেশী উপযোগী হয়, এবং ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের তারতম্যের প্রতিও অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের দেশে গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত নূতন বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর গঠনমূলক হাতের কাজকেই তাহার শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ধরা হইয়াছে। এক কথায়, ব্যক্তির যে স্বতঃস্ফূর্ত্ততাকে খেলার প্রাণবস্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই অধিকতর সহায়তা লওয়ার চেষ্টা এই শিক্ষাসংস্কারে করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালী ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়েরও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথাও শিশুর সৃষ্টিমূলক শক্তিকে অধিকতর সুযোগ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার কোথাও বিদ্যালয়ের পড়াশুনা এবং বৃহত্তর জগতের কার্য্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ ও সার্থক সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে।

শিক্ষার এই নবধারার আলোচনা প্রসঙ্গে এখন দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠে। প্রথমটি হইল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কার্য্য।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শিশুকে যদি জ্ঞানরাজ্যে নিজ ব্যবস্থা ও সময় অনুযায়ী অগ্রসর হইতে দেওয়ার বিধান হয়, ত উহার সহিত কঠোর শ্রেণী-ব্যবস্থা (class-system) বা সময়সূচী (time-table) খাপ খাইবে না। বস্তুতঃ এই প্রথাগুলির উদ্দেশ্য, উপরে যাহা বলা গিয়াছে, তাহার ঠিক বিপরীত। কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া হইল, সেগুলি একই গতিতে একই দিকে অগ্রসর হইবে এবং বাহ্য বিধান অনুযায়ী এক পাঠ্য বিষয় হইতে অপর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। এখনও পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে যে সকল বৃহৎ শ্রেণী

বিদ্যমান আছে, সেখানে এই অদ্ভুত ধারাটি নিষ্ঠা সহকারেই চালাইতে হয়, কারণ অন্য কিছু করার সেখানে উপায় নাই। যেখানে অবস্থা এত খারাপ নহে, সেখানে তবু খানিকটা প্রতিকার সম্ভব। শ্রেণীগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্নভাবে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা চলে। যে শিক্ষার্থীর পৃথক প্রয়োজন থাকে, তাহার পক্ষে খানিকটা স্বেচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচনের এবং তাহার প্রতি পৃথক মনোযোগ দিবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু যদিও শ্রেণীশিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন এইভাবে হয়, তবুও তাহার মূলনীতিটি ইহাই থাকিয়া যায় যে, শিক্ষক নির্দ্দেশ দিবেন যে কোন বিষয় কি ভাবে কখন শিখিতে হইবে, ছাত্র শুধু যথাসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিবে। পক্ষান্তরে মন্টিসরি বিদ্যালয়ে এই নীতিই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষার পৃথক কেন্দ্র। মানুষের জীবন সমাজবদ্ধ, এবং বিদ্যালয়ও এক ক্ষুদ্র সমাজ, এইজন্য কতকগুলি নিয়ম ও সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া বাঁধাধরা কোনও সময়সূচী বা শ্রেণীব্যবস্থা নাই। শিশুগণ নিজেদের ন্যায্য সীমার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চলিয়া থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের বেলায়ও অবশ্য এই পদ্ধতির অন্ততঃ খানিকটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে একই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি দ্বারা বৃথা অপচয় হয়, আবার অনেক স্থলে শ্রেণীগত অধ্যাপনায় যে ফল হয়, অন্য কোনও প্রণালীতে তাহা হয় না। উপরন্তু যে সকল ক্রিয়া সহযোগিতামূলক, যেমন সঙ্গীত, উদ্যান পালন, কৃষিকার্য্য, কারুশিল্প, শরীরচর্চ্চা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি, উহাদের বন্দোবস্তও রাখিতে হইবে। এই সব কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়, স্থান ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতি এবং প্রয়োগবিধি ও গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে যথার্থ পার্থক্য থাকিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, পুরাতন মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিলেও ইহাতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়, ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে শিক্ষকের কথা ধরা যাক। পাঠক হয় ত মনে করিতেছেন যে শিশু যে ব্যবস্থায় নিজ ব্যক্তিতার স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া তাহারই বিকাশ সাধন করিবে, সেখানে শিক্ষকের করিবার আর কি রহিল, তাহা, বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মন্টিসরি, পার্কহার্ষ্ট ও লেনের মতবাদ বিস্তারিতভাবে দেওয়া গেল, কারণ পুরাতন আবিষ্ক্রিয়াপদ্ধতির ন্যায় এগুলির প্রভাবও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়াছে। ইহার ফলে অনেক স্থলেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই দিক হইতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারের সূচনা হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে এই সংস্কারের মূল কথা হইল এই যে, শিক্ষক ও পিতামাতার পুরাতন কর্ত্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব বদলাইতে হইবে ; বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে অধিকতর দায়িত্ব শিশুদের নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে ; অধ্যাপনার প্রণালী আরও নমনীয় করিতে হইবে, যাহাতে উহা বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রের পৃথক পৃথক প্রয়োজনের বেশী উপযোগী হয়, এবং ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের তারতম্যের প্রতিও অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের দেশে গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত নূতন বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর গঠনমূলক হাতের কাজকেই তাহার শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ধরা হইয়াছে। এক কথায়, ব্যক্তির যে স্বতঃস্ফূর্ত্ততাকে খেলার প্রাণবস্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই অধিকতর সহায়তা লওয়ার চেষ্টা এই শিক্ষাসংস্কারে করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালী ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়েরও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথাও শিশুর সৃষ্টিমূলক শক্তিকে অধিকতর সুযোগ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার কোথাও বিদ্যালয়ের পড়াশুনা এবং বৃহত্তর জগতের কার্য্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ ও সার্থক সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে।

শিক্ষার এই নবধারার আলোচনা প্রসঙ্গে এখন দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠে। প্রথমটি হইল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কার্য্য।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শিশুকে যদি জ্ঞানরাজ্যে নিজ ব্যবস্থা ও সময় অনুযায়ী অগ্রসর হইতে দেওয়ার বিধান হয়, ত উহার সহিত কঠোর শ্রেণী-ব্যবস্থা (class-system) বা সময়সূচী (time-table) খাপ খাইবে না। বস্তুতঃ এই প্রথাগুলির উদ্দেশ্য, উপরে যাহা বলা গিয়াছে, তাহার ঠিক বিপরীত। কারণ ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া হইল, সেগুলি একই গতিতে একই দিকে অগ্রসর হইবে এবং বাহ্য বিধান অনুযায়ী এক পাঠ্য বিষয় হইতে অপর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। এখনও পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে যে সকল বৃহৎ শ্রেণী

বিদ্যমান আছে, সেখানে এই অদ্ভুত ধারাটি নিষ্ঠা সহকারেই চালাইতে হয়, কারণ অন্য কিছু করার সেখানে উপায় নাই। যেখানে অবস্থা এত খারাপ নহে, সেখানে তবু খানিকটা প্রতিকার সম্ভব। শ্রেণীগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্নভাবে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা চলে। যে শিক্ষার্থীর পৃথক প্রয়োজন থাকে, তাহার পক্ষে খানিকটা স্বেচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচনের এবং তাহার প্রতি পৃথক মনোযোগ দিবার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু যদিও শ্রেণীশিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন এইভাবে হয়, তবুও তাহার মূলনীতিটি ইহাই থাকিয়া যায় যে, শিক্ষক নির্দ্দেশ দিবেন যে কোন বিষয় কি ভাবে কখন শিখিতে হইবে, ছাত্র শুধু যথাসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিবে। পক্ষান্তরে মন্টিসরি বিদ্যালয়ে এই নীতিই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষার পৃথক কেন্দ্র। মানুষের জীবন সমাজবদ্ধ, এবং বিদ্যালয়ও এক ক্ষুদ্র সমাজ, এইজন্য কতকগুলি নিয়ম ও সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া বাঁধাধরা কোনও সময়সূচী বা শ্রেণীব্যবস্থা নাই। শিশুগণ নিজেদের ন্যায্য সীমার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চলিয়া থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের বেলায়ও অবশ্য এই পদ্ধতির অন্ততঃ খানিকটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে একই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি দ্বারা বৃথা অপচয় হয়, আবার অনেক স্থলে শ্রেণীগত অধ্যাপনায় যে ফল হয়, অন্য কোনও প্রণালীতে তাহা হয় না। উপরন্তু যে সকল ক্রিয়া সহযোগিতামূলক, যেমন সঙ্গীত, উদ্যান পালন, কৃষিকার্য্য, কারুশিল্প, শরীরচর্চ্চা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি, উহাদের বন্দোবস্তও রাখিতে হইবে। এই সব কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়, স্থান ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্যবস্থার সাধারণ প্রকৃতি এবং প্রয়োগবিধি ও গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে যথার্থ পার্থক্য থাকিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, পুরাতন মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিলেও ইহাতে প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়, ইতিমধ্যেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে শিক্ষকের কথা ধরা যাক। পাঠক হয় ত মনে করিতেছেন যে শিশু যে ব্যবস্থায় নিজ ব্যক্তিতার স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া তাহারই বিকাশ সাধন করিবে, সেখানে শিক্ষকের করিবার আর কি রহিল, তাহা, বুঝিয়া উঠা কঠিন।

আবার যখন তিনি শুনিবেন যে মন্টিসরির মতে শিক্ষকের (এ ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর, কারণ এই শিক্ষাদানের ভার প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রীদের হাতে) একমাত্র কর্ত্তব্য হইল পর্য্যবেক্ষক (observer) হইয়া থাকা, তখন তিনি আরও হতবুদ্ধি হইবেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের জীবনে যতই স্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতা থাক না কেন, সেই জীবনযাত্রা হইবে একটি নির্ব্বাচিত পরিবেশের মধ্যে, আর সেই নির্ব্বাচন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকেই করিতে হয়। নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চসজ্জার মত, যা কিছু পূর্ব্বায়োজন ও উপকরণ সংগ্রহের ভার শিক্ষকের উপরই থাকে! সুতরাং তিনি নাটকে অংশ গ্রহণ না করিয়া, বন্ধুবৎ আগ্রহে শুধু দর্শক হইয়া থাকিলেও, অভিনয় যে কোন পথে চলিবে, তাহার সীমা পূর্ব্বাহ্নে তিনিই নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাই মন্টিসরি বিদ্যালয়ে শিশু যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে, সে কথা সত্য হইলে তাহার নিজস্ব ইচ্ছার সীমাও অতি সতর্ক ও সঙ্কীর্ণভাবে বাঁধা আছে। সে কতকগুলি খুঁটি লইয়া উহাদের নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে লাগাইতে পারে, রঙীন ঘুঁটি যথাস্থানে সাজাইতে পারে, খেলনা হইতে সংখ্যার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে। কারণ সেখানকার ব্যবস্থা এরূপ যে এ সমস্ত ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। বস্তুতঃ এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান বিশেষত্বই হইল যে, ইহার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায় না। শিশু মাথা খাটাইয়া শিক্ষামূলক খেলনাগুলিকে যে কাজেই লাগাইতে চেষ্টা করুক না কেন, উহা আসলে যে উদ্দেশ্যের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইটিই শুধু তাহার চোখে পড়িবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? শিক্ষয়িত্রীর ইচ্ছার বলেই এরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন, তিনি চাহেন যে শিশু ঘুঁটিগুলি লইয়া সৈন্য বা অন্য কিছু করিয়া খেলিতে পারিবে না; এমনভাবেই সে খেলিবে যাহাতে দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হয়। এই খেলনাগুলি ব্যবহারের নির্দ্দেশ সুবিবেচনা সহকারে দেওয়া হয়। অনুকরণের দ্বারা সব শিশুই উহা করিতে থাকে, আর শেষে উহা বিদ্যালয়ের সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু এই সংস্কার সুরক্ষিত করিবার জন্য উহার পিছনে শিক্ষয়িত্রীর ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে।

উপরন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে মন্টিসরি শিক্ষয়িত্রীকে পর্য্যবেক্ষক

করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শকের কথা বলেন নাই। তিনি চাহেন সক্রিয় পর্য্যবেক্ষক। ইনি অযথা শিশুদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন হইবামাত্র সহায়তাদানের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। ইনি প্রত্যেক শিশুর উন্নতির বিস্তারিত বিবরণলিপি রাখিবেন ; এবং সতর্ক অথচ সংযত মাতার ন্যায় যদি কখনও একটু উপদেশ বা সহায়তার দ্বারা সুফল হয়, তবে এরূপ সুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

তেমনই আবার বয়স্ক শিক্ষার্থীগণের শিক্ষকের বেলায়, তাঁহার যদি 'গুরুগিরি' মনোভাবের উপর সম্পূর্ণ বিরাগ থাকে, তবু তাঁহার শিক্ষক না হইলে অর্থাৎ অধ্যাপনা ত্যাগ করিলে চলিবে না। তথাপি তাঁহার অধ্যাপনার রূপ বদলাইতে পারে, কিন্তু তাহার গুরুত্ব একবিন্দুও কমিবে না। বরঞ্চ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং শিক্ষাদানকৌশলের অধিকতর প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। তাঁহাকে এমন একটি পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে ও রক্ষা করিতে হইবে যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রেরণা জাগ্রত হয়, এবং সহজভাবে তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। পাঠ্যবিষয়ে তাঁহার নিজেরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আছে, তাই তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে যে অনুপ্রেরণা, অভিভাবন (suggestion) এবং সমালোচনার দ্বারা সেই জ্ঞানের মহিমা ছাত্রদের সম্মুখেও প্রকাশিত হয় ও উহা এবং তাহাদের আকৃষ্ট করে। বৃহত্তর জগৎ হইতে বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জগতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনা হইবে তাঁহার কার্য্য। আর এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে ব্যবস্থাপনা এবং সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিলেও বিদ্যালয় পরিচালনায় এগুলির স্বাভাবিক স্থান রাখিতেই হইবে। পুরাতন অধ্যাপনা-ধারায় যেমন অতীতের অনেক ভুল আছে, তেমনই বহু শতাব্দীর আন্তরিক ও সহিষ্ণু প্রচেষ্টার বহু সুফলও উহাতে আছে, সুতরাং উহা একেবারে অচল হইতে পারে না। ন্যায্য সমালোচনার দ্বারা সংশোধিত হইলে এই পদ্ধতি দ্বারাই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

মানসিক শিক্ষা হইতে এখন নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় আসা যাক। দেখা যায় যে শিক্ষায় নব স্বাধীনতার উৎসাহীগণের অনেকে বিচার বিবেচনা না করিয়াই এই ধারণা পোষণ করেন যে, শিশুরা স্বভাবতঃই ভাল, এ কথাটির

অর্থ হইল এই যে, ফুলের দেহে যেমন আপনিই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তেমনই শিশুদের স্বাধীনতা দিলে তাহাদের মধ্যেও নৈতিক উৎকর্ষ ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য অনেকে যে বলেন মনুষ্যপ্রকৃতি অতিশয় অসৎ ও মন্দ, তাহার চেয়ে এ ধারণা ভাল। কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া শিশুদের নৈতিক বিকাশ সাধনের ভার তাহাদের নিজেদের হাতেই সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে বড়ই ভুল করা হইবে। একথা হয়ত সত্য যে শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ ভালর দিকে। কিন্তু জীবনের যে সব সমস্যা পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মহানুভব মনীষীদেরও বিভ্রান্ত করিয়াছে, শিশু যে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সেগুলির সমাধান করিতে পারিবে এরূপ আশা করাই অন্যায়।

সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় আচরণের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুর কথাই প্রথমে ধরা যাক। শিক্ষয়িত্রী যে তাহার উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করিবেন, সে কার্য্য শুধু শিশুর যথোচিত ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া এবং তাহার খেলার সাথী আনিয়া দিয়াই শেষ হইবে না। তাঁহাকে নিজেই সর্ব্বদা সে পরিবেশের গুরুতর অংশরূপে থাকিতে হইবে। তাঁহার উচ্চতর শক্তি, জ্ঞান এবং পরিণত ব্যক্তিতার প্রভাব শিশুদের মনে আসা চাই। এ প্রভাব উপদেশ অনুজ্ঞার ছলে না হইয়া পরোক্ষ-ভাবে অভিভাবন (suggestion) ও দৃষ্টান্তের দ্বারাই হওয়া ভাল। কিন্তু প্রত্যক্ষ শিক্ষা দ্বারা না হইলেও সেজন্য ইহার শক্তি কিছু কম হইবে না। তিনি যদি নিজ কার্য্যের উপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষার্থীরা এমন বহু গুণ শিক্ষা করিবে যে সেগুলির প্রভাবে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের মধ্যে, সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যে প্রভেদ কোথায়।

বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের বেলায়ও তাই। সেখানে শিক্ষকের পক্ষে এমন এক ধারণা পোষণ করা বড়ই আকর্ষণীয় যে কুম্ভকারের মাটির বাসন নির্ম্মাণের মত সম্পূর্ণভাবে তিনিই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। সে ধারণা অবশ্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ ছাড়িতে হইবে। কিন্তু তবু তাঁহার অধিক বয়স, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গুণে যে মর্য্যাদা ও প্রভাব আপনি আসিয়া পড়ে, তাহা তিনি রোধ করিতে পারিবেন না, পারিলেও সে চেষ্টা করা উচিত নহে। শিক্ষার্থীদের

পড়াশুনার উপর তাঁহার যে প্রভাব বর্ত্তমান তাহার দ্বারা বিদ্যালয় ও শ্রেণীর নৈতিক জীবন বহু পরিমাণে উন্নত না হইয়াই পারে না।

আবার এ কথা খুবই সত্য যে নৈতিক বোধ যদি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করা যায়, এবং নিজের ক্রিয়াকলাপে স্বাধীনভাবে উহা অনুসরণ করা যায়, তবেই সাধারণতঃ উহা অধিক শক্তিশালী হইতে পারে। বিদ্যালয়ের শাসনভার যে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, এই সত্যটি, শিশুরা স্বভাবতঃই ভাল এমন কাল্পনিক যুক্তির চেয়ে এই যুক্তির দ্বারাই যথার্থরূপে সমর্থিত হয়। এই বিধানটি এত গুরুতর যে ইহাকে ক্ষুণ্ণ করার চেয়ে বরং শিক্ষককে যদি কিছু সামান্য অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দিতে হয়, সেও ভাল। তিনি যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন ত দেখিবেন যে অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যায়ের অপ্রীতিকর পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে শিক্ষার্থীদের মনে আপনিই উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগিবে। তবে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়সমাজের সভ্যরূপে সমান অধিকার থাকিলেও, একটি বিষয়ে তাঁহার এক বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। তাহা এই যে, কয়েকজনের অনিষ্টকর প্রভাবে অথবা বাকী সকলের নৈতিক দুর্ব্বলতার ফলে যদি বিদ্যালয়জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসে, উহার প্রতিবিধান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এই ধরণের বিপদের সম্ভাবনা হয়, এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে নৈতিক বোধ জাগ্রত ও সক্রিয় করা যদি সম্ভব না হয়, তবে শিক্ষককে উচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং জোরের সহিতই তাহা করা দরকার। এই উক্তি এবং ইহার পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন যে তাঁহার এ কার্য্য স্বৈরাচারপ্রসূত নহে। যে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাঁহার দুষ্কৃতিপরায়ণ শিক্ষার্থীদের যুক্ত দায়িত্ব আছে, তাহার মর্য্যাদারক্ষার জন্যই তাঁহাকে এই চূড়ান্ত পন্থা লইতে হইয়াছে। কারণ, বিদ্যালয়েও আসলে এই বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ।

নবম অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ

শিশুর শিক্ষাতে তাহার নিজের কতখানি হাত আছে, আর শিক্ষকেরই বা কতটা করিবার রহিয়াছে, এই দুইটির তুলনায় কোন্‌টির প্রাধান্য অধিক, সে সম্পর্কে প্রবল তর্ক বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাধারণ রূপে প্রশ্নটি এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শিশুর পরিণতির পক্ষে প্রকৃতি বা পালন, অর্থাৎ বংশগত গুণাবলী বা পরিবেশের সক্রিয় প্রভাব, এই দুইটির কোনটির গুরুত্ব বেশী।

শিশুর পালন বা পরিবেশের প্রভাবই যে গুরুতর, সে বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ দাবী করিয়াছেন ফরাসী দার্শনিক হেলভেশিয়াস্ (Helvetius)। তাঁহার বক্তব্য এক কথায় বলা যায় যে, শিক্ষাই সব। তাঁহার মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেন ফ্রান্সিস গল্টন (Francis Galton) এবং তাঁহার অনুগামীগণ, ইঁহারাই আধুনিক সুপ্রজননবিদ্যার (eugenics) উদ্ভাবন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এক গ্রন্থে হেলভেশিয়াস মানুষে মানুষে সামর্থ্য, রুচি ও চরিত্রের এতখানি বৈষম্য হয় কেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে ইহার একটি মাত্র কারণ, শিক্ষার পার্থক্য। প্রারম্ভেই তিনি জন লকের (John Locke) প্রসিদ্ধ মতবাদ মানিয়া লইয়াছেন যে, মানুষের মনের যা কিছু ভাব সমস্তই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আসে। তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, যদি দুই ব্যক্তিকে জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার সময়টি হইতেই এমন অবস্থায় রাখা যায় যে তাহাদের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনগুলি (sensation) এক হইবে, তাহা হইলে তাহাদের মনও একরূপ হইবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ত ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনে অপরের তুলনায় অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এ যুক্তি বুদ্ধি ছাড়া চরিত্রের বেলায়ও

প্রযোজ্য। রুশো (Rousseau) যে তাঁহার এমিল (Emile) গ্রন্থে জোর দিয়া বলিয়াছেন যে মানুষ জন্মিবার সময় নির্দ্দোষ থাকে, সে কথা ঠিক নহে। আবার সে দোষ লইয়া জন্মায় তাহাও ঠিক নহে। যেরূপ শিক্ষার প্রভাব পড়ে, সেই অনুযায়ী দোষ গুণেরও উৎপত্তি হয়।

রবার্ট ওয়েনও (Robert Owen) এক নীতি প্রচার করেন, উহাও মূলতঃ এইরূপ। তিনি বলেন যে মানুষ নিজে কখনও নিজের ধারণাবলী বা চরিত্র গঠন করিতে পারে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট এবং নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সে যাহা শিক্ষা করে, তাহারই প্রভাবে তাহার ধারণা ও চরিত্র উভয়ই গড়িয়া উঠে। সুতরাং উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করিলে সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কি সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে সব চেয়ে নিকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞ হইতে সব চেয়ে জ্ঞানী, যে কোনও রকমের চরিত্র সৃষ্টি করা যায়। সে কৌশল হইল শিক্ষা, তবে কথাটি এখানে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে।

ওয়েন তাঁহার নীতি কার্য্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, হেলভেশিয়াসের তাহা করা হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে ওয়েন এক প্রসিদ্ধ শিক্ষাধারার প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায়, এবং এ শিক্ষার প্রণালীও সুন্দর ছিল।

হেলভেশিয়াস ও ওয়েনের নীতিতে এই যে আশাবাদ আমরা পাই, গল্‌টন ও তাঁহার অনুগামীদের মত ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা সহজাত প্রকৃতিকে এত উর্দ্ধে উঠাইয়াছেন যে পালনের গুরুত্ব অতি সামান্য হইয়া পড়ে। ইঁহাদের যুক্তির মূলে ইঁহারা বংশগতির (heredity) কয়েকটি অকাট্য উদাহরণ দেখাইয়াছেন। এই সূত্রে গল্‌টন বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে কোনও যমজ সন্তানের ভয়াবহ ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের সারা জীবনব্যাপী আচরণ এমনই সমরূপ, যে মনে হয় যেন তাহারা এক কারখানায় প্রস্তুত একই ভাবে চালিত কলের পুতুল। এইগুলি এবং আরও আধুনিক এই ধরণের সব বিবরণ হইতে এই নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে যে আমরা প্রত্যেকে জীবনের পথে আমাদের জন্মগত প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছি, তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সৌভাগ্যক্রমে যমজ সন্তান

বেশী হয় না বলিয়া আমরা এই অপ্রীতিকর ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি। পণ্ডিতগণ বহুসংখ্যক তথ্যপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে মানুষের আকার বা কপালাঙ্কের (cephalic index) বেলায় পূর্ব্বপুরুষদের সহিত যতখানি অনুবন্ধ (correlation) অর্থাৎ মিল আছে, চরিত্রের বেলায়ও ঠিক ততখানি রহিয়াছে। আর পরিশেষে সুপ্রজননবিদ্যার (eugenics) গবেষণার ফলেও এইরূপ বহু নৈরাশ্যকর তথ্য বাহির হইয়াছে। তাহাতে এই কথাটিই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, মানুষের জীবনে অবস্থার প্রভাব জাহাজের পক্ষে ঝড় ও স্রোতের তুল্য, অর্থাৎ ইহার দ্বারা তাহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, গুণের উৎপত্তির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

হেল্‌ভিশিয়াস ও গল্‌টনের মতবাদে সম্পূর্ণ বিরোধ আছে তাহা সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মধ্যে একটিকে সম্পূর্ণভাবে অপরটিকে বাদ দিয়া লইলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। কিন্তু সচরাচর যেমন দেখা যায়, এখানেও আমাদের সমস্যা হইতেছে যে দুইটি বিরুদ্ধ মতের একটিকে বাছিয়া না লইয়া, চরিত্রের বিকাশে দুইটি পৃথক শক্তির কোন্‌টির প্রভাব কতখানি, তাহাই আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে। মানসিক বিকাশের তথ্যগুলির সহিত মনোবিদ্‌গণের যতই ঘনিষ্ঠ চাক্ষুষ পরিচয় হয়, এ সমস্যাও ততই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যেমন সচরাচর ধারণা ছিল যে অল্পবয়সে অপরাধ প্রবণতা (juvenile delinquency) প্রায় সর্ব্বদাই মন্দ প্রকৃতির ফলেই হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও ঘটনাসমূহের পরীক্ষা দ্বারা সে ধারণা সমর্থিত হয় না। ইহাতে দেখা যায় যে তরুণ বয়সে যে সকল প্রভাবে দুষ্ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেগুলি বড়ই জটিল। ইহারই এক পরীক্ষায় ২২,০০০ এর মধ্যে বাছিয়া লওয়া ৪০০০ বালক কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ জড়বুদ্ধি (mentally defective) দেখা গিয়াছিল। সাধারণের তুলনায় ইহা অধিক, এ কথা সত্য। কিন্তু অন্য সব বিষয়েই বংশগতির নিদর্শন ছিল অতি অল্প। উহাদের বাড়ীর অবস্থারই বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়াছিল, যেমন পরিবারভুক্ত পোষ্যের সংখ্যা অত্যধিক, মাতাপিতার কলহ, পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি, শৃঙ্খলার অভাব, অবহেলা বা কঠোরতা, গৃহের প্রভাব হইতে

বালককে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা, প্রভৃতি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে দুষ্ক্রিয় বালকগণের মধ্যে সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা সাধারণের চেয়ে অধিক ছিল না। আবার, এরূপও হইতে পারে যে বিদ্যালয়ে তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে উহা তাহাদের প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। যে সমস্ত ছেলেরা নিষ্ক্রিয় ও আজ্ঞাবাহী, তাহাদের প্রধানতঃ স্নেহের নির্দ্দেশে কাজ হয়। কিন্তু যাহারা অস্থির ও সংগ্রামপ্রিয়, তাহাদের কঠোর সতর্ক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়। সে পার্থক্য ইহাদের শিক্ষাকালে হয় ত করা হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য বহু পরীক্ষা হইতেও একই ফল পাওয়া গিয়াছে। আর দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া অতি হীন ঘরের ছেলেও সুশীল ও গুণবান্ হয়।

এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনে সামাজিক বংশগতির (social heredity) প্রভাবকে গল্‌টনের মতবাদে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য উহাতে সাধারণ মানুষের শক্তিসামর্থ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কতকটা নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে সকল মনোবিৎ, চিকিৎসক ও অন্যান্য পর্য্যবেক্ষকগণ চিকিৎসাসূত্রে সাধারণ সৈনিকগণের মনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হন যে নিকৃষ্ট শিক্ষা এবং মন্দ সামাজিক ব্যবস্থার ফলে কি বিপুল পরিমাণ প্রতিভা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবার অপর দিকে হেল্‌ভেশিয়াসের মতবাদের সহজ আশাবাদিতায় প্রত্যেক মানুষের সাধারণ ও বিশেষ শক্তির মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। আসলে মানুষের সম্ভাবনার সীমা এই শক্তির দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই মতের অনুবর্ত্তীগণ মানুষের ভাব বা ধারণাশক্তিকে যে গুরুত্ব দিয়াছেন, উহার প্রাধান্য যথেষ্ট থাকিলেও তাহাতে অনেকখানি ছেলেমানুষী আছে। তাহারই ফলে তাঁহারা ভাবিয়া লইয়াছেন যে, মানুষের মন এমনই বস্তু যে দক্ষতার সহিত চেষ্টা করিলে পূর্ব্বপরিকল্পিত যে কোনও আকারে উহাকে গড়িয়া তোলা হয়। তাঁহাদের নীতিতে মানুষের স্বকীয় শক্তির প্রাধান্যকে খর্ব্ব করা হইয়াছে। ইহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে গেলে শিক্ষার দিক দিয়া বহু অপচয় ঘটিবে। বিশেষতঃ ইহাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি

মনীষীগণের প্রতি অবহেলা হইবে। প্রত্যেক জাতির সকল শ্রেণীতেই এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি থাকেন; তাঁহাদের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের সামর্থ্য ও প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ সাধনের সুযোগ দেওয়াই উচিত কার্য্য।

এখানে উল্লেখ করা করা প্রয়োজন যে, মানবচরিত্রের বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ, উভয়ের গুরুত্ব আমরা পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্যক্তির স্বাধীনভাবে নিজ পরিবেশকে কাজে লাগাইবার সুযোগ রহিয়াছে, এই যে যুক্তি এ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সত্যতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ দেহমন-ধারী মানবই সৃষ্টিমূলক শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। তাহার গড়িবার উপকরণ হইল প্রকৃতিগত গুণাবলী ও পরিবেশ। সুতরাং মানুষ এগুলি হইতে যাহা পায়, উহাই যে তাহাকে গড়িয়া তুলে তাহা নয়। মানুষের অস্তিত্বের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্বাধীন ক্রিয়া, উহা সেই ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়া থাকে মাত্র।

সুতরাং মানুষের জন্মগত শক্তির পার্থক্যের কথা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে এই শক্তির বাহ্যরূপ কি, কিরূপেই বা ইহার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই সূত্রে আমাদের আধুনিক মনোবিদ্যার এক প্রধান ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে হইতেছে। ইহার প্রারম্ভে দেখা যায় যে ফরাসী মনোবিৎ অ্যাল্‌ফ্রেড বিনে (Alfred Binet) বুদ্ধি মাপিবার জন্য 'মেট্রিক মানদণ্ড' (Metric Scale of Intelligence) উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে এক বৃহৎ সমস্যা সকল বড় সহরেই শিক্ষার ব্যবস্থা-পকগণকে বড় বিব্রত করিয়াছিল। তাহা লইয়াই ইনি গবেষণা আরম্ভ করেন। সমস্যাটি এই যে, অনেক সময়ে শিশু যে পড়াশুনায় সমবয়স্ক অন্য শিশুদের পিছনে পড়িয়া থাকে, তাহার কারণ কি প্রত্যেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির অল্পতা না শুধু অবস্থার প্রতিকূলতা, যেমন ক্রমাগত বিদ্যালয় বদল। বিনে এই কথাটি ধরিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন যে সকল শিশুরই জন্মগত কিছু বুদ্ধি বা সামর্থ্য থাকে; তাহার ফলে সে বাড়িবার বয়সে কোনরূপ শিক্ষা না পাইলেও প্রতি বৎসর খানিকটা অগ্রসর হয়, অর্থাৎ উন্নতি লাভ করে। যেমন সকল শিশুর জীবনে এমন একটি সময় আসে, যখন সে নিজেই জানিয়া লয় যে তাহার দুটি চোখ, দুটি কান ও নাক আছে। এক সময়ে সে সপ্তাহের সাত বারের নাম এবং কোন্‌টিরপর কোন্‌টি আসে তাহা জানিতে পারে। একটি

সময়ে কতকটা জটিল কোনও নির্দ্দেশও সে রাখিয়া চলিতে পারে, আবার এক সময়ে সে কোনও নির্দ্দিষ্ট ধরণের যুক্তি হইতে ঠিক সিদ্ধান্তটি বাহির করিয়া লইতে পারে, বা কোনও নির্দ্দিষ্ট ধরণের ভুল থাকিলে তাহা বাহির করিতে পারে। এইরূপ যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিদ্যালয়ের শিক্ষাসাপেক্ষ নহে, তাহার কোন্‌টি শিশুর কত বয়সে আসে, তাহা বাহির করিবার জন্য মনোবিৎ বিনে প্যারিসের বহুসংখ্যক শিশুর উপর পরীক্ষা চালাইলেন। এইভাবে যে তালিকা প্রস্তুত হইল, তাহা যে কোনও শিশুর 'মানসিক বয়স' (Mental Age) নির্ণয় করিবার মেট্রিক মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইল।* যেমন, যে ছেলের জন্ম দশ বৎসর পূর্ব্বে, সে যদি দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে তাহার 'জন্মগত' ও 'মানসিক' বয়স সমান ধরা যায়; যদি সে বালক আট বৎসর বয়সের উপরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার মানসিক বয়সও হইবে আট, অর্থাৎ তাহার জন্মগত বয়সের চেয়ে দুই বৎসর কম। ইহার নাম হইল বুদ্ধি অভীক্ষা (Intelligence Testing)। পরে ইহার প্রয়োগ সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিয়াছে। এখন জন্মগত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স কত কম হইলে শিশুর পক্ষে সমবয়স্ক অন্য শিশুর সঙ্গে সমভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হয় না এবং তাহাকে বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাহাই নির্ণয় করা শুধু বাকী রহিল। বিনে পরে স্থির করেন যে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুর মানসিক বয়স আসল বয়সের চেয়ে তিন বৎসর কম হইলে, ও আট বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর দুই বৎসর কম হইলে এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিনে এই বিষয়ের সূত্রপাত করেন; তাহার পরে তাঁহার ও তাঁহার পন্থায় রচিত অন্যান্য বুদ্ধি অভীক্ষা পদ্ধতির অনেক উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এখন অভীক্ষা প্রশ্নগুলি আগেকার মত শুধু বুদ্ধির অল্পতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় না। সর্ব্বপ্রকারের সামর্থ্য নির্দ্ধারণে ও নানা

---

* এখানে লক্ষ্য করা দরকার চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ মানসিক বয়স আর বাড়ে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ বয়সের মধ্যে আমাদের জন্মগত অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অবশ্য বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে আমরা আরও অসংখ্যরূপে সে শক্তির প্রয়োগ করিতে পারি।

উদ্দেশ্যে আজকাল এগুলির প্রয়োগ হয়। শিক্ষার্থীগণের উপযুক্ত বৃত্তি নির্ব্বাচনের জন্য নানাবিধ অভীক্ষা ব্যবহৃত হইতেছে, কর্ম্মদাতাগণ কাজে লোক নিয়োগ করার উদ্দেশ্যেও ঐগুলি ব্যবহার করিতেছেন। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক ও পরীক্ষকগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সেই কার্য্য বিজ্ঞানসঙ্গত ও নির্ভুলভাবে করিবার জন্য মনোবিদ্‌গণ অনেক অভীক্ষা প্রশ্ন গঠন করিয়াছেন। আবার বিনে যে উদ্দেশ্যে অভীক্ষা আবিষ্কার করেন, অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া অন্তর্নিহিত সামর্থ্য নির্দ্ধারণ, তাহারও উপযোগী আরও অভীক্ষা প্রশ্ন রচিত হইয়াছে। যেমন কোনও বালক হয়ত প্রাচীন সাহিত্য পড়িবে বা দ্বিঘাত সমীকরণের অঙ্ক কষিবে, সেক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে তাহার এগুলি শিক্ষা করিবার শক্তি আছে কিনা, না থাকিলে সে পারিবে না। শিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর আবশ্যকরূপ শক্তি আছে কিনা তাহা বলিয়া দেওয়াই মনোবিদের অভীক্ষার উদ্দেশ্য। যুক্তির দিক হইতে ইহা অসম্ভব শুনাইবে, কারণ শক্তি ত শূন্যতার মধ্যে প্রকাশ পায় না, কোনরূপ কাজের দ্বারাই শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু দেখিতে এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও মনোবিৎ কৌশলে ইহা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমতঃ, এমন সব ক্ষেত্রে ছাত্রের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করা হয়, যেখানে তাহার জ্ঞান বা শক্তির উপর অধ্যাপনার প্রভাব অতি নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষার জন্য এমন সব ক্ষেত্র বা বিষয় বাছিয়া লওয়া হয় যে, সেগুলিতে সাফল্য বা অসাফল্য হইতে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও সাফল্য অসাফল্য নির্ণীত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'গরীব' বা 'শত্রু' শব্দের বিপরীতবোধক শব্দ বলিতে পারা, দুইটি রেখার কোন্‌টি বড় বলিয়া দেওয়া, ছোটখাট নির্দ্দেশ ঠিকমত পালন করা, যেমন চেয়ারের উপরে চাবিটি রাখা, বাক্‌সটি আনা, দরজা বন্ধ করা ; অথবা এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে "ক খ এর বামদিকে বসিয়াছে, গ ক এর বামে আছে, মাঝখানে কে আছে" ; এগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে নির্ভর করে না। আবার যে সব শিশুর কোনও কারণে (যেমন বধিরতা) এগুলির উত্তর দিবার মত ভাষাজ্ঞান হয় নাই, তাহাদের জন্য কৃত্যাভীক্ষার (performance

tests) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেগুলিতে ভাষাগত প্রশ্নের পরিবর্ত্তে ছবি, বস্তু, ইঙ্গিত, ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালান হয়, আর শিশুকে উপযোগী নানা ক্রিয়া করিতে হয়। আর বহু ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে শিশু এই শ্রেণীর অভীক্ষায় সাফল্যের পরিচয় দিলে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপারে বুদ্ধির প্রয়োজন, সেখানেও কৃতকার্য্য হইবে, আর যে এখানে নির্ব্বুদ্ধিতা দেখায়, সে অন্যত্রও নির্ব্বুদ্ধি প্রতিপন্ন হইবে।

মানসিক অভীক্ষার মূল্য এখন মনোবিদ্‌গণের কাছে সুপরিজ্ঞাত। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহার প্রভূত প্রচার ও খ্যাতি হয়। সে সময়ে আমেরিকার সেনাবিভাগে প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক শক্তি অনুযায়ী যথোপযুক্ত যুদ্ধের কাজ দিবার উদ্দেশ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ নবনিযুক্ত লোকের উপর এগুলি প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২১২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল, প্রশ্নগুলি এমন যে ঠিক শব্দটির নীচে লাইন টানিয়া, ভুল শব্দগুলি কাটিয়া দিয়া অথবা 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া উহাদের উত্তর দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে মাত্র ৫০ মিনিট সময় লাগিল, এবং এক সঙ্গে ৫০০ জন লোককে এইভাবে পরীক্ষা যাইত। এবং এই পরীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা পরে ঐ সকল ব্যক্তির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার সহিত অদ্ভুতভাবে মিলিয়া গিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশেও উপযোগী অভীক্ষার সাহায্যে ও অন্যান্য কৌশলে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত নরনারীর বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ণয় করা হয়। বৃত্তি (scholarship) দানের জন্য ছাত্র শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনের কালেও অতিরিক্ত পরীক্ষা হিসাবে বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। আবার সিভিল সার্ভিসের (Civil Service) কোনও কোনও পরীক্ষায় ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া কর্ম্মী নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ব্যাপারে এগুলির প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে, এগুলির বৈচিত্র্যও অধিক হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষেও অভীক্ষা প্রশ্নগুলি অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাদের বহুল ব্যবহার এখনও এ দেশে সম্ভব হয় নাই, কিন্তু ক্রমশঃই আমরা ইহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি।

মানসিক অভীক্ষার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং সাধারণভাবে দু একটি মন্তব্য করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। প্রথমটি হইল অভীক্ষার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কিত। বিনের ব্যবস্থায় শিশুগণের উপরে একে একে অভীক্ষা প্রয়োগ হইত। শিশুদের অভীক্ষার পক্ষে এই একক পদ্ধতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এখনও স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইহাতে বহু সময় যায়। সেইজন্য শীঘ্র বহুসংখ্যক ব্যক্তির অভীক্ষা সম্পন্ন করিবার জন্য আজকাল সঙ্ঘাভীক্ষা (group test) ব্যবহৃত হয়। যে অভীক্ষা প্রশ্নগুলি উপরে দেওয়া হইয়াছে, এবং যেগুলি আমেরিকার সেনাবিভাগে ও ইংলণ্ডের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়, সে সবই এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, অভীক্ষার ফলাফল কিরূপে স্থির করা হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। এখানেও বিনের পন্থাই অনুসরণ করা হয়। বালকের আসল বয়স যাহাই হউক না কেন, তাহার অভীক্ষার ফল যদি ৫ বৎসর, ৮ বৎসর বা ১১ বৎসরের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহার মানসিক বয়সও যথাক্রমে ৫, ৮ বা ১১ বৎসর ধরা হইবে। তারপর অভীক্ষক শিশুর আসল বা জন্মগত বয়স দ্বারা তাহার মানসিক বয়সকে ভাগ করেন। উহাতে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাহাকে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient, সংক্ষেপে *I. Q.*) অথবা বুদ্ধির হার (Mental Ratio) অভিহিত করা হয়। যেমন যে ছেলের বয়স ১০ বৎসর, তাহার মানসিক বয়স দেখা গেল মাত্র ৭ বৎসর, এস্থলে তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে ০'৭ অথবা শতকরা ৭০। আবার যদি দেখা যায় ঐ বয়সের বালকেরই মানসিক বয়স ১৩, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক ধরা যাইবে ১'৩ বা শতকরা ১৩০। এ সম্পর্কে বার্ট (Burt) এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তদনুসারে, যে সমস্ত বালক অতি সাধারণ প্রাথমিকোত্তর অর্থাৎ প্রাথমিকের পরবর্ত্তী শিক্ষার উপযুক্ত মাত্র, তাহার চেয়ে বেশী নয়, তাহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের সীমা ৮৫ হইতে ১১৫। ইহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলে নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সাধারণ নৈপুণ্যের কার্য্য করিতে পারিবে, বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কোনও নিম্নস্তরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ হইতে ৮৫র মধ্যে, তাহারা অল্পবুদ্ধি। যে সমস্ত কর্ম্মে নৈপুণ্যের প্রয়োজন নাই, শুধু সেরূপ কার্য্য বা দৈহিক পরিশ্রমেরই ইহারা উপযুক্ত। তেমনই

উপরের দিকে ১১৫ হইতে ১৩০ যাহাদের সীমা, তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার পরেও উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ বৃত্তি বা ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন দ্বারা সুফল পাইবে। এবং তাহারা সাধারণ বৃত্তি, কেরাণীগিরি বা নৈপুণ্যের কার্য্যে যোগ্যতা দেখাইবে। তাহারও উপরের সীমা ১৩০ হইতে ১৫০, ইহারা বৃত্তিলাভ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, এবং উচ্চতর বৃত্তিসমূহে সাফল্য লাভ করে; এবং ১৫০ হইতেও যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশী, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সম্মান লাভ করে এবং উচ্চতম বৃত্তিগুলিতেও কৃতকার্য্য হয়। অপর দিকে যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ৫০ হইতে ৭০এর মধ্যে, তাহারা জড়বুদ্ধি। অল্পস্বল্প কায়িক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনও কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইবে না। আর ৫০এর নীচে যাহারা, তাহারা শিক্ষা বা কোনরূপ কর্ম্মের অযোগ্য, চিরদিন তাহাদের অন্যের যত্ন ও পরিচর্য্যার অধীন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসা খুবই সঙ্গত। অভীক্ষায় যে শক্তি বা গুণটির পরীক্ষা করা হয়, উহাকেই আমরা সাধারণতঃ বুদ্ধি বলি। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি? প্রথম যুগের মানসিক অভীক্ষকগণ বুদ্ধি নামক যে গুণটি আছে, তাহা ধরিয়া লইয়াছিলেন, সাধারণ মানুষের ধারণাও তাই। মানসিক অভীক্ষণের এতখানি সাফল্য দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধি বহুলাংশে সর্ব্বব্যাপক গুণ, অর্থাৎ সকল রকমের ক্রিয়াতেই ইহার প্রভাব রহিয়াছে। অনেক সময়ে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে ইহা পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের শক্তি বা সহজাত সর্ব্বমুখী মানসিক নৈপুণ্য। কিন্তু ঠিক কোন্ শক্তিগুলি ইহার মধ্যে পড়ে সে বিষয়ে মনোবিদ্গণ একমত হইতে পারিতেন না। এবং ইহার সন্তোষজনক কোন সংজ্ঞাও তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। কাহারও মতে ইহা ছিল উপরের ব্যাখ্যার মত এক ব্যাপক গুণ, সমস্ত বুদ্ধিগত ক্রিয়াতে সাফল্যের পরিমাণ ইহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত। অন্যেরা আবার এই একক নীতি সমর্থন করিতেন না। তাই কেহ বলিতেন মানুষের কয়েকটি পৃথক শক্তির সাহায্যে, আবার অন্য কেহ বলিতেন বহুসংখ্যক এইরূপ পৃথক শক্তি দ্বারা বুদ্ধিগত ক্রিয়াসমূহ সাধিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধ্যাপক স্পিয়ারম্যান

(Spearman) বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে তাঁহার যুগান্তকারী দ্বিশক্তিবাদ (theory of two factors) আবিষ্কার করেন।

স্পিয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। ইহা আদ্যোপান্ত গণিতের তথ্য দ্বারা সমর্থিত। তবে আমাদের ব্যাখ্যায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্কগুলিই শুধু রাখা হইবে, তাহাও যতদূর সম্ভব সরল আকারে দেওয়া যাইবে। তবু যাঁহাদের ইহাও নীরস মনে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য উক্ত মতবাদের এক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। তবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সমান হিসাবে ইহাকে কোনমতেই ধরা যাইবে না।

স্পিয়ারম্যান বলেন যে বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে মানুষের বুদ্ধি বা মনীষার যে প্রয়োগ হয় তাহাকে দুইটি অংশ বা শক্তিতে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে একটি হইল সাধারণ শক্তি, ইহা 'g' অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়। ক্রিয়াটি যেমনই হউক না কেন, ব্যক্তিবিশেষের বেলায় এই শক্তির পরিমাণ এক ; তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহার তারতম্য থাকে। সুতরাং যে সকল ক্রিয়াতে প্রধাণতঃ g শক্তিই কাজে লাগে, কোনও একজন ব্যক্তি সেই ক্রিয়াগুলি মোটামুটি সমান দক্ষতা সহকারে করিবে, কিন্তু অন্য সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহাদের নিজ নিজ g শক্তির পরিমাণ অনুসারে এই দক্ষতার প্রভেদ দেখা যাইবে। অন্যটী হইল বিশেষ শক্তি, ইহা 's' অক্ষরে সূচিত হয়। কোনও ব্যক্তির মধ্যেই সাধারণ g শক্তির এবং এই বিশেষ s শক্তির পরিমাণের কোনও সম্পর্ক নাই। এবং ইহার তারতম্য যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাইবে তাহাই নয় ; একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায়ও ইহার পরিমাণের প্রভেদ দেখা যাইবে। অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তির g শক্তি বেশী থাকিতে পারে কিন্তু বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের s শক্তি, কোনটি কম, কোনটি বেশী থাকিতে পারে। যে কোনও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে এই দুইটি শক্তির স্থান আছে। প্রথম g বা সাধারণ শক্তি আমরা বুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝি, প্রায় তাহারই মত। আর s হইল বিশেষ শক্তি, যেমন সঙ্গীত বা গণিতে দক্ষতা। সুতরাং কোনও ব্যক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ায় কি পরিমাণ সাফল্য অর্জ্জন করিবে, তাহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ,

ক্রিয়াটি সম্পাদনে কি পরিমাণ সাধারণ শক্তির প্রয়োজন, আবার কি পরিমাণ এবং কোন্ শ্রেণীর বিশেষ শক্তিরই বা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত ক্রিয়ায় সাধারণ শক্তির এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্তিটির পরিমাণ কতখানি। যেগুলিকে আমার বুদ্ধির ক্রিয়া বলি, উহাদের বেশীর ভাগেই সাধারণ শক্তির আপেক্ষিক অংশ বেশী। তবে সঙ্গীত ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিয়ায় আবার বিশেষ শক্তির প্রাধান্যই বেশী, সাধারণ শক্তির স্থান সেখানে নগণ্য। ইহার ব্যবহারিক তাৎপর্য্য এই, আর বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই যে খুব 'বুদ্ধিমান্' লোকেরও সঙ্গীতনৈপুণ্য আদৌ না থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির 'বুদ্ধি' কম বলিয়া আমরা জানি, তাহারও গীতবাদ্যে অসামান্য প্রতিভা থাকা অসম্ভব নহে। বিভিন্ন ক্রিয়ার বেলায় একই ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ শক্তির তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ শক্তির পরিমাণ এক। আবার অধিকাংশ মনীষাগত কার্য্যেই ইহার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণভাবে কোনও ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য বিচার করিতে গেলে ইহাকেই ধরিতে হয়। উপরে বর্ণিত অভীক্ষাগুলির দ্বারাও এই সাধারণ শক্তি বা *g* শক্তিরই পরীক্ষা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মানুষের যে কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বহুবিধ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের স্থান গুরুতর, উচ্চতর ক্রিয়াসমূহে ইহারই পূর্ণ আধিপত্য থাকে। কিন্তু কোনও কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়ায় আবার বিশেষ শক্তিরই প্রাধান্য থাকে। সাধারণ শক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। তাহা ছাড়া কোনও নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে তদনুযায়ী প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত (temperamental) বৈশিষ্ট্যেরও প্রয়োজন থাকিতে পারে।

অতএব অভীক্ষার একটি কার্য্য ইহাই হইয়া দাঁড়ায় যে, মানুষের মানসিক গঠনের একটিমাত্র দিকে লক্ষ্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, কোনও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে সাফল্য অর্জ্জনের উপযুক্ত গুণের সমন্বয় মানুষের আছে কি না, তাহাই স্থির করিতে হইবে। যে বিশেষ অভীক্ষার দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে আমাদের যোগ্যতার পরিমাণ পূর্ব্বাহ্নে নির্ণীত হয়, তাহার নাম বৃত্তীয় অভীক্ষা (Voctational Test)। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বালক যখন বৃত্তি

নির্ব্বাচনে উদ্যত হয়, তখন কোন্ বৃত্তিটি তাহার শক্তির সর্ব্বোপযোগী হইবে, উহা বলিয়া দেওয়া বৃত্তীয় অভীক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং বর্ত্তমান জগতে ইহায় প্রয়োজন ও গুরুত্ব কি বিরাট তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ইহার নানারূপ প্রয়োগ হইয়াছে। এ কথা ভালভাবেই বুঝা যায় যে বালকগণ কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার সময়ে যদি এই শ্রেণীর অভীক্ষার উপযুক্ত সাহায্য পায় তবে ব্যক্তিগত সুখ এবং ক্রিয়ানৈপুণ্য উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে সমগ্র অভীক্ষা ব্যবস্থায় এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে এক ধরণের ক্রিয়াতে (অর্থাৎ অভীক্ষায় প্রযুক্ত ক্রিয়ায়) মানুষের সামর্থ্যের মাত্রা দেখিয়া অপর ভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়াতেও তাহার যোগ্যতার পরিমাণ পূর্ব্বাহ্নে নির্ণয় করা যায়।* সৈন্যবিভাগের অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে আর অভীক্ষা প্রয়োগের আর সকল ক্ষেত্রেই এই কথাটি ধরিয়া লওয়া হয়। আবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কতকগুলি সাধারণ ও বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া রাজপুরুষ নিয়োগ করার যে প্রথা আছে, তাহাতেও ইহারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষের বিভিন্নরূপ দায়িত্বশীল কার্য্য করিবার জন্য যোগ্য যুবাপুরুষের প্রয়োজন। তখন তাঁহারা এমন যুবক-দেরই নির্ব্বাচন করেন যাহারা পরীক্ষাগৃহে হয়ত ইতিহাস, সাহিত্য বা প্রাচীন ভাষা বা গণিতের সমস্যা সমাধানে সাফল্যের পরিচয় দেয়। কর্ত্তৃপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইহারা এক বিষয়ে প্রভূত যোগ্যতা দেখাইয়াছে বলিয়া অন্য ক্ষেত্রেও অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও সমান কৃতকার্য্য হইবে।

---

* আর একটি নীতির সহিত এটির প্রায়ই ভুল হয়। উভয়ের পার্থক্য ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। সেটি হইল এই যে, এক ধরণের ক্রিয়া অভ্যাস করার ফলে মানুষ বিনা অভ্যাসেই অপর আর এক ক্রিয়া করিবার যোগ্যতা লাভ করে (যেমন জ্যামিতি অধ্যয়ন করিলে যুক্তির ক্ষমতা বাড়ে, তাহারই সাহায্যে আবার মানুষ আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হয়)। সর্ব্বাভিমুখী শিক্ষা (formal training) সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত বলা চলে (পরে ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বার্ণার্ড শ ইহা এক কথায় বলিয়াছেন, "মানুষ একটি জিনিষ করিয়া আর একটি জিনিষ শিখিতে পারে না।" পক্ষান্তরে উপরে বর্ণিত নীতিটি অবশ্য সত্য, তাহা এখনই দেখা যাইবে।

বাস্তবক্ষেত্রের ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা যে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভবিষ্যৎ যোগ্যতা নির্ণয়ের বিষয়ে এ নীতি মোটামুটি ভাবে সত্য, এটুকুই বলা চলে, ইহার অধিক কিছু বলা যায় না। কারণ মানসিক অভীক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা কোনও লোকের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা এক সম্ভাবনা (probability) মাত্র। উহাকে কখনও সুনিশ্চিত ধরা যায় না। এই পার্থক্যের একটি সহজ কারণ প্রথমেই বাদ দেওয়া যায়। অতি চতুর বালকও তাহার ভাবী সম্ভাবনার অনুরূপ না দাঁড়াইতে পারে। উহার কারণ হয় ত দেখা যায় যে সে অলস ও অসৎ, অথবা সৎ হইলেও এমন কোনও নৈতিক গুণের তাহার অভাব আছে, যাহার প্রয়োজন তাহার জীবনের নির্ব্বাচিত ধারাটির মধ্যে খুব বেশী। বার্ট একটি মেয়ের কথা বলিয়াছেন, সে বুত্তীয় অভীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও কর্ম্মশালায় গিয়া তাহার সাফল্যের অভাব দেখা গেল, তাহার একমাত্র কারণ যে সে অত্যধিক কথা বলিত। এরূপ ঘটনা অবশ্য দেখা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। কারণ এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় মানুষের ধীশক্তি, নৈতিক গুণ নহে। সুতরাং আমাদের প্রশ্নটি পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায় যে, এই ধীশক্তির পরিমাণ নির্ণয় মানসিক অভীক্ষার উদ্দেশ্য হইলেও মোটামুটি-ভাবে উহাতে বিস্ময়কর সাফল্য দেখা যায়, অথচ এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই বা বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় কেন?

ইহার কারণ আগেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে মানুষের শক্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাহ্নে করা যায়, তাহা সম্ভাবনার ভিত্তিতে গঠিত। উহার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে হইবে। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক অভীক্ষার স্থান কোথায়, সে কথা আর একটু-খানি চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সকল সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, প্রধানতঃ এই দুটি পৃথক শ্রেণীর বিদ্যালয় দেখা যায়। কিন্তু এই দ্বৈত বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রভাব অনেক স্থানেই দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এখন আর প্রত্যেকটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবেচিত হয় না। একই ব্যাপক

শিক্ষাধারার দুইটি ক্রমিক পর্য্যায় বলিয়া ইহাদের গণ্য করা হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শৈশবের মানসিক ও নৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান ও অভ্যাস গঠন, এবং মাধ্যমিক পর্য্যায়ের বা কৈশোরের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন। ইহা এগার হইতে বার বৎসর বয়সের মধ্যে সমাপ্ত হইবে। এই সময়ে শিশুদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্যের গুরুত্ব অধিক হইয়া উঠে, সুতরাং এই বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইবে। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে যথেষ্ট প্রভেদ রাখিতে হইবে। এই প্রভেদ জাতির বালকগণের শক্তি, প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে। সামাজিক বা অর্থনৈতিক পার্থক্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক অবশ্যই থাকিবে না।

এরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং কোনও না কোনও আকারে ইহার প্রবর্ত্তন যে এদেশে এবং সকল দেশেই অবশ্যম্ভাবী, তাহারও সূচনা পাওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অবশ্য শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণের সম্মুখে বহু সমস্যা আসিয়া পড়িবে। এ সমস্যাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন হইল একটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় হইলে, কিরূপ শিক্ষা তাহাদের প্রয়োজন ও শক্তির সর্ব্বোপযোগী, তাহা কি ভাবে স্থির করা যাইবে? এ প্রশ্ন সম্পর্কে মনোবিদ্যার সুনির্দ্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, আর অনেকের খুব ভাল না লাগিলেও এই বিধানই কার্য্যকরী করিতে হইবে। ব্যাপারটি দাঁড়ায় এইরূপ। শক্তির প্রভেদ অনুসারে অবশ্য এক এক বালকের জন্য এক এক শ্রেণীর বিদ্যালয় উপযুক্ত গণ্য হইবে। কিন্তু এই পার্থক্য অর্থাৎ প্রকৃতিগত পার্থক্যই শুধু বিবেচনা করা হইবে, তাহা মনে করা বড়ই ভুল, এবং এ ভুল প্রায়ই করা হয়। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমার মধ্যে একই বয়সের বালকবালিকার বুদ্ধিতে এত বিশাল পার্থক্য দেখা যায় যে সকলের পক্ষে এক নির্দ্দিষ্ট মানের শিক্ষা বাঞ্ছনীয়ও নহে, সম্ভবও নহে। এগার বৎসর বয়সে যখন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবার কথা, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ ছেলেমেয়েদের মানসিক বয়স

দেখা গিয়াছে আট বৎসর, আর সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রদের মানসিক বয়স চৌদ্দ বৎসর বা তাহারও বেশী। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির তাৎপর্য্য যে ব্যক্তি বুঝেন, তিনি কখনই এমন ধারণা করিতে পারিবেন না যে সকল ছাত্রকে শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়ার নামে সকলের উপর একরূপ পাঠ্য চাপাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ পাঠ্যসূচী হইলে অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের সামান্য শক্তি প্রতিপদেই হার মানিবে, আর তাহাদের সাধ্য অনুযায়ী যেটুকু কাজ করিয়া তাহরা আনন্দ পাইতে পারে এবং তাহাদের পাওয়াও উচিত, উহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। আবার মেধাবী ছাত্রগণ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী যে সমস্ত অধিক বুদ্ধির কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহারা সেগুলি পাইবে না। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা নির্ব্বাচনে শিক্ষার্থীর বিশেষ গুণ ও রুচির কথা অবশ্য ভাবিতে হইবে, কিন্তু তাহার বুদ্ধ্যঙ্কের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এজন্য মানসিক অভীক্ষণ-পদ্ধতির যতদূর সম্ভব উন্নতি হওয়া, আর যতখানি সম্ভব ব্যাপকভাবে লোকে ইহার তাৎপর্য্য ও মূল্য বুঝিতে পারে সেই ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ দরকার।

যে সকল পিতামাতা নিজেদের সন্তানের অক্ষমতা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে চান না, তাঁহারা হয়ত এ যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ ইহার ফলে অন্যের ছেলেমেয়েরা যে ধরণের পাঠে কৃতকার্য্য হইল, তাহা হইতে তাঁহাদের সন্তানকে বঞ্চিত করা হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে একমাত্র এই নীতি দ্বারাই সমস্ত শিশুকে এমনই এক মানসিক পরিবেশের মধ্যে আনা সম্ভব যাহার গুণে তাহাদের প্রকৃতিগত শক্তির স্ফুরণ এবং সম্যক্ পরিণতি সাধিত হয়। জাতির সাধারণ মঙ্গলের জন্য, প্রখর বুদ্ধির সন্ধান যেখানেই পাওয়া যায়, সেখান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সকল সুযোগ দরকার, অবাধে সে সবই দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা কম মেধাবী, তাহাদের শক্তিও সমান যত্নে বিকাশ করাই উচিত কার্য্য হইবে, কারণ তাহাদের বাদ দিয়া পৃথিবী চলিতে পারে না, বরং প্রধানতঃ সাধারণ মেধার মানুষ লইয়াই পৃথিবী গঠিত। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও (প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত) ব্যক্তি ও সমাজের দাবী মিলিয়া এক হইয়া যায় দেখা গেল।

যে মনোবিদ্‌গণ বুদ্ধি ও শক্তি অভীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতি সাধনে সর্ব্বাপেক্ষা তৎপর, তাঁহারাই বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দ্ধারণে যে সকল বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, অভীক্ষা তাহার একটি অংশমাত্র, অবশ্য অতি প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু আবার তাঁহারা একবাক্যে একথাও বলেন যে, শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের মতামতও যথাযথভাবে সমস্ত ফলাফল ও অন্যান্য বিবরণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে তাহা নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। কিরূপ ফলাফল সব চেয়ে প্রয়োজন, সেগুলি কিরূপে সংগ্রহ, নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ করিতে হইবে, এ সবই বিশেষ গবেষণা ও চিন্তার বিষয়।

দশম অধ্যায়

মানসিক মান

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে বিনে (Binet) যে নূতন তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার পরে এবিষয়ে বহু পরিমাণে শ্রমসাধ্য মূল্যবান্ গবেষণা হইয়াছে। গণিতের বিশ্লেষণের সাহায্যে এই গবেষণা চলিয়াছে। মনোবিদ্যা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গণিতের পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন গল্টন (Galton) ও কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson)। বর্ত্তমান আলোচনায় এ সম্পর্কে প্রধানতঃ অধ্যাপক স্পিয়ারম্যানের (Spearman) নাম উল্লেখ করিতে হয়। শিক্ষাবিধান সম্পর্কে এই সকল তথ্যের গুরুত্ব এত অধিক যে এগুলিকে বাদ দেওয়া চলিবে না। তবে এখানে ইহাদের অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্রই দেওয়া সম্ভব। সুতরাং এই নূতন নীতিসমূহের ভিত্তি-রূপে যে সব ধারণা লওয়া হইয়াছে, ও সেগুলির যে সমস্ত গুরুতর প্রয়োগ হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির এখন নিতান্ত প্রাথমিক আলোচনা করা যাইবে।

১। পৌনঃপুন্য বা বার (Frequency) ও স্বাভাবিক বণ্টন (Normal Distribution)

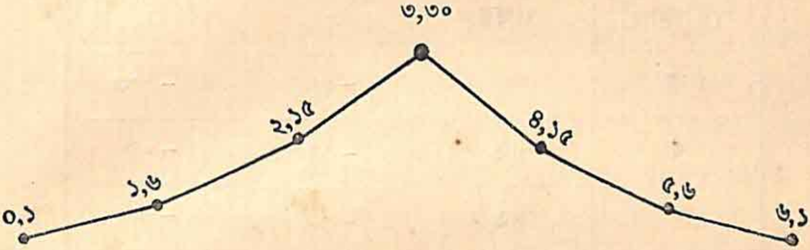
মনে করা যাক যে ডাকঘরের চিঠির বাক্সে আজ যে সমস্ত চিঠি ছাড়া হইয়াছে, সেগুলিকে লইয়া থাকবন্দী করিয়া রাখা হইল। এইরূপ পর পর কয়েকদিনের চিঠি প্রতিদিনের পৃথকভাবে সমান দূরত্বে সাজান গেল। এইভাবে সাজাইলে, থাকগুলির উচ্চতা দেখিয়া সবগুলির মধ্যে প্রত্যেক দিনের চিঠির পৌনঃপুন্য বা বার (frequency) কত তাহা বুঝা যায়। প্রতিদিনের চিঠিগুলি গণিয়া লইলে সে সংখ্যাগুলির সাহায্যে এই পৌনঃপুন্যের নক্সা (diagram) প্রস্তুত হইতে পারে। এই নক্সাতে প্রতিদিনকার চিঠির থাকগুলির মাপ অনুপাতে অঙ্কিত এক একটি উল্লম্ব বা খাড়া (vertical) সরলরেখা দ্বারা দেখান হইবে। রেখাগুলি একটি অনুভূমিক বা শোয়ান

(horizontal) সরলরেখা বা ভূমির (base) উপরে পর পর সমান দূরত্বে অঙ্কিত হইবে। তুলনার পক্ষে চিঠির থাকগুলির চেয়ে এই নক্সাটিরই সুবিধা বেশী। তারপর হাঁসপাতালে তাপের নক্সার ন্যায় এই খাড়া রেখাগুলির শীর্ষসমূহকে সংযুক্ত করিয়া একটি রেখা টানিতে পারা যায়। এই রেখাটি একবার উঠিবে, একবার নামিবে, তাহার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু ধরা যাক, রেখাটি এক নির্দ্দিষ্ট আকারের বক্ররেখাই হইয়া দাঁড়াইল। সেরূপ হইলে ইহাই হইবে চিঠি গুলির বণ্টনের, অর্থাৎ প্রতিদিনের চিঠির সংখ্যা বা পরিমাণের বারলেখ (frequency-curve of distribution)।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহু ব্যাপারেই দেখা যায় যে উহাদের বারলেখ এক নির্দ্দিষ্ট ধরণের। অর্থাৎ এগুলির উঠানামা বা বৃদ্ধিহ্রাস এক নিয়মিত পদ্ধতিতে চলে। যেমন বিভিন্ন বয়সের যে সমস্ত ব্যক্তি ডিপথিরিয়া (diphtheria) রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদের সংখ্যা লইয়া বারলেখ রচনা করিলে সর্ব্বদা দেখা যাইবে যে হয়ত ৫ বৎসর বয়স অবধি রেখাটি উর্দ্ধে উঠিবে (অর্থাৎ ঐ পর্য্যন্ত যত বেশী বয়স ধরা যাইবে রোগীর সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইবে), কিন্তু তার পরে অধিক বয়সের সঙ্গে রেখাটি নীচে নামিতেছে। আবার যে সমস্ত ব্যক্তিকে আয়কর (income-tax) দিতে হয়, তাঁহাদের সংখ্যা লইলে অন্য এক আকারের রেখা পাওয়া যাইবে। ন্যূনতম যে আয়ে আয়কর দেওয়ার বিধান আছে, যত সে আয়ের কাছে আসা যাইবে, করদাতার সংখ্যাও বেশী হইবে (কারণ সমাজে কম আয়ের লোকের সংখ্যাই অধিক), সুতরাং রেখাটি সেখানে উচ্চ হইবে। তারপর যত বেশী আয় ধরা যাইবে, রেখাটিও দ্রুত নামিতে থাকিবে, ইহার কারণ অবশ্য এই যে আয় যত বেশী ধরা যাইবে সেই আয়ের লোকের সংখ্যাও তত কম হইবে।

খেলায় যদি ছয়টি কড়ি চালা যায় ত দেখা যাইবে যে একটি কড়িও চিৎ না হইতে পারে, আবার ছয়টিই চিৎ হইতে পারে। মনে করা যাক, বিরাম না দিয়া বহুবার ক্রমাগত কড়ি ছয়টি চালা গেল। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শূন্য চিৎ, এক চিৎ হইতে ছয় চিৎ পর্য্যন্তের সংখ্যা যাহা হইবে, তাহার অনুপাত হইতেছে ১, ৬, ১৫, ৩০, ১৫, ৬, ১।

এই সংখ্যাগুলি লইয়া লেখ (graph) অঙ্কিত করিলে এক ধনুকাকৃতির বক্ররেখা (১ নং চিত্র) পাওয়া যাইবে। রেখাটির মধ্যবর্তী উল্লম্ব সরলরেখা



১নং চিত্র

বা কোটীর (ordinate) উভয় দিকে প্রতিসাম্য (symmetry) দৃষ্ট হইবে। ইহা দেখা গিয়াছে যে কড়ি চালার সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে কড়ির সংখ্যাও যদি ক্রমাগতই বাড়ান যায়, সে সংখ্যাগুলি হইতেও এক নির্দ্দিষ্ট আকারের বক্ররেখাই পাওয়া যাইবে। সে রেখার নাম স্বাভাবিক লেখ (normal curve)। যখনই পরীক্ষার মধ্যে এরূপ অসংখ্য ফলাফল ধরা যায় এবং প্রত্যেকটি ফলের (চিৎ কড়ির সংখ্যার ন্যায়) সম্ভাবনা সমান থাকে, তখন এই শ্রেণীর লেখের আবির্ভাব হয়। সেইজন্য দৈহিক আকারের বেলায়, যেমন এক জাতির বহুসংখ্যক লোকের দৈর্ঘ্যের হিসাব লইলেও, তাহার ফল এইরূপ হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে সমপর্য্যায়ভুক্ত অনেকগুলি ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত ক্ষমতা, বুদ্ধ্যঙ্ক এবং বেশীর ভাগ মানসিক বৈশিষ্ট্যের বেলায় এইরূপ ফল পাওয়া যায় ; আর বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং হিসাবের দিক দিয়া এই স্বাভাবিক লেখটির মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার বহু সমস্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

২। প্রমাণ ব্যত্যয় (Standard Deviation) ও প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক (Standard Scores)

নীচে একটি সংখ্যাতালিকা (২নং চিত্র) দেওয়া গেল। কল্পনা করা যাক্ যে ইহার দ্বিতীয় সারিতে যে সংখ্যাগুলি আছে, সেগুলি বীজগণিতে

দশজন পরীক্ষার্থীর নম্বর। পরীক্ষার্থীদের নাম ক, খ, ইত্যাদি, কম হইতে বেশী নম্বর অনুযায়ী সাজান হইয়াছে।

পরীক্ষার্থী	নম্বর	x	x
ক	৩৮	−২০	−১·৩
খ	৪৬	−১২	−০·৮
গ	৪৬	−১২	−০·৮
ঘ	৫০	−৮	−০·৫
ঙ	৫৩	−৫	−০·৩
চ	৫৫	−৩	−০·২
ছ	৫৮	০	০
জ	৬৪	+৬	+০·৪
ঝ	৭৮	+২০	+০·৩
ঞ	৯২	+৩৪	+২·২
	গড় ৫৮%	(σ = ১৫·৪২)	[$\Sigma x^২$ = ১০]

২ নং চিত্র

বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর নম্বরগুলি দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়িবে যে সকলের গড়, অর্থাৎ ৫৮% নম্বর ছ পাইয়াছে ; জ, ঝ এবং ঞ এই গড়ের চেয়ে বেশী নম্বর পাইয়াছে, অন্যেরা কম পাইয়াছে। এখন দেখা যাক গড় হইতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নম্বরের পার্থক্য কতখানি। সে কথা তৃতীয় সারিতে বলা হইয়াছে। প্রত্যেকের পার্থক্যের সংখ্যাটি প্রয়োজনমত যোগচিহ্ন বা বিয়োগচিহ্ন দিয়া বসান হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় নম্বরগুলির ব্যত্যয় (deviation) x অক্ষরটি দ্বারা ইহা সূচিত হয়।

এখানে এই কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর স্থান অন্যদের তুলনায় কোথায়, তবু ইহার একটি ত্রুটিও আমাদের নজরে পড়ে। তাহা এই যে, ঐ ব্যত্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে, পরীক্ষক নম্বর দিবার সময়ে যে মান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারই উপর। তাঁহার নম্বর দিবার মান যদি আরও প্রসারিত হইত, তাহা হইলে ব্যত্যয়ের পরিমাণও উভয় দিকেই (অর্থাৎ গড় হইতে কম ও বেশী দুই দিকে) বেশী হইত; আবার তাঁহার নম্বর দেওয়ার মান সঙ্কুচিত করিলে ব্যত্যয়গুলিও অল্প হইত। সুতরাং এই ভেদ্যতা (variability) অর্থাৎ আপেক্ষিক পার্থক্যের সম্ভাবনা যাহাতে না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহা কিরূপে করা যায়, শেষের সারির সংখ্যাগুলি দ্বারা তাহাই দেখান হইল। ইহার ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া যাইতেছে। মনে করা যাক, দুইজন পরীক্ষক পৃথকভাবে উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার্থীদের উত্তরগুলির প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য কি (অর্থাৎ কোন্ পরীক্ষার্থীর উত্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরই সব চেয়ে ভাল উত্তর কাহার এবং এই ভাবে পর পর প্রত্যেকের স্থান কিরূপ দাঁড়াইবে), সে বিষয়ে তাঁহারা একমত। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে নম্বর তাঁহারা উভয়ে দিলেন তাহার দুইটি পৃথক মান রহিল। তাঁহাদের দুজনের মানের এই পার্থক্য সূচিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে (উপরের পদ্ধতিতে) তাঁহাদের ব্যত্যয়ের গড় নির্ণয় করা। ধরা যাক যে-প্রথম পরীক্ষকের ব্যত্যয়ের গড় হইল ১৬, দ্বিতীয়ের ১৩ নম্বরের সমতুল্য (অর্থাৎ প্রথম পরীক্ষক যে উত্তর দেখিয়া ১৬ নম্বর দিবেন, দ্বিতীয় সে স্থলে মাত্র ১৩ দিবেন)। সুতরাং উভয়ের দেওয়া নম্বরের ব্যত্যয়াঙ্ক যথাক্রমে ১৬ ও ১৩ দিয়া ভাগ করিলে উভয় ক্ষেত্রে ফল একই দাঁড়াইবে।

কিন্তু এখানে গণিতের এক গুরুতর সমস্যা উঠে। আমরা দেখিয়াছি যে একদিকে যোগচিহ্নবিশিষ্ট ব্যত্যয়াঙ্কগুলি এবং অপর দিকে বিয়োগচিহ্নবিশিষ্ট-গুলির যোগফল সমান, সুতরাং উভয় দিকের সংখ্যাগুলি যোগ করিলে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া যোগফল সর্ব্বদা শূন্য দাঁড়াইবে। যেমন উত্তরের তালিকায় যোগচিহ্নবিশিষ্ট ব্যত্যয়াঙ্কের যোগফল + ৬০, বিয়োগচিহ্নসম্বলিত ব্যত্যয়াঙ্ক-

গুলির যোগফল – ৬০, উভয়ে মিলিয়া শূন্য হয়। এক্ষেত্রে এক উপায় হইতে পারিত যে যোগচিহ্ন বা বিয়োগচিহ্নের কথা গ্রাহ্য না করা। কিন্তু গণিতজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহা মহাপাপ। সুতরাং এ সমস্যা মিটাইবার জন্য গণিতবিৎ করিলেন কি, ব্যত্যয়াঙ্কগুলিকে যোগ না করিয়া প্রথমে উহাদের বর্গ নির্ণয় করিয়া সেই সংখ্যাগুলিকে যোগ করিলেন। এই সহজ কৌশলে সব সংখ্যাগুলিই যোগচিহ্নবিশিষ্ট হইল। উপরের তালিকায় ব্যত্যয়াঙ্কগুলির বর্গের যোগফল দাঁড়ায় ২৩৭৮। সবশুদ্ধ ১০টি সংখ্যা, সুতরাং ইহাদের গড় হইল ২৩৭.৮, ইহাকে বলা হয় ভেদাঙ্ক (variance)। এখন এই সংখ্যার বর্গমূল লইলে পাওয়া যায় ১৫.৩২; ইহাতে বলিতে গেলে পূর্ব্বের আকার ফিরিয়া আসিল। এই যে, ১৫.৪২ রাশিটি পাওয়া গেল, এই ভাবে ব্যত্যয়াঙ্কের গড় নির্ণয়ই পরিসংখ্যানবিদেরা অধিক পছন্দ করেন; ইহার নাম প্রমাণ ব্যত্যয় (Standard Deviation)। ইহা S. D বা গ্রীক σ (sigma) অক্ষরদ্বারা সুচিত হইয়া থাকে। পরিশেষে এখন তৃতীয় সারির প্রত্যেকটি ব্যত্যয়াঙ্ক x কে এই সংখ্যা দিয়া ভাগ করা গিয়াছে, ফলে চতুর্থ সারির সংখ্যাগুলি পাওয়া গেল। এগুলিকে বলা হয় প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক (standard scores) ও ইহার জন্য z অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়।

মূল ব্যত্যয়াঙ্কগুলির ন্যায় এই প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের যোগচিহ্ন ও বিয়োগচিহ্ন-বিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যেও শূন্যসংখ্যা আছে। আর উভয় দিকের সংখ্যাগুলি যোগ করিলেও (কাটাকাটি করিয়া) শূন্যই পাওয়া যাইবে। যেমন উপরের উদাহরণে উভয় দিকের যোগফল হইল যথাক্রমে ৩.৯, সুতরাং যোগফল শূন্য। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহাদের বর্গসমূহ যোগ করিলে সব ক্ষেত্রেই যতজনকে পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেই সংখ্যাটিই (যেমন এখানে ১০) পাওয়া যাইবে! গণিতে ইহার প্রমাণ সহজেই দেওয়া যায়।

প্রমাণ সাফল্যাঙ্কগুলি মূল ব্যত্যয়াঙ্ককে প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গগুলিও হইবে মূল ব্যত্যয়াঙ্কের প্রত্যেকটির বর্গ ও প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের ভাগফল। এখন এই প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গ বা ভেদাঙ্ক (variance) একই বস্তু; ইহা মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টিকে পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া (উপরের

উদাহরণে ২৩৭৮ ÷ ১০ = ২৩৭·৮) পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বর্গসমষ্টি (বা মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টির ভাগফল) দাঁড়াইবে, একদিকে মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ও অপর দিকে মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টিকে ব্যক্তির সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যাহা উত্তর হইবে, সেই দুই রাশির ভাগফলের সমান। এই শেষের ভাগফলটি হইবে ব্যক্তির সংখ্যা।

অর্থাৎ হিসাবটি এইরূপ হইবে—

প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক = মূল ব্যত্যয়াঙ্ক ÷ প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক ;

সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বর্গসমষ্টি

= মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ÷ প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ;

কিন্তু আমরা জানি যে

প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি = মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ÷ ব্যক্তির সংখ্যা ;

সুতরাং প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের বর্গসমষ্টি

= মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ÷ (মূল ব্যত্যয়াঙ্কের বর্গসমষ্টি ÷ ব্যক্তির সংখ্যা) = ব্যক্তির সংখ্যা।

আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সাফল্যাঙ্কের বর্গসমষ্টি হইল ব্যক্তির সংখ্যা, অতএব এই বর্গসমষ্টির ভেদাঙ্ক (সংজ্ঞা অনুসারে) সর্ব্বদা হইবে ১। আবার প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক হইল ভেদাঙ্কের বর্গমূল, সুতরাং সকল প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের ব্যত্যয়াঙ্কও হইবে ১।

যে সকল ভেদ্য (variable) বস্তুর স্বাভাবিক বণ্টন (normal distribution) দৃষ্ট হয়, উহাদের প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক নির্ণয় করিলে উহা হইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতে পারে। যেমন মনে করা যাক যে, বহুসংখ্যক শিশুর বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ দেখাইয়া এক স্বাভাবিক লেখ অঙ্কিত হইল। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে গড় সংখ্যার একদিকের সংখ্যাগুলি যোগচিহ্নবিশিষ্ট, অন্য অর্দ্ধেক সংখ্যাসমূহ বিয়োগচিহ্ন সমন্বিত। কিন্তু যে গণিতজ্ঞ এইরূপ লেখের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত আছেন, তিনি উহা হইতে আরও অনেক কিছু বলিতে পারিবেন। প্রচলিত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া ব্যত্যয়াঙ্কগুলি ও গড় সংখ্যার পার্থক্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে

এখন কয়েকটি ব্যাপার দেখা যাইবে। যেমন, যে ব্যত্যয়াঙ্কগুলির গড় হইতে পার্থক্য প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের একগুণের কম, তাহাদের সংখ্যা মোট ব্যত্যয়াঙ্কের শতকরা ৩৪·১৩ অংশ ; যেগুলির পার্থক্য একগুণের বেশী, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ১৫·৮৭ (অর্থাৎ ৫০ – ৩৪·১৩)। আবার যেগুলির পার্থক্য প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের দ্বিগুণের নীচে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪৭·৭, যেগুলি দ্বিগুণের বেশী, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২·৩ (৫০ – ৪৭·৭)। যেগুলির পার্থক্য তিন গুণের কম, তাহারা শতকরা ৪৯·৮৬, তেমনই তিন গুণের বেশী হইবে শতকরা ০·১৪ (৫০ – ৪৯·৮৬)। গড় সংখ্যার উপরে বা নীচে অর্থাৎ কম বা বেশী উভয় দিকেই এইরূপ ফল হইবে। শেষের রাশি দুইটি হইতে বুঝা যাইবে যে সমস্ত শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক গড় ব্যত্যয়াঙ্কের চেয়ে প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের তিন গুণেরও বেশী, তাহাদের যোগ্যতা অসাধারণ, কারণ ১০,০০০ শিশুর মধ্যে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১৪। তেমনই দেখা যাইতেছে যে ১০,০০০ ছেলেমেয়ের মধ্যে ১৫৮৭ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক গড় অপেক্ষা প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের একগুণ বেশী বা কম ; যাহাদের পার্থক্যের পরিমাণ দ্বিগুণ, তাহাদের সংখ্যা ২·৩। যে সমস্ত শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আসে, তাহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় এইভাবে লইয়া বার্ট (Burt) ব্যাপক পরীক্ষা চালাইয়াছেন। তাহাদের মাতাপিতার সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া পরীক্ষা চালাইয়া তিনি কতকগুলি মূল্যবান তথ্য পাইয়াছেন। যেমন তিনি দেখিয়াছেন শ্রমজীবীদের সন্তানদের এক হাজারের মধ্যে ছয়টির উচ্চতর বৃত্তি লাভ করিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবার যোগ্যতা আছে, সে সুযোগ তাহারা কমই পায়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার শেষে শিশু কি ধরণের শিক্ষা পাইবে, উহা তাহার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া যদি তাহার নিজস্ব যোগ্যতা ও ভাবী সম্ভাবনার দিক দিয়া বিচার করিতে হয়, তবে এই শ্রেণীর অনুসন্ধান ও তথ্যাদির উপরই অধিক জোর দিতে হইবে।

৩। অনুবন্ধ (Correlation)

সর্ব্বশেষে এই বিষয়টির আলোচনার জন্য আগেকার সেই ১০ জন পরীক্ষার্থীর উদাহরণে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মনে করা যাক, তাহাদের

এবারে জ্যামিতির পরীক্ষা হইয়াছে। ইহাতে সেই ১০ জন পরীক্ষার্থীর নম্বর হইল যথাক্রমে শতকরা ৩৬, ৩০, ৪৩, ৫০, ৫৮, ৪৮, ৪৬, ৪৫, ৫৩ এবং ৭১। এগুলির গড় ৪৮। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে ইহাদের ব্যত্যয়াঙ্ক নির্ণয় করিয়া উহাদের ভেদাঙ্ক (variance) পাওয়া গেল ১১৬·৪ ; উহার বর্গমূল বাহির করিয়া প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্ক দাঁড়ায় ১০·৭৯। পরিশেষে প্রত্যেকটি ব্যত্যয়াঙ্ককে এই প্রমাণ ব্যত্যয়াঙ্কের সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করিয়া জ্যামিতির প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক পাওয়া গেল। এগুলি নীচের তালিকায় তৃতীয় সারিতে দেখান গিয়াছে, দ্বিতীয় সারিতে বীজগণিতের প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

পরীক্ষার্থী	বীজগণিত	জ্যামিতি
ক	−১·৩	−১·১
খ	−০·৮	−১·৭
গ	−০·৮	−০·৫
ঘ	−০·৫	+০·২
ঙ	−০·৩	+০·৯
চ	০·২	০
ছ	০	−০·২
জ	+০·৪	−০·৩
ঝ	+১·৩	+০·৫
ঞ	+২·২	+২·১
	σ = ১৫·৪২	σ = ১০·৭৯

৩নং চিত্র

দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষার্থীদের উভয় বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্যগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদের মধ্যে কিছু মিলও চোখে পড়িবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে উভয়ের মধ্যে অনুবন্ধ কি, তাহা হইলে এমন একটি সংখ্যা বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা এই সাদৃশ্যের পরিমাণ সূচিত হয়। এখন যদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় বিষয়ের সাফল্য (বা নম্বর) একরূপ হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির রাশিগুলির মধ্যেও সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইত। সুতরাং সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির প্রত্যেকটি রাশিকে ঠিক নীচের রাশি দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যাইত, তাহা ঐ রাশির বর্গের সমান হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ঐ রাশির বর্গগুলির যোগফল সর্ব্বদাই পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সমান হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে উভয়ের সাদৃশ্য যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় বিষয়ে প্রমাণ সাফল্যাঙ্কদ্বয় পরস্পর গুণ করিলে তাহাদের যোগফল সকল ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সমান হইবে। এই উদাহরণে যেমন উহা ১০। আসলে কিন্তু এই যোগফল সাধারণতঃ ব্যক্তির সংখ্যার চেয়ে কম হয়, বিশেষজ্ঞেরা গণিতের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। উপরের উদাহরণেও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইবে যে এই যোগফল ৭·৯৭। সুতরাং তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে পারা যায় যে পরীক্ষার্থীগণের বীজগণিত ও জ্যামিতিতে পাওয়া নম্বরের অনুবন্ধ হইল ৭·৯৭ ÷ ৯৮ বা প্রায় ০·৮। অর্থাৎ বলা যায় যে পরীক্ষার্থীদের এই দুই বিষয়ের নম্বর বা সাফল্যের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে ০·৮, অথবা সহজ কথায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ। তেমনই যদি যোগফলটি দাঁড়াইত −৭·৯৭, তাহা হইলে বলিতে হইত যে দুই বিষয়ে সাফল্যের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ বৈষম্য আছে। এক্ষেত্রে অনুবন্ধের পরিমাণ হইত −৭·৯৭ ÷ ১০ বা প্রায় −০·৮। যদি এমন হইত যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে গড় অপেক্ষা যত নম্বর বেশী পাইয়াছে, অন্য বিষয়ে গড়ের চেয়ে ঠিক তত নম্বরই কম পাইয়াছে, তাহা হইলে উহাকে পূর্ণ বৈষম্য ধরা চলিত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সংখ্যার গুণফল পূর্ব্বের ন্যায় যোগ করিলে পাওয়া যাইত −১০ অতএব অনুবন্ধ হইত −১। যদি উক্ত যোগফল

হইত শূন্য, অনুবন্ধও শূন্য হইত, তাহার অর্থ এই যে উভয় নম্বরের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈষম্য, কোনরূপই সম্পর্ক নাই। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে দুই সারি প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের অনুবন্ধ বাহির করিতে গেলে প্রত্যেক স্তম্ভস্থিত রাশিদ্বয় (অর্থাৎ সাফল্যাঙ্কদ্বয়) পরস্পর গুণ করিয়া সমস্ত গুণফলগুলি যোগ করিতে হইবে, পরে সেই যোগফলকে পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

উপরে যে পরীক্ষার উদাহরণটি দেওয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য কাল্পনিক। ইহা যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতেও হইত তবু এই কথা সহজেই বুঝা যাইত যে এত ছোট পরীক্ষার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গঠিত হইতে পারে না। নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত পাইতে হইলে মনোবিদ্‌কে বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া পরীক্ষা চালাইতে হইবে। এই ব্যক্তিদের এমন ভাবেই বাছিয়া লইতে হইবে, যাহাতে উহাদের সকল শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরই যথাযথ নমুনা (fair sample) থাকে। তাহা ছাড়া তাহাদের পর পর কয়েকবার উভয় বিষয়ে (অর্থাৎ বীজগণিত ও জ্যামিতিতে) পরীক্ষা করা বিধেয়। তাহা সত্ত্বেও যে অনুবন্ধ পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা শুধু সম্ভাব্যতার (probability) মাত্রা সূচিত হইতে পারে, নিশ্চয়তা নহে। মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে এই পরীক্ষায় অনুবন্ধ যত ১ এর কাছাকাছি হইবে, ততই দেখা যাইবে যে এক বিষয়ে যে পরীক্ষার্থীর ফল ভাল, মাঝামাঝি বা খারাপ হইয়াছে, অন্য বিষয়টিতেও তাহার ফল যথাক্রমে ভাল, মাঝামাঝি বা খারাপই হইবে। বস্তুতঃ, অনুবন্ধ দ্বারা এই যে সম্ভাব্যতার মাত্রা সূচিত হয়, তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগামী। এই নিয়ম উদ্ভাবন করেন গলটন (Galton), উহার নাম প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম (Law of Regression)। মনে করা যাক যে, বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে যাহারা বীজগণিতে সমান নম্বর পাইয়াছে তাহাদের বাছিয়া লওয়া গেল। জ্যামিতি পরীক্ষায় এই পরীক্ষার্থীরা আগেকার বীজগণিতের সমান নম্বর পাইবে না বটে, কিন্তু দেখা যাইবে যে উহাদের জ্যামিতির নম্বর এক নির্দ্দিষ্ট গড় সংখ্যার উভয় দিকে কেন্দ্রীভূত, এই গড় নম্বর দ্বারা সম্ভাব্য সাফল্য (probable score) সূচিত হয়। গল্‌টনের প্রত্যাবৃত্তির নিয়মে বলা হইয়াছে যে এরূপ ক্ষেত্রে, জ্যামিতির সম্ভাব্য গড় নম্বর = বীজগণিতের নম্বর × অনুবন্ধ।

বাস্তবক্ষেত্রে অনুবন্ধ সর্ব্বদা ১এর চেয়ে কম হয়। সুতরাং এক বিষয়ের সাফল্য হইতে অপর বিষয়ের সাফল্য নির্ণয় করার বেলায়ও প্রথমের সাফল্য অপেক্ষা দ্বিতীয়ের সাফল্যও অল্প হয়। যেমন এই উদাহরণে বীজগণিতের সাফল্যের চেয়ে জ্যামিতির সম্ভাব্য সাফল্য কম হইবে। এই বিষয়ে গল্‌টন নিজে অতি সুন্দর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যে সমস্ত লোক দীর্ঘাকার, যেমন ৬ ফুট লম্বা, তাহাদের পুত্রগণের বেলায় দেখা যায় যে তাহারাও লম্বা বটে, কিন্তু তাহাদের দৈর্ঘ্যের গড় সর্ব্বক্ষেত্রেই ৬ ফুটের কম। আবার তেমনই কোন এক নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের খর্ব্বকায় বামনের বেলায় দেখা যায় যে তাহাদের পুত্রেরাও খর্ব্বাকার কিন্তু পুত্রদের দৈর্ঘ্যের গড় পিতাদের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অধিক। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গড়টির কাছেই সংখ্যাগুলি যেন আসিতেছে ; ইহাই প্রত্যাবৃত্তি।

বহু সংখ্যক পৃথক পরীক্ষার পরস্পর অনুবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া বহু গুরুতর সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে,তাহা পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা ছাড়াও সম্ভাব্যতার পরিমাণ সূচিত করার বিষয়েও অনুবন্ধসংখ্যার যে কার্য্যকরিতা রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই সূত্রে বিশেষ একটি গবেষণার উল্লেখ করা যাইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে গেলে সেখানে শিশুর সাফল্যের সম্ভাব্যতার পরিমাণ নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন অভীক্ষা বা অভীক্ষাসমষ্টি সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য, তাহাই নির্ণয় করা ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এইজন্য বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সাফল্যাঙ্ক লওয়া হইল। পরে ঐ শিক্ষার্থীদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি পৃথক অভীক্ষা ও অভীক্ষাসমষ্টিতে সাফল্যের অঙ্কগুলি লইয়া প্রথমগুলির সহিত এগুলির অনুবন্ধ নির্ণীত হইল। এই পরীক্ষার ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে, আর অভীক্ষাগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে উদ্যোক্তাগণ যথাযথ ধারণা পাইয়াছেন।

বৃত্তিমূলক নির্ব্বাচন এবং নির্দ্দেশের (Vocational Selection and Guidance) ক্ষেত্রেও ইহার স্থান আছে। বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক কর্ম্মীর নৈপুণ্য পরীক্ষা বা অভীক্ষা করিয়া উহার সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা যাইতে পারে ; পরে তাহাদের পূর্ব্বপ্রযুক্ত অভীক্ষাসমূহের সাফল্যাঙ্কের সহিত উহার অনুবন্ধ নির্ণয় করা যায়। কোন্ অভীক্ষাসমূহ প্রয়োগ করিলে কোনও এক বিশেষ বৃত্তিতে

পরীক্ষার্থীর সাফল্য বা অসাফল্যের সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে সূচিত হইবে, তাহা এইভাবে স্থির করা যায়। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সৈন্যদলে বা সিভিল সার্ভিসে নিয়োগপ্রার্থীদের উপর যে সমস্ত অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, উহাদের কার্য্যকরিতা এইভাবে সযত্নে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।

অনুবন্ধের প্রয়োগ দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এখন দেখা যাক। এ বিষয়ে প্রথমে স্পিয়ারম্যানই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী; পরে আরও বহুসংখ্যক কর্ম্মী এ কার্য্যে আকৃষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট মনীষীও কেহ কেহ আছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ স্পিয়ারম্যানের গুরুতর মতবাদকে সমর্থন করিয়াছেন, কেহ তাহার সমালোচনা করিয়াছেন, কেহ বা উহার বিস্তারসাধন করিয়াছেন।

মনে করা যাক যে একটু আগে বীজগণিত ও জ্যামিতির যে সাফল্যাঙ্কের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, উহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গিয়াছে। আরও ধরা যাক যে সমুদয় ফলগুলি হইতে দেখা গিয়াছে যে বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে অনুবন্ধ ০·৭২। এই রাশিটির যে সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ মূল্য আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এখন দেখা যাক যে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া হিসাবে বীজগণিত ও জ্যামিতির কি স্থান এই রাশিটির দ্বারা সূচিত হইতেছে। প্রথমেই বুঝা যায় যে এই দুই বিষয়ের অন্তর্গত মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে অনেকখানি মিল আছে, নহিলে অনুবন্ধের পরিমাণ ০·৭২ উঠিত না। কারণ আমরা তজানি যে অনুবন্ধ ০·৭২ হওয়ার অর্থই এই যে পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে যে নম্বর পাইয়াছে অন্য বিষয়টিতে তাহার ০·৭২ অংশ নম্বর পাইবার সম্ভাবনা আছে। আবার এ কথাও ঠিক যে উভয় বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য যে মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পূর্ণ একরূপ নহে, কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী বীজগণিতে যে নম্বর পাইত, জ্যামিতিতেও তাহাই পাইত, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে অনুবন্ধ হইত +১। অতএব ফলে এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে যে উভয়রূপ মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ শক্তি (common factor) আছে, সেজন্য উভয়ের মধ্যে অনুবন্ধ বর্ত্তমান। আবার উভয়ের মধ্যে দুইটি পৃথক বিশেষ শক্তিও (specific factors) আছে, একটি বীজগণিতের অন্যটি

জ্যামিতির, তাহারই ফলে এই অনুবন্ধ পুরাপুরি ১ না হইয়া তাহার চেয়ে কম হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত স্পিয়ারম্যান করিয়াছেন, নামগুলিও তাঁহারই প্রদত্ত।

এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হইবে যে এই সাধারণ শক্তি এমন একটি মানসিক গুণ বা ক্ষমতা, যেটির প্রয়োজন বীজগণিত বা জ্যামিতি, উভয়ের বেলায়ই হয়। যে পরীক্ষার্থীর এই শক্তি বেশী আছে, সে উভয় বিষয়ের পরীক্ষাতেই অধিক নম্বর পাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় এক পরীক্ষার্থীরও যদি এই সাধারণ শক্তি সমমাত্রায় থাকে, তাহা হইলে যে উভয়ের এই দুটি বিষয়ের সাফল্যের পরিমাণও এক হইবে তাহা নহে। তাহার কারণ, দুজনের সাধারণ শক্তির পরিমাণ এক হইলেও বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে যে পৃথক ধরণের বিশেষ শক্তিগুলি আবশ্যক, তাহাতে উভয়ের তারতম্য থাকিতে পারে। যেমন, উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর অবস্থিতি কল্পনায় আনিবার শক্তি একজনের অধিক, ইহার সাহায্যে সে সহজে জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করিতে পারে, অন্য ব্যক্তির ইহা কম। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেই এইরূপ সব বিশেষ শক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে। কিন্তু কল্পনা করা যাক যে এমন কোনও বিষয় আছে, যেটি আয়ত্ত করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে যে সাধারণ শক্তিটি দেখা গেল, কেবল তাহারই উপর বীজগণিত ও জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত সাফল্য নির্ভর করিবে। ইহাকে 'আদর্শ' বিষয় বলা যাক। এখন যদি সমস্ত পরীক্ষার্থীকে এই আদর্শ বিষয়ে পরীক্ষা করা যায়, তাহাদের সকলের সাফল্যাঙ্ক সমান হইবে না, কারণ যে মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ সাধারণ শক্তির কথা ধরিয়া লওয়া গেল, তাহা কাহারও কম কাহারও বেশী। কিন্তু যাহাদের এ শক্তি সমান আছে, তাহাদের সাফল্যাঙ্ক ও সমান হইবে।

মনে করা যাক যে পরীক্ষার্থীগণের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যাঙ্কের সহিত তাহাদের বীজগণিতের অনুবন্ধ ০·৯ এবং জ্যামিতির ০·৮। এরূপ ক্ষেত্রে বীজগণিত ও জ্যামিতির অনুবন্ধ হইবে ০·৯ × ০·৮, অর্থাৎ ০·৭২, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ বীজগণিতে তাহাদের যে সাফল্যাঙ্ক হইবে, উহার ভিত্তিতে আদর্শ বিষয়ে তাহাদের সম্ভাব্য সাফল্যাঙ্ক (প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে) হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক × ০·৯। সুতরাং জ্যামিতির

বেলায় যাহাদের আদর্শ বিষয়ে সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক × ০·৯, তাহাদের জ্যামিতির সাফল্যাঙ্ক হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক × ০·৯ × ০·৮ বা বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক × ০·৭২।

কিন্তু প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে বীজগণিত ও জ্যামিতির অনুবন্ধ ০·৭২ হইলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইহাই দেখা যাইতেছে যে আদর্শ বিষয়টির সহিত উভয় বিষয়ের অনুবন্ধদ্বয়কে পরস্পর গুণ করিলে উভয় বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধটি বাহির হইবে।

এখন স্পিয়ারম্যানের মতবাদ সহজ কথায় এই। উপরে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় মানসিক ক্রিয়াগুলির কথা যাহা বলা গিয়াছে, তাহা চিন্তামূলক যে কোন কার্য্যের ক্ষেত্রেই খাটে। যে ক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ ধীশক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া বানান শিক্ষা বা রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মত সামান্য ক্রিয়ার পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য। তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, উপযুক্ত সতর্কতা সহকারে একদল লোকের একেবারে পৃথক নানা ধরণের অভীক্ষার ফল যদি লওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি অভীক্ষার ফলের সঙ্গে অন্য সব কটি অভীক্ষাফলের অনুবন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে বীজগণিত ও জ্যামিতি আয়ত্ত করার মধ্যে যে সাধারণ শক্তির (general factor) সন্ধান আমরা পাইয়াছিলাম, সাধারণ-ভাবে তাহার স্থান সকল চিন্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যেই আছে, এই জন্যই উহাদের মধ্যে অনুবন্ধ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ হয় ত বলিবে এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথবা বার্টের (Burt) অনুসরণে মার্জ্জিত ভাষায় ইহাকে অন্তর্নিহিত সাধারণ জ্ঞানমূলক দক্ষতা (innate general cognitive efficiency) বলা চলে। কিন্তু স্পিয়ারম্যান এই শক্তির প্রকাশের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্থির করিলেন যে ইহাকে শুধু g অক্ষরটির দ্বারা সূচিত করিলে কোনও গণ্ডগোল থাকে না। তাই মনোবিদ্‌গণের কাছে ইহা সর্ব্বত্র g নামেই পরিচিত। স্পিয়ারম্যানের মতে যে কোন চিন্তামূলক ক্রিয়া বা অভীক্ষার এই g শক্তির সহিত অনুবন্ধ বর্ত্তমান। অর্থাৎ সহজ কথায় বলিতে গেলে যদি কোন লোকের এই সাধারণ শক্তি g যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে সে সর্ব্ববিধ চিন্তামূলক ক্রিয়ায়

যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিবে। ক্রিয়াটির সহিত সাধারণ শক্তির অনুবন্ধটিকে অনেক সময়ে সেই ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শক্তির পরিমাণও বলা হয়। ইতিপূর্ব্বে বীজগণিত ও জ্যামিতির কাল্পনিক উদাহরণটিতে যে নিয়ম পাওয়া গিয়াছিল, তদনুসারে যে কোনও দুইটি বিষয়ের পরস্পর অনুবন্ধের পরিমাণ (যেটুকু এই সাধারণ শক্তি হইতে উদ্ভূত) হইল উভয় ক্রিয়ার অন্তর্গত সাধারণ শক্তির পরিমাণের গুণফল।

একটু আগে যে আদর্শ পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে, উহাতে কোনও ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক যেটি, উহাই হইবে সেই ব্যক্তির সাধারণ শক্তির পরিমাণ। বহুসংখ্যক অভীক্ষার সহিত সাধারণ শক্তির অনুবন্ধ জানা থাকিলে (এ বিষয়ে পরে বুঝান যাইবে) কোনও ব্যক্তির নিজস্ব সাধারণ শক্তি সহজেই নির্ণয় করা যাইবে। আমাদের পূর্ব্বের উদাহরণটি লওয়া যাক। উহাতে আদর্শ বিষয়ের (অর্থাৎ সাধারণ শক্তি বা g এর) সহিত বীজগণিতের অনুবন্ধ ০·৯ ধরা হইয়াছিল। সুতরাং সে ব্যক্তিরও (প্রত্যাবৃত্তির নিয়ম অনুসারে) আদর্শ বিষয়ে সম্ভাব্য সাফল্যাঙ্ক (বা সাধারণ শক্তি) হইবে, বীজগণিতের সাফল্যাঙ্ক × ০·৯। তেমনই, তাহার জ্যামিতির সাফল্যাঙ্ক ধরিলে তাহার সাধারণ শক্তি হইবে, জ্যামিতির সাফল্যাঙ্ক × ০·৮। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এইভাবে আরও ফলাফল পাওয়া যাইবে। এগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে না, কারণ বিবিধ পরীক্ষার সাফল্যাঙ্কসমূহে পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যদি অপ্রধান শ্রেণীগত শক্তির (ইহার বিবরণ একটু পরে দেওয়া যাইবে) প্রভাব বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই বিভিন্ন ফলাফলগুলির গড় হইতে সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা ধারণা করা যায়, এবং উহার দ্বারা মোটামুটি কাজও চলিয়া যায়।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে স্পিয়ারম্যানের দ্বিশক্তিবাদ (Two Factor theory) অনুযায়ী কোনও একটি অভীক্ষাতে কোনও লোকের সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ দুটি বস্তুর উপর নির্ভর করিবে। প্রথম হইল অভীক্ষাটির স্বকীয় প্রকৃতি ; দ্বিতীয়, ব্যক্তির নিজের বৈশিষ্ট্য। তাহার কারণ প্রত্যেক অভীক্ষাতেই সাধারণ শক্তি বা g-এর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, উপরন্তু উহার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিশেষ শক্তি আছে, ইহা 's' অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়।

সুতরাং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করিতে গেলে এই দুইটি শক্তির আপেক্ষিক পরিমাণের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সে ব্যক্তির নিজস্ব সাধারণ শক্তির পরিমাণ (ইহারই উপর অভীক্ষাটির অন্তর্গত সাধারণ শক্তিসম্পর্কিত ক্রিয়াগুলিতে তাহার সাফল্য নির্ণয় করিবে), এবং অভীক্ষাটিতে প্রয়োজনীয় সেই ব্যক্তির বিশেষ শক্তির পরিমাণ, এ দুটিও ধরিতে হইবে। বিভিন্ন ক্রিয়ার অভীক্ষার মধ্যে এই দুটি শক্তির আপেক্ষিক মাত্রা সম্পর্কে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। স্পিয়ারম্যান দেখিয়াছেন যে প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নে সাধারণ শক্তির পরিমাণ বিশেষ শক্তির ১১ গুণ। কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় সাধারণ শক্তি হইল বিশেষ শক্তির মাত্র একচতুর্থাংশ; এক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিরই সুস্পষ্ট প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় ছাত্রের নৈপুণ্য দেখিয়া অন্যান্য বিষয়েও তাহার যোগ্যতা কিরূপ হইবে তাহা খানিকটা নিশ্চয়তার সহিত অনুমান করা যাইবে; কিন্তু সঙ্গীতে দক্ষতা দ্বারা এরূপ বিচার করা চলে না।

অনেকগুলি অভীক্ষায় সাধারণ শক্তির অনুবন্ধ বা পরিমাণের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছিল, উহার কথা এখন বুঝিতে হইবে। সমস্ত পরীক্ষা দুটি করিয়া লইয়া উহাদেব মধ্যে যত অনুবন্ধ হইতে পারে, সবগুলির এক শ্রেণীবদ্ধ তালিকার সাহায্যে সচরাচর মনোবিদেরা পরীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করেন। তবে সে পদ্ধতি বড়ই জটিল এবং বহু বীজগণিতের অঙ্ক তাহার মধ্যে আছে, সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে বার্ট অন্য আর একটি ব্যাপারে এক পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা এখানেও খাটিতে পারে। সে প্রণালীটি সহজবোধ্য, অতএব তাহার উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে।

মনে করা যাক যে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি বহু সংখ্যক ব্যক্তির ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অনেকগুলি অভীক্ষা লওয়া গেল। অভীক্ষাগুলি এমন ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে যে যত বিভিন্ন রকমের চিন্তামূলক ক্রিয়ার মধ্যে অনুবন্ধ আছে, সে সমস্তই মোটামুটি উহার অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সমস্ত অভীক্ষার ফল নিম্নলিখিতরূপে (৪ নং চিত্র) ঘর কাটিয়া সাজান যাক। পরে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে প্রত্যেক সারির ফলগুলিকে প্রমাণ সাফল্যাঙ্কে

পরিণত করিয়া দ্বিতীয় এক ঘর কাটিয়া আগেকার মত সাজান হইয়াছে।

	১	২	৩	৪
ক	ক১	ক২	ক৩	ক৪
খ	খ১	খ২	খ৩	খ৪
গ	গ১	গ২	গ৩	গ৪
ঘ	ঘ১	ঘ২	ঘ৩	ঘ৪

৪ নং চিত্র

এখন ক, খ, গ ইত্যাদি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সাফল্যাঙ্কগুলি যোগ করা হইল, এবং যোগফলগুলির প্রত্যেকটিকে প্রমাণ সাফল্যাঙ্কে পরিণত করিয়া শেষের স্তম্ভে সাজান গেল। ইহা নীচে (৫নং চিত্র) দেখান হইয়াছে।

	১	২	৩	৪	+
ক	কপ্র১	কপ্র২	কপ্র৩	কপ্র৪	+কপ্র
খ	খপ্র১	খপ্র২	খপ্র৩	খপ্র৪	+খপ্র
গ	গপ্র১	গপ্র২	গপ্র৩	গপ্র৪	+গপ্র
ঘ	ঘপ্র১	ঘপ্র২	ঘপ্র৩	ঘপ্র৪	+ঘপ্র

৫ নং চিত্র

এখন যদি বিশেষ শক্তির কোনও কথা না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটি পরীক্ষার সহিত পূর্ব্বকথিত আদর্শ অভীক্ষার পূর্ণ অনুবন্ধ থাকিত। ফলে ক বা অন্য যে কোনও পরীক্ষার্থীর ফল সারির প্রত্যেকটি ঘরেই (অর্থাৎ প্রত্যেক অভীক্ষার ফল) এক হইত, কারণ উহা হইত তাহার সাধারণ শক্তির অনুরূপ। কিন্তু অভীক্ষাগুলি যদি বহুসংখ্যক এবং সকল শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে যে একটি সারির অন্তর্গত রাশিসমূহের (অর্থাৎ

যে কোনও পরীক্ষার্থীর সমস্ত অভীক্ষার ফলগুলির) মধ্যেও বহুবিধ বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকিবে। অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা অধিক বা অল্প, যোগফল-সূচক বা বিয়োগফলসূচক হইতে পারে। সুতরাং অভীক্ষার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য যেখানে খুব বেশী, সেক্ষেত্রে এগুলি পরস্পর কাটাকাটি করিয়া যোগফল শূন্য হওয়ারই সম্ভাবনা। সুতরাং যোগফলগুলিকে সাফল্যাঙ্কে পরিণত করিলে (ইহা পঞ্চম স্তম্ভে দেখান গিয়াছে) সেগুলি কল্পিত আদর্শ অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের যথাসম্ভব কাছাকাছি হইবে। অর্থাৎ এগুলি পরীক্ষার্থীদের সাধারণ শক্তির অনুরূপ হইবে। সুতরাং যে কোনও অভীক্ষাতে, যেমন ২নং অভীক্ষাতে, সাধারণ শক্তির পরিমাণ কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ২নং অভীক্ষার স্তম্ভ এবং সাফল্যাঙ্কে পরিণত যোগফলের স্তম্ভের অনুবন্ধ নির্ণয় করিলেই হইল। এইভাবে যে অনুবন্ধ সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা সমগ্র অভীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তির স্থান কতখানি, তাহা সাধারণভাবে বুঝা যাইবে। অভীক্ষাগুলি যদি সব কটিই এমন হয় যে, প্রত্যেকটি বিশেষ শক্তির প্রয়োগ মাত্র একটি অভীক্ষাতেই আছে, তাহা হইলে আর কিছু করিবার নাই। কিন্তু মনোবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে অভীক্ষাগুলির মধ্যে সাধারণ শক্তি এবং বিশেষ শক্তি ছাড়া শ্রেণীগত শক্তি (group factors) থাকারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ এই শক্তিগুলি এমনই ধরণের যে কতকগুলি অভীক্ষাতে এগুলি বর্ত্তমান, অথচ সবগুলিতে নাই। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটির জটিলতা বাড়িল, এবং আরও একটি বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হইবে।

এক্ষেত্রে বার্ট যে পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন তাহা এই। তিনি এক একটি সারির প্রত্যেকটি ফল হইতে সেই সারির যোগফলের প্রমাণ সাফল্যাঙ্কটি বিয়োগ করিলেন, এইরূপ প্রত্যেক অভীক্ষার বিয়োগফল সেই অভীক্ষার নীচে স্তম্ভাকারে সাজাইলেন। এই স্তম্ভগুলিকে আবার প্রমাণ সাফল্যাঙ্কে পরিণত করা হইল, প্রত্যেক সারির সাফল্যাঙ্কগুলি যোগ করা হইল এবং সেই যোগফলের গড় নির্ণয় করিয়া নূতন এক স্তম্ভ হইল। এখন উপরে বর্ণিত প্রত্যেক অভীক্ষার বিয়োগফলের সহিত এই নূতন স্তম্ভের অনুবন্ধ দ্বারা বুঝা যাইবে যে উক্ত অভীক্ষায় এই নূতন শ্রেণীগত শক্তির স্থান

কি পরিমাণে আছে। অভীক্ষাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই দ্বিতীয় শক্তি কি ধরণের হওয়া সম্ভব ; হয়ত কোনও ক্ষেত্রে এই শক্তি বাক্যগত (verbal factor), কখনও বা হিসাব সম্পর্কিত (arithmetical factor), কোথাও আবার হস্তনৈপুণ্যঘটিত (manual factor), ইত্যাদি।

উপরে যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বলা হইল, সেগুলিতে সাধারণ শক্তি বর্ত্তমান, সুতরাং বুঝা যায় যে এগুলি সবই বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট। কিন্তু মনের আর একটি দিক আছে, উহারও গুরুত্ব কিছু মাত্র কম নহে। আমাদের প্রক্ষোভ (emotions) এবং অন্যান্য প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত (temperamental) বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু মনোবিদের নয়, নীতিবাদী, নাট্যকার, কবি এবং ঔপন্যাসিকগণেরও চিরন্তন আগ্রহের বিষয় হইয়া আছে। ইহাদের পরীক্ষাগত বিশ্লেষণও সম্প্রতি হইয়াছে। সে বিষয়েও পথপ্রদর্শক হইতেছেন বার্ট, তাঁহার পরীক্ষাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

বার্ট এই পরীক্ষাটি সযত্নে নির্ব্বাচিত বার জন মহিলা স্নাতকদের লইয়া করেন। পরীক্ষার জন্য এই পরীক্ষার্থীদের এগারটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য বাছিয়া লওয়া হয়। এই গুণগুলি পরীক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান। গুণগুলি হইল, সামাজিকতা (sociability), সপ্রতিভতা (assertiveness) ক্রোধ (anger), কৌতূহল (curiosity) যৌনপ্রবৃত্তি (sex), আনন্দ (joy), স্নেহ (tenderness), দুঃখ (sorrow), বিরক্তি (disgust), ভয় (fear) ও বশ্যতা (submissiveness)। এই গুণগুলি বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কাহার কি পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা হইল। পরে এগুলি হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি গুণের প্রমাণ সাফল্যাঙ্কের সাহায্যে, কতকটা পূর্ব্ববর্ণিত পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় (পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অভীক্ষার মত) এক 'আদর্শ' ব্যক্তি (ideal person) পাওয়া গেল। এখন পরীক্ষার্থীদের সহিত এই আদর্শ ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের অনুবন্ধ বাহির করিলেই বুঝা যাইবে যে এক সাধারণ আদর্শ মানের তুলনায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মনে কোন্ গুণটির প্রাধান্য কতখানি।

বার্ট এইরূপ তুলনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে আদর্শ ব্যক্তির সহিত যে

সকল পরীক্ষার্থীর অনুবন্ধ বর্ত্তমান, তাহাদের এই সকল গুণের পরিমাণ অধিক আছে, সামাজিকতা, যৌনপ্রবৃত্তি, আনন্দ, সপ্রতিভতা ও ক্রোধ। আবার এই গুণগুলির পরিমাণ অল্প আছে ; ভয়, দুঃখ, স্নেহ, বিরক্তি এবং বশ্যতা। বিপরীত পক্ষে, আদর্শ ব্যক্তির সহিত যে সকল পরীক্ষার্থীর অনুবন্ধের অভাব, তাহাদের প্রথমোক্ত গুণগুলির পরিমাণ অল্প, শেষোক্তগুলি বেশী।

এই সম্পর্কে মানবচরিত্রের দুই বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ করা দরকার। এই দুই শ্রেণীর নাম বহির্বৃত (extravert) ও অন্তর্বৃত (introvert)। মনঃসমীক্ষক ইয়ুঙ (Jung) সর্ব্বপ্রথমে ইহাদের কথা বলেন। বহির্জগতের ব্যাপার ও ঘটনাবলীর প্রতি বিভিন্ন মানুষের যে প্রতিক্রিয়া, তদনুসারে এই পার্থক্য নির্দ্ধারিত হয়। বহির্বৃত মানুষের বেলায়, বাহির হইতে যে কোনও প্রভাব সহজেই তাহার মনের মধ্যে পৌঁছিবে ও সাড়া জাগাইবে, এবং উহা বাহিরেও প্রতিফলিত হইবে, অর্থাৎ লোকটির আচরণে ও ক্রিয়ায় তাহার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাইবে। এই প্রকৃতির লোক স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষভাবে বাহ্য জগতের সহিত নিজ সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অন্তর্বৃত মানুষের মনে অনেক বাহ্য প্রভাব পৌঁছায় না। নিজের মনের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যেই সে প্রধানতঃ আবদ্ধ থাকে। উইলিয়াম জেমস্ ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু (নানাবিধ দৃশ্য ও ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যেও) সর্ব্বক্ষণ তাহার স্বকীয় চিন্তাই তাহার মন অধিকার করিয়া রহিল। বাহিরের প্রভাব যেটুকু অন্তর্বৃত লোকের মনে আদৌ পৌঁছায়, তাহারও প্রতিক্রিয়া কোনও বাহ্য ক্রিয়ায় প্রকাশ না পাইয়া তাহার মনের মধ্যেই চলিতে থাকে।

এই বর্ণনা অনুসারে বলা যায় যে উপরে কথিত আদর্শ ব্যক্তি হইল বহির্বৃত, এবং তাহার গুণগুলি যদি উল্টাইয়া লওয়া যায় (অর্থাৎ যে গুণগুলি তাহার চরিত্রে বর্ত্তমান আছে, সেগুলির সেই পরিমাণ অভাব ধরা যায়, এবং যে গুণগুলির অভাব, সেগুলির আবার সমপরিমাণ অস্তিত্ব ধরা যায়), তবে অন্তর্বৃত মানুষ দাঁড়াইবে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি বার্টের এই শ্রেণীবদ্ধ তালিকায় মানুষের প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত বিশ্লেষণের দুটি ব্যাপার

আসিয়া যায়। প্রথমতঃ, মানুষটির সাধারণ প্রক্ষোভশীলতা (general emotionality), ইহা হইল তাহার সামাজিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের পরিমাণের গড়; দ্বিতীয়তঃ, সে ব্যক্তির বহির্বৃতি বা অন্তর্বৃতির পরিমাণই বা কতখানি, তাহাও বুঝা যায়।

শিশুদের মনে এই সকল প্রক্ষোভপ্রকৃতিগত গুণ (সামাজিকতা ইত্যাদি) কতখানি আছে, তাহারই ফলাফলের সাহায্যে বার্ট পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে অতি প্রয়োজনীয় লেখ (graph) রচনা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রে এ গুণসমূহের পরিমাণ হইতে পূর্ণ বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত ব্যক্তির গুণাবলীর লেখ প্রথমে প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রতি ক্ষেত্রে ইহা তুলনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই যে মানসিক লেখ (psychogram) গঠিত হয়, ইহাতে সহজে শিশুর প্রক্ষোভপ্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ণ বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত প্রকৃতির সহিত ইহার সম্পর্ক কি, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। বার্ট নিজ অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন যে এটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহারে এই কথা উল্লেখ করিতে হইবে যে এই শক্তিগুলির (factors) স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদেরা বহুপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়টি বর্ত্তমানে বিশেষরূপে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। যেমন স্পিয়ারম্যান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে g হইল মানসিক শক্তি (mental energy)। এবং ইহার অভিপ্রেত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ শক্তিগুলি (specific factors) হইতেছে স্নায়বিক যন্ত্রসমূহ (neural engines)। অন্য মনোবিদ্‌গণ, বিশেষতঃ আমেরিকার কোনও কোনও গবেষক, এই সকল শক্তির অস্তিত্ব ও কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই সমর্থন করেন না। এমন কি সংখ্যাগত পরীক্ষার বাহিরে বাস্তবক্ষেত্রে উহার কোনরূপ অস্তিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহান। এ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব এই গ্রন্থে বর্ণিত সাধারণ যুক্তির অনুরূপ হইবে, উহার ব্যতিক্রম হইবে না। আমরা প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে দেহের মধ্যে মন বলিয়া এক পৃথক বস্তু যে আছে, তাহা স্বীকার করা চলে না, জীবের আত্মিক (spiritual) ক্রিয়াগুলির এক অপরিহার্য্য নামই হইল মন। তেমনই এ কথাও বলা হইয়াছিল যে এষণা (horme) ও স্বতঃস্মৃতিকে (mneme) কেহ যেন

পৃথক বস্তু মনে না করেন। জীবের সকল মানসদৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিব্যাপ্ত ধর্ম্মরূপে এগুলিকে গণ্য করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ ধারার সহিত আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য আছে, কারণ বিজ্ঞানে এখন ঘটনা-সমূহের জড় বা বস্তুগত কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। এই ধারাটির পরিচয় বার্ট্রাণ্ড রাসেলের (Bertrand Russell) এক উক্তিতে পাওয়া যাইবে। তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বলেন, "বিদ্যুৎ কোনও বস্তু নহে, বস্তু এক যে বিশেষ ধরণে ক্রিয়া করে, তাহারই নাম বিদ্যুৎ।" ইহার অধিক উদাহরণের আবশ্যক হইবে না। বিশেষতঃ আইনষ্টাইনের (Einstein) সুবিখ্যাত মতবাদ-গুলি প্রকাশিত হওয়ার ফলে এ ধারণারও বহুল প্রচার ঘটিয়াছে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে ঠিক এই পন্থা অনুসরণে, মানুষের শক্তিগুলিকে (factors) বস্তু না ভাবিয়া মানবক্রিয়ার ধারা বা ধর্ম্ম মনে করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে দেখা যায়, যেমন, সাধারণ শক্তি বা g এবং সাধারণ প্রক্ষোভশীলতা (general emotionality), আবার অন্যগুলির বিস্তার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। মানবের দৈহিক গঠনের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে যেটুকু জানি, তাহার চেয়ে ঢের বেশী হয়ত ভবিষ্যতে জানা যাইবে। এগুলি সম্বন্ধে জানিবার উপস্থিত সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে মানবপ্রকৃতির এক মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। এবং শিশুজীবনের শক্তি ও দুর্ব্বলতাসমূহের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষেও এগুলি বিশেষ সাহায্য করে।

একাদশ অধ্যায়

অনুচিকীর্ষা

এ পর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে এষণা (horme) এ স্বতঃস্মৃতির (mneme) আলোচনায় আমরা জীবের শারীরিক ও মানসিক সত্তার দুইটি মূল ও সর্ব্বব্যাপক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইয়াছি। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা ও খেলার মধ্যে এ দুটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ের একটিতে শিশুর বিকাশে পরিবেশ ও প্রকৃতিগত গুণের প্রভাবের পার্থক্য দেখান গিয়াছে এবং অন্যটিতে শিশুর সহজাত প্রকৃতি প্রধানতঃ কি কি গুণ লইয়া গঠিত হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। এখন সে আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে যে, শিশুর জীবনের পরিণতিসাধনে পরিবেশ ও প্রকৃতিগত গুণ কিভাবে ক্রিয়া করে। ইহার জন্য মানুষের মনের আরও দুটি গভীর বৃত্তির বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। তাহার একটি হইল অনুকরণের সাধারণ আগ্রহ ; ইহার অনুচিকীর্ষা (mimesis) নাম দেওয়া যায়। ইহার আলোচনা এখন করা যাইবে। অপরটি হইতেছে কতকগুলি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ক্রিয়া করিবার আগ্রহ, তাহার নাম সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), তাহার আলোচনা পরে হইবে।

অপরের ক্রিয়া, অনুভূতি ও চিন্তাকে নিজস্ব করিবার যে সাধারণ বৃত্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, অনুচীকীর্ষা কথাটির অর্থে তাহাই বুঝিতে হইবে। শৈশবে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। জীবজগতে ইহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। এবং ইহার প্রভাব ও বংশগতির (heredity) প্রভাব পরস্পরের সহিত এমন সূক্ষ্মভাবে জড়িত, যে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। বর্ত্তমানে ইহার উপর পূর্ব্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা দেখা যায়। যেমন পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত জাতিসমূহের বিষয়গত ও সামাজিক কৃষ্টিতে যখন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ

(anthropologists) উহার কারণ বলেন, 'কৃষ্টির বিস্তার' (culture-spread)। পূর্ব্বে ইহাকে মনে করা হইত প্রকৃতিগত গুণের সাদৃশ্যের ফলে অনুরূপ ক্রমাভিব্যক্তি, অর্থাৎ সব জাতির মানুষের প্রকৃতিতে মিল আছে বলিয়া তাহার ক্রমপরিণতিও একরূপ হইয়াছে। এমন কি দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে ইতর প্রাণীদের বেলায় পর্য্যন্ত অনুচিকীর্ষাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র কুক্কুটশাবক ও অন্যান্য পক্ষীরা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সাহসিক সঙ্গীদের দৃষ্টান্তে আহার্য্য খুঁটিয়া খায়, জলপান করে। অথচ দেখা গিয়াছে যে জঙ্গলে মোরগ ও উটপাখীর শাবকদের খুঁটিয়া খাইবার এই দৃষ্টান্তের স্বাভাবিক প্রেরণা না থাকাতে তাহারা না খাইয়া মরে।

উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে অনুচিকীর্ষার মধ্যে অতি বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা থাকিতে পারে। সংজ্ঞাত (conscious) ইচ্ছা হয় ত একেবারেই না থাকিতে পারে। যেমন, কুক্কুটশাবক যে খুঁটিয়া খায় ও জলপান করে, তাহার কারণ শুধু এই যে অন্যেরা উহা করিতেছে। ইহা হইল নিম্নতম স্তরের অনুচিকীর্ষা। আবার অনুভূত উদ্দেশ্যও বিদ্যমান থাকিতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। তাহাকে অনুকরণ (imitation) অভিহিত করা যাইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ইচ্ছার (conation) সহিত এষণার (horme) বা স্মৃতির (memory) সঙ্গে স্বতঃস্মৃতির (mneme) যে সম্পর্ক, অনুকরণের সহিত অনুচিকীর্ষারও সেই সম্পর্ক। মানুষের আচরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অজ্ঞাত অনুচিকীর্ষা ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সংজ্ঞাত অনুকরণে পরিণত হইতে পারে। একটি সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ছোট একটি মেয়ে পড়ার ছুটি হওয়ায় সঙ্গীদের সহিত বাহির হইল। তাহারা দৌড়িলে সেও দৌড়িবে, সে তাহাদের তাড়া করিবে, তাহারাও তাহাকে তাড়া করিবে। এরূপ অবস্থায় একটি কুকুরছানাও ঠিক এরূপই করিত। ইহা হইল বিশুদ্ধ অনুচিকীর্ষা, অর্থাৎ ইহার সঙ্গে চিন্তার কোনও সম্পর্ক নাই, বা যদিও থাকে ত যৎসামান্য। এখন হয় ত মেয়েটির বিশেষ কোনও বন্ধু এক পায়ে লাফাইতে শিখিয়াছে, এবং সেই বিদ্যার সে পরিচয় দিল। মেয়েটিও দেখাদেখি নিশ্চয়ই তাহাই করিবে, প্রথমে ভাল না হইলেও ক্রমশঃ সে সহজে

ও স্বচ্ছন্দে উহা করিতে পারিবে। এখানে কিন্তু খানিকটা চিন্তা বর্ত্তমান; কারণ এক পায়ে লাফান কতকটা দৌড়ানর মত হইলেও উহার ন্যায় ঠিক স্বাভাবিক ক্রিয়া নহে এবং খুঁটিনাটির দিকে খানিকটা নজর না দিলে ইহা অনুকরণ করিতে পারা যায় না। এখন মনে করা যাক যে আরও দু এক বৎসর পরে মেয়েটি বড়দের দড়ি লইয়া লাফাইতে (skipping) দেখিল। সেও অবশ্যই সেরূপ লাফাইতে চাহিবে। এবং সে জন্য এই ক্রিয়ার ভঙ্গীটির উপর তাহাকে পূর্ব্ববারের চেয়েও অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। কারণ এই কার্য্যটি আরও বেশী শিক্ষাসাপেক্ষ এবং জটিল। আবার যদি ধরা যায় যে আরও একটু বড় হইয়া সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত নৃত্যে যোগ দিল, উহাতে শারীরিক ভঙ্গীগুলি অভ্যাস করার সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগও আবশ্যক হইবে। এক্ষেত্রে অনুচিকীর্ষা স্পষ্টই ক্রমশঃ যথার্থ অনুকরণে পরিণত হইয়াছে।

ইহা হইতে আমরা দুইটি গুরুতর বিষয়ের কথা বিবেচনা করিতে পারি। প্রথমটি হইল অনুচিকীর্ষার সহিত প্রকৃতিগত গুণের সম্পর্ক; দ্বিতীয়, ইহার সহিত মৌলিক (original) আচরণের সম্বন্ধ।

শুধু অনুচিকীর্ষার বেলায়, যখন এক প্রাণী অপরের দেখিয়া কোনও কার্য্য করে, তখন যে সে কার্য্য করিবার সামর্থ্য তাহার মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যমান আছে, তাহা স্পষ্ট। অপর প্রাণীর ক্রিয়াটি শুধু উহার উদ্দীপক (stimulus) বিবেচনা করা যাইতে পারে। কুক্কুটশাবক সর্ব্বপ্রথম তাহার মাতাকে জলপান করিতে দেখিয়াই নিজেও তাহাই করিল, শিশু অন্যদের দৌড়াইতে দেখিয়াই দৌড়াইল; এস্থলে জলপান করা বা দৌড়ানর জন্য প্রয়োজনীয় সকল রেখা সমন্বয় (engram-complex) প্রাণীর স্বভাবে পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অনুচিকীর্ষা ক্রমে সংজ্ঞাত অনুকরণের পর্য্যায়ে উপনীত হওয়ার সঙ্গে আর এ কথা খাটিবে না। যেমন দড়ির উপর লাফানর বেলায় সেই ক্রিয়াটির সহিত সংশ্লিষ্ট রেখাসমন্বয় মনের মধ্যে আপনা হইতেই পূর্ব্বসৃষ্ট থাকে না, এ ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়। বড় জোর এইরূপ ক্রিয়া দেখিলে তাহাতে আগ্রহ জাগিবার ও উহাকে আত্মসাম্মুখ্যের (self-assertion) উপায় মনে করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার স্বাভাবিক একটা

প্রেরণা মনের মধ্যে থাকিতে পারে। তবু অবশ্য স্বাভাবিক না হইলেও এই ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি অংশই প্রাণীর প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। দড়ি লইয়া লাফান শিক্ষা করিবার সময়ে যাহা ঘটিল তাহা এই যে, এই বিভিন্ন অংশগুলি এমন এক ভঙ্গীতে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইল, যাহার অনুরূপ কিছু মেয়েটির মনের নিজস্ব রেখাসমন্বয়ে আগে ছিল না। সে এখানে এমন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে যে তাহার ক্রিয়ার প্রেরণা আপনা হইতেই আসে, তাহার ফলে সে নানা ভঙ্গীতে দেহ ও অঙ্গসমূহ চালনা করিল, তাহার কোনটি ঠিক, কোনটি তাহা নয়। এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য হইতে পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন (trial and error) সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত সে ক্রমপর্য্যায়বদ্ধভাবে উপযুক্ত ক্রিয়াগুলি বাছিয়া লইবে। একবার বাছিয়া লইতে পারিলে সেই ক্রিয়া-সমূহের সমগ্র ভঙ্গীটির সন্নিবদ্ধতা (consolidation) ঘটিবে, এইভাবে উহার স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ইহতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুর অপরের ক্রিয়ার ভঙ্গীটি (pattern) বুঝিতে পারিবার, এবং নিজ ক্রিয়ার আদর্শরূপে উহাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাও আছে। সে ক্ষমতার মধ্যে দুটি জিনিষ দেখা যাইবে। প্রথমতঃ, শিশু ঐ ভঙ্গার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ক্রিয়া করিতে সক্ষম, তাহা সে নিজে জানে; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্রিয়াগুলি ঠিক কিভাবে সংযুক্ত হইয়া সমগ্র ভঙ্গীটি গঠিত হইয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারে। এই ভঙ্গীটি বুঝিয়া লওয়ামাত্র শিশু উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির (এগুলি যে তাহার জ্ঞাত, তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে) পুনরাবৃত্তি করিয়া সেগুলির মধ্যে এমন এক সমন্বয় আনিবার চেষ্টা করে, যেটি তাহার আদর্শ ভঙ্গীটির অনুরূপ হয়। ইহার একমাত্র কৌশল, পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন। তাহা করিবার সময়ে সে প্রতিপদে নিজ ক্রিয়াটি অনুকৃত ক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া দেখে। হয়ত বা সঙ্গী দর্শকদিগের বাহবাতেও কতকটা সাহায্য হয়। এই ভাবে এক নূতন রেখাসমন্বয় সৃষ্ট হয়, যাহার ফলে দড়ি লইয়া লাফান কাজটি প্রায় স্বতক্রিয় (automatic) বা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। পরে আবার এইটিই আরও কোনও ক্রিয়ার, যেমন দলবদ্ধ নৃত্যের অংশরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

শিশুর কথা বলিতে শেখার মধ্যে এই ক্রিয়ার অতি বিশিষ্ট উদাহরণ

পাওয়া যায়। শিশুর কয়েক মাস বয়স হইলেই দেখা যাইবে যে মাতাপিতা বা পরিচিত কেহ 'কু' বা ঐ ধরণের কোন শব্দ করিলে, সেও শব্দ করিয়া সাড়া দিবে। এ সময়ে যে শিশু চেষ্টা করিয়া শ্রুত শব্দের অনুরূপ শব্দ করিতেছে, বা সেই সাদৃশ্যের বিষয় সে জানে, তাহার কোনও ইঙ্গিতই মনোবিদগণের মতে পাওয়া যায় না। ইহা নিছক অজ্ঞাত অনুচিকীর্ষা। শিশুর এক বছর আন্দাজ বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত এ ক্রিয়া উচ্চতর স্তরে উঠে না। সে সময়ে শিশু অনুকরণ করিয়া স্পষ্ট কোন কোন কথা বলে; শুধু তাহাই নয়, নির্দ্দিষ্ট কোনও বস্তুর ক্ষেত্রে বা কোনও ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সেই কথা প্রয়োগও করিয়া থাকে। এই অবস্থায় সে কথাগুলি ক্রমাগত অভ্যাস করে, তাহাতে সেগুলি ভালভাবে আয়ত্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নব অভিজ্ঞতার আনন্দও সে পায়।

শিশুর দ্বিতীয় বৎসরে শব্দগুলিকে বাক্যরূপে সাজাইবার প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত হয়। তখন সে কোনও ঘটনা বা ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য দুটি বা তিনটি শব্দও যোজনা করিতে পারে। এই শব্দবিন্যাসের কতকটা স্বতঃ অনুকরণ, কতকটা শিক্ষাপ্রসূত, আবার কতকটা মনগড়া। এই অবস্থা হইতেই বুদ্ধিমান শিশুর প্রায়ই অদ্ভুত তাড়াতাড়ি কথা বলার উন্নতি হয়, ও ক্রমেই তাহার কথা সরল অথচ স্পষ্ট ও ব্যাকরণশুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার পরিচিত ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনও ভাব ইহা দ্বারা সহজে ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। এই উন্নতির মধ্যে নিজ্ঞ্ণাত অনুচিকীর্ষার ভাগ কত, স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ এবং শিক্ষার অংশই বা কতখানি, সে প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। শৈশবের এই কীর্ত্তিটি যদিও ঘটিবে বলিয়া সচরাচর ধরিয়াই লওয়া হয়, তথাপি প্রতিবারেই ইহা বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু। শিশুর অপরিসীম বুদ্ধি ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হয়।

অনুকরণ ও মৌলিকতার (originality) সম্পর্ক কি, শিক্ষার পক্ষে সেই প্রশ্নটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। আধুনিকভাবাপন্ন শিক্ষক কখনও কখনও অনুকরণের এই নিন্দা করেন যে উহাতে নিজস্ব ভাব প্রকাশে বাধা হয়। ইহা ভুল। অতি মৌলিক প্রতিভাকেও সময়ে সময়ে একনিষ্ঠভাবে পূর্ব্বগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। সেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও প্রথম রচনাসমূহে সমসাময়িক লেখকদের লেখার সহিত যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

বস্তুতঃ অনুকরণই ব্যক্তিতা গঠনের প্রথম পর্য্যায় ; অনুকরণের ক্ষেত্র যত ভাল হইবে, ব্যক্তিতাও ততখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই সত্যের দুই একটি তাৎপর্য্য খুবই স্পষ্ট। যেমন, শিশুদের গ্রন্থের সাহায্যে এমনই মহাপুরুষদের সাহচর্য্যে আনিতে হইবে, যাঁহাদের মত উদার ও উৎকৃষ্ট সংসর্গ দৈনন্দিন জীবনে তাহারা পায় না। অপর কয়েকটি তাৎপর্য্যের কথা আরও একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে, শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন করিতে হইলে বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী আবশ্যক। এ ধারণাও ভুল, বরং ছোট ছেলেকে নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার গুরুত্ব যতই মানিয়া লওয়া যায়, তাহার অনুকরণের ক্ষেত্রটিও বিস্তীর্ণ করাও ততই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। মেধাবী ও উদ্যমী শিশুদের দৃষ্টান্তে অল্পবুদ্ধি ও নিরীহ শিশুগণও সাধ্যমত কার্য্য করিবার প্রেরণা পাইবে। ফলে তাহাদেরও শক্তির বিকাশ ঘটিবে। সুতরাং শ্রেণী যতখানি সম্ভব বড় হওয়াই প্রয়োজন, তবে দেখিতে হইবে যে উহার আকার যেন এমন হয় যে শিক্ষক প্রত্যেকের পড়াশুনা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হন; এবং তাঁহাকে এমনভাবে কঠোর কর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করিতে না হয়, যাহাতে শিশুদের অনুকরণের স্পৃহা চলিয়া যায়। কারণ উহাতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন। জোর করিয়া অনুকরণ করাইতে গেলে সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া বরঞ্চ বাধা বা বিরাগের মনোভাব আসে। ঠিক এই কারণেই অনেক সময়ে বালকদের সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির রসাস্বাদন করাইবার চেষ্টা নিস্ফল হয়। ইহাও বলা দরকার যে এই বিরুদ্ধ মনোভাব দ্বারা ব্যক্তির নিজ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টার প্রতিবাদ প্রকাশ পায়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে অনুচিকীর্ষার পরিচয় ক্রিয়া, অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। সংজ্ঞাত জীবনের এই প্রক্রিয়াগুলি এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে অনুচিকীর্ষার ক্রিয়া একটিতে আরম্ভ হইয়া সচরাচর অন্যগুলিতেও ছড়াইয়া পড়ে। যেমন বালিকাগণ যে শিক্ষয়িত্রীকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে, তাঁহার হাতের লেখা, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী ও পোষাকের অনুকরণ প্রথমে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ধারণা ও মতামত গ্রহণ করিয়া লইতে পারে। অনুকরণকারী সকল বিষয়ে বলিতে

গেলে আদর্শের অনুরূপই হইবার চেষ্টা করে। ক্রিয়া, অনুভূতি ও চিন্তা, এ তিনটির কোনটিতে অনুকরণের বিঘ্ন ঘটিলে উহা অন্যগুলির বেলায়ও বাধা পাইবে। যেমন, আমরা যে লোকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, সচরাচর তাঁহার কথা বা পরিচ্ছদের ধরণ আমরা লই না। আবার যে ব্যক্তির সহিত গুরুতর বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ আছে, তাঁহাদের সুখদুঃখ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা বলার মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। এ প্রভেদ তাহাদের মনোভাবের বৈষম্যের ফলে ঘটিয়াছে, না ভাষার পার্থক্যে মনেরও পার্থক্য আসিয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। তবে ভাষার পার্থক্য যে বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ঠিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কথ্য ভাষার উন্নতি ঘটিলে তাহা সমাজবন্ধনের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর হইবে।

অনুভূতির ক্ষেত্রে অনুচিকীর্ষার ফল হইল সহানুভূতি (sympathy); এখানে সহানুভূতি শব্দটির আসল ব্যুৎপত্তিগত অর্থটিই ধরিতে হইবে, তাহা হইল সহ অনুভূতি অর্থাৎ অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ। ইহার কার্য্য এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরে দেখা যাইবে যে চিন্তা ও ক্রিয়ার সহিত অনুভূতি গভীরভাবে জড়িত। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কয়েকজন ফরাসী লেখক জনতার মনস্তত্ত্ব (psychology of the crowd) নাম দিয়া এ বিষয়ে লিখিয়াছেন। অনুভূতির সংযোগের ফলে বহুসংখ্যক নিঃসম্পর্কিত মানুষ একতাবদ্ধ হইয়া এক ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়। তখন তাহারা এমন মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে, আবার এমন দুষ্কর্ম্মও করিতে পারে, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে করিতে পারিত না। জননায়কগণ ও নির্ব্বাচনের কর্ম্মিগণ জনতার মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া কার্য্য করেন। তেমনই সাংবাদিকের রাজনৈতিক মতামত লক্ষ লক্ষ লোক অনুসরণ করে, উহার মধ্যে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য তাহারা বুঝিতে পারে না। সহানুভূতির দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। জাতি, সেনাদল বা বিদ্যালয়, সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার মূলেও এই ভাবটিই থাকে।

সামাজিক ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয় ম্যাকডুগাল ও ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ম্যাকডুগালের মতে শ্রেণীমনস্তত্ত্বের ভিত্তি

হইল প্রক্ষোভের সাক্ষাৎ উপগম (direct induction of emotion)। অনুভূতির ক্ষেত্রে অনুচিকীর্ষার কথা পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার অর্থও তাহাই বুঝায়। যখনই বহু লোক একত্র হয়, তখনই এক ব্যক্তির প্রক্ষোভ (emotion), যেমন ভয় বা হর্ষ, উপগমের (induction) সাহায্যে সমগ্র দলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তখন জনতা আর শুধু জনতা (অর্থাৎ সম্পর্ক বিহীন জনসমষ্টি) থাকে না, শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য উহাতে আসিয়া পড়ে। যেমন একই অভিনেতার কৌতুকাভিনয় দেখিয়া এক সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া হাসিলে অপরিচিত ব্যক্তিগণও যেন পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অবশ্য এরূপ সাময়িক জনসমষ্টি ও প্রাচীন ক্লাব, বিদ্যালয় বা জাতির ন্যায় সুন্দররূপে সঙ্ঘবদ্ধ নরসমাজের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। কারণ এগুলির বহুকালের অস্তিত্ব, নির্দ্দিষ্ট সংস্কার ও রীতিনীতি চলিয়া আসিতেছে, আর নিজের সমগ্রতা সম্পর্কে ও অন্যান্য সমষ্টি হইতে নিজের পার্থক্য সম্পর্কেও একটা সমবেত অনুভূতি আছে। ফলে উহাদের চেতনাও একীভূত হইয়াছে, আর উহাদের সামাজিক গঠনটিও সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি বহুলোকের চিন্তা ও অনুভূতি উভয়েরই বাহন হইয়া থাকে। এজন্য ঐ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মানসিক ক্রিয়াকলাপে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। আবার রাজনৈতিক বা সামাজিক সঙ্ঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তরের কর্ম্মিসঙ্ঘ, ইত্যাদি যে সঙ্ঘগুলিতে লোকে এক সাধারণ উদ্দেশ্য লইয়া স্বেচ্ছায় মিলিত হয়, সেগুলি আর এক ধরণের, আর পৃথক সভ্যগণের উপর দলগত প্রভাব এগুলিতে অতখানি স্পষ্ট বুঝা না গেলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যে জনতায় সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, সেখানে দলস্থ লোকেদের বুদ্ধি বিবেচনারও অবনতি হয়। এ বিষয়ে ফরাসী মনোবিদ্‌গণও জোর দিয়া এই কথাই বলেন।

ফ্রয়েড ম্যাক্‌ডুগাল বর্ণিত প্রক্ষোভের সাক্ষাৎ উপগমের কথা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধতার উৎপত্তি যে উহারই ফলে হইয়া থাকে, সে কথা তিনি অস্বীকার করেন। তাঁহার যুক্তি প্রথমতঃ এই যে, কতকগুলি লোক পূর্ব্ব হইতেই যদি সঙ্ঘবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে উহাদের একজন কোনও প্রক্ষোভ বা ভাব প্রকাশ করিলে অন্য সকলে প্রায়ই উহা গ্রহণ করে

না, বরং ইচ্ছা করিয়াই তাহা অগ্রাহ্য করে। যেমন, যে কৌতুকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা হাসিয়া অস্থির, 'রুচিবাগীশ' কোনও ব্যক্তি তাহাতে আমোদ পাইতে চান না। ফ্রয়েডের দ্বিতীয় কথা এই যে ম্যাক্‌ডুগাল জনগণের মধ্যে আতঙ্ক যে ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, উহাকেই প্রক্ষোভ উপগমের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে ধরিয়াছেন। কিন্তু এরূপ আতঙ্ককে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বলা চলে না। কারণ, সৈন্যগণ যতক্ষণ প্রকৃতরূপে সঙ্ঘবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহারা প্রবল বিপদের ভয়কেও উপেক্ষা করে। শ্রেণীর বন্ধন যখন শিথিল হইয়া যায়, তখনই ভয় দেখা দেয়। সুতরাং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে প্রক্ষোভের উপগম ছাড়া অন্য কোনও কারণ আছে।

ফ্রয়েড যে ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদ গঠন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মনোবিদ্যায় তাঁহার সাধারণ মতবাদের অনুরূপ। তাঁহার মতে শ্রেণী এক হিসাবে পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ। পরিবারের মধ্যে সন্তানেরা যে বন্ধন দ্বারা তাহাদের পিতার সহিত ও পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে, সেইরূপ বন্ধনেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। দলের নেতা পরিবারে পিতারই মত। সকলে যে তাঁহার নেতৃত্ব মানে, শুধু তাহাই নয়, তাঁহাকে আদর্শরূপে গণ্য করে। এ ভাবে দেখিলে মাক্‌ডুগাল নির্দ্দিষ্ট নেতার অধীন যে স্থায়ী দলের কথা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রেণীর যথার্থ উদাহরণ। অন্যান্য সমস্ত দলেরই এই বৈশিষ্ট্যটি থাকিবে ; যেমন যে দলটির স্থায়ী অস্তিত্ব কোনও জীবিত নেতার উপর নির্ভরশীল, উহার ক্ষেত্রে নেতার পরিবর্ত্তে 'স্বদেশ' বা এইরূপ কোনও আদর্শ স্থান পায়। উহাই দলের সম্মুখে মূর্ত্তরূপে আদর্শবাদের গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে।

ফ্রয়েডের মতবাদ হইতে অবশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের ও কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্পর্কের বিষয়টি বুঝা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়জীবনে একতা ও নেতৃত্বের প্রত্যেকটি দিক বিচার করিতে গেলে এ মতবাদের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক শিক্ষার্থীরা তাহাদের শিক্ষককে নেতা বলিয়া ধরিয়া লয়। আর তিনিই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও মর্য্যাদার মূল প্রভাব-স্বরূপ হইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই অপর নিম্নতর নেতাও থাকে। ইহাদের মধ্যে যথাবিহিতভাবে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত কর্ম্মী আছে। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দলের অখ্যাত নেতাও আছে, দুই তিনটি ছেলে একত্র হইলেই এই সব নেতার আবির্ভাব হয়, আর যে কোনও বিদ্যালয় ও শ্রেণীতেই ইহাদের দেখা যায়। স্বপক্ষেই হউক বা বিপক্ষেই হউক, সকল শিক্ষককেই ইহাদের সম্মুখীন হইতে হয়। যেখানে বিদ্যালয়ের কার্য্য ও শাসনের অবস্থা ভাল, সেখানে ইহারা সাধারণতঃ বিদ্যালয়বিধির হিতৈষী ও উৎসাহী সমর্থক হইয়া থাকে। কিন্তু অবস্থা সকল ক্ষেত্রে ভাল না হইতে পারে। কিছু গোলমাল হয় ত থাকে, সম্ভবতঃ সেরূপ পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। তেমন ক্ষেত্রে দলগুলির স্বাভাবিক নেতা কাহারা, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, সকল সময়ে বাহির হইতে তাহাদের ধরা যায় না। আর যথাসম্ভব তাহাদের মধ্যে আনুগত্য ও উৎসাহের সঞ্চার করাও শিক্ষকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যদি তাহারা কিছুতেই ভদ্র না হয়, তবে এই শান্তিভঙ্গকারীদের দমন করা ব্যতীত অন্য সদুপায় থাকে না। কিন্তু বল প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া লইতে হইবে যে সত্যই অন্য উপায় আছে কি না। কারণ সর্ব্বোপরি এই কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বিদ্রোহী দলের এক নগণ্য ব্যক্তি যদি শাস্তি পায় অথচ আসল নেতাটি অব্যাহত থাকে, তবে তাহার মত দুর্ব্বলতা আর নাই।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যদি অনুভূতির বৈষম্য থাকে, তবে বিদ্যালয়ের সঙ্ঘজীবনে নৈতিক উৎকর্ষ ঘটিতে পারে না। শিক্ষক যদি এ উন্নতি চাহেন, তবে তাঁহার বয়স বেশী হইলেও বালকের আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতি সত্যকার সহানুভূতি (sympathy) তাঁহার থাকা দরকার। অপরের অনুভূতি নিজে অনুভব করাই হইল সহানুভূতি। এই সহানুভূতি শুধু বাহিরে দেখাইলে চলিবে না। কারণ অনুভূতিতে আন্তরিকতার অভাব থাকিলে তাহা সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়ে, এবং ইহাতে মানুষের যতখানি অবিশ্বাস ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তির মনে চিরতারুণ্যের ঐশ্বর্য্য নাই, তাহার পক্ষে শিক্ষাবৃত্তির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়।

অনুভূতির বিস্তার (feeling-spread), অর্থাৎ একের অনুভূতি বিনা চেষ্টায় অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াকে প্রায় সম্পূর্ণই নিম্নস্তরের অনুকরণ বা

অনুচিকীর্ষা গণ্য করা যায়। অন্যের আনন্দ, উৎসাহ, ভয়, বিমর্ষতা, এই সব মনোভাব চিন্তার সাহায্য না লইয়াই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে।

কিন্তু দৈহিক ক্রিয়ার মত চিন্তার ক্ষেত্রেও উভয়বিধ অনুচিকীর্ষা দেখা যায়। যেখানে আমরা কোন কথা বা যুক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত ইতিহাসের বর্ণনা বা জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতেছি, সে স্থলে উহাকে চিন্তামূলক অনুকরণ বলা চলিবে। কারণ সে ক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য এই যে আমরা অপরের দৃষ্টি বা চিন্তার ধারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুসরণ করিতেছি। অপরের ভাব যখন ইচ্ছা বা যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই গ্রহণ করা হয়, তখন অনুচিকীর্ষা হয় নিম্নস্তরের, ইহাকেই সাধারণতঃ অভিভাবন (suggestion) বলা যায়। সংবেশকগণ (hypnotists) প্রথমে অভিভাবনের চর্চ্চা করেন। সংবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে সংবিষ্ট ব্যক্তিকে যে কোনও ধারণা মানিয়া লইতে বলা হয়, তাহাই তিনি লইবেন। পরে দেখা গেল যে প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও সর্ব্বদাই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পরীক্ষাও হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিনে (Binet) যে ভাবে পরীক্ষা করেন, তাহারই একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

দশ বছর বয়সের কতকগুলি ছেলেমেয়েকে একে একে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে বেশ গল্প করা গেল। তাহারই মধ্যে এক সময়ে প্রত্যেককে একখানি চিত্র দেখান হইল। তাহাতে ছিল যে হ্রদের উপরে একখানি বজরা পাল তুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক শিশুকে ছবিটি আধ মিনিট দেখিতে দেওয়ার পরে উহার বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহার মধ্যে এ প্রশ্নটিও ছিল, "ছবিতে জাহাজটি কি বজরা যে অভিমুখে যাইতেছে, সেই দিকে যাইতেছে, না বিপরীত দিকে যাইতেছে?" প্রায় কুড়ি জনের মধ্যে মাত্র দুই একটি শিশু এই কথা (অর্থাৎ অভিভাবন) সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া খোলা-খুলি বলিয়া দিল যে কোনও জাহাজ তাহারা ছবিতে দেখে নাই। বাকী সকলের মধ্যে কাহারও অস্বস্তির চিহ্ন গেল, যেন নিজেদের পর্য্যবেক্ষণ বা স্মরণশক্তির অভাবে তাহারা লজ্জা পাইয়াছে, কেহ দ্বিধাগ্রস্তভাবে উত্তর দিল; কিন্তু অনেকেই স্পষ্ট বিশ্বাসের সহিত বলিয়া দিল যে কল্পিত জাহাজটি কোন দিকে যাইতেছে!

এই সমস্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে ভালরূপেই বুঝা যায় যে বয়স্ক ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে শিশুর অভিভাব্যতা (suggestibility) বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার প্রশ্নে যা কিছু ইঙ্গিত থাকে, শিশুরা বিনা প্রশ্নে বা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ তিনি যদি শিশুদের কাছে অপরিচিত হন, বা তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হন, তবে ত কথাই নাই। শ্রেণীপাঠনায় যে সব প্রশ্ন করা হয়, সে সম্পর্কে এ বৈশিষ্ট্যটির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। আবার বিদ্যালয়ে কোনও গোলযোগ ঘটিলে সাক্ষী হিসাবে শিশুরা যে সমস্ত উক্তি করে, সে বিষয়েও ইহার গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে অভিভাবনের স্থান অল্প নয়। পরনিন্দা, কুৎসা, সন্দেহ ইহারই সাহায্যে বাড়িতে পারে, কিরূপে তাহা পাঠক নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখুন। আর বড় যে সমস্ত গুজব রটে, সেগুলির বৃদ্ধি, বিস্তার ও প্রাবল্য অনেকাংশে অভিভাবনের দ্বারাই সাধিত হয়। কোনও অস্বাভাবিক অবস্থায়, যেমন যুদ্ধের সময়ে, ইহার শক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সে সময়ে লোকের মন এত ক্লান্ত থাকে যে তাহারা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই কোনও কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। অভিভাবন ও অনুভূতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, তাহাও আমরা এরূপ স্থানে দেখিতে পাই। প্রায়ই লোকের মনোগত ইচ্ছা যেটি, তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়া লয়। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতেও ইহার বৃহৎ স্থান আছে। এই বিষয়ে এক বৃদ্ধার গল্প উইলিয়াম জেমস্ বলিয়াছেন। বৃদ্ধাটি যখন কোনও জিনিষের জন্য দোকানদারকে তাগিদ করিতেন, তখন তাহার কারণ এইটুকুই থাকিত যে বিজ্ঞাপনে তাহার খুবই সুখ্যাতি! কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব চতুর যাঁহারা, তাঁহারাও ঠিক এই ভাবেই ধরা পড়িয়া যান। যে বিক্রেতা প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকিলেও কোনও জিনিষ কিনিতে লোককে রাজী করান, তাঁহার এইরূপ অভিভাবনের শক্তি আছে। ব্যবসায়ী নিজের জিনিষটি বেচিতে চান, সে বিষয়ে ক্রেতার মনে পূর্ব্বাবধিই সতর্কতা আছে, চতুর বিক্রেতা স্পষ্ট কথায় তাহা দূর করিবার চেষ্টা মাত্র করেন না। তিনি বাক্‌চাতুর্য্য সহকারে এমনই এক ধারণা মানুষের মনে জন্মাইয়া দেন যে তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ লোক এমন বাঞ্ছনীয় দ্রব্যটি ক্রয় না করার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। ফলে ক্রেতার মন ভিজিয়া যায়।

তবে অভিভাবনের ঘোর কাটিয়া গেলে অনুশোচনা আসে, আসল ব্যাপারটি তখন চোখের সামনে ধরা পড়ে।

অভিভাবনের আরও প্রবল ক্রিয়া দেখা যায় কুসংস্কারের মধ্যে। সর্ব্বকালে সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের ইহা ভিত্তি। যেমন ভৌতিক ব্যাপারের বস্তুগত নিদর্শন কোথাও বিশেষ প্াওয়া যায় না। তথাপি এবিষয়ে অদ্ভুত সব ধারণা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। আধুনিক যুগে ইহার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে জ্যোতিষ ও অন্যান্য অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস। অবশ্য এই বিদ্যায় প্রকৃত দক্ষতা সম্পর্কে এ কথা বলা হইতেছে না। সচরাচর এ ক্রিয়াগুলি যেভাবে চলিতে থাকে এবং লোকেও উহা মানিয়া লয়, তাহারই কথা বলিতেছি। ভৌতিক ও অলৌকিক ব্যাপারের বেলায় অবাধ আশা ও ভয়ের প্রভাবে মনটি আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাই সহজেই অভিভাবনের দ্বারা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। এরূপ বিশ্বাসের বিস্তৃতি লাভ করিবার অনেকটা কারণ এই যে ইহা এক নকল বৈজ্ঞানিকতার ছদ্মবেশে আসে। ইহার মধ্যে জনগণের শিক্ষার ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এই কথা বুঝা যায়, যদিও বিজ্ঞানের শক্তি অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি উহা এখনও জনসাধারণের মনকে এই সব প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করে নাই।

বেতারের প্রসারের সঙ্গে আর একটি জিনিষেরও গুরুত্ব বাড়িয়াছে। ইহাকে বলা হয় প্রচারকার্য্য (propaganda)। বহুসংখ্যক লোকের সংস্কার, আবেগ, ধারণা, ইত্যাদি গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে প্রচারকার্য্যের বিরাট গুরুত্ব আছে। পূর্ব্বে এই কার্য্য সংবাদপত্রদ্বারাই সাধিত হইত। তবে তাহার শক্তি অনেক কম ছিল। এখানে বলা যায় যে এমন এক ধারণা আছে যে প্রচারকার্য্যে সর্ব্বদাই অসত্য বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় লওয়া হয়। কিন্তু এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে। অপরের মত গঠনের জন্য যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করা এবং উহার সমর্থন উহারই নিজস্ব গুণাগুণের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া প্রকৃত প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রেও অভিভাবনের ক্রিয়া পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে। কারণ এই প্রচারকগণের সত্যভাষণ সম্বন্ধে শ্রোতার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস থাকিতে পারে। ফলে শ্রোতারা

ইঁহাদের উক্তি বিনা প্রমাণ বা যুক্তিতেই মানিয়া লন। যেক্ষেত্রে মিথ্যা ধারণা প্রচারের চেষ্টা চলে, সেখানে আরও প্রত্যক্ষ ও প্রবলভাবে অভিভাবন প্রয়োগ করা হয়। বহু কূট কৌশলে ইহা লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করে, এবং প্রায়ই উহাতে সমর্থও হয়।

এইরূপ প্রচারকার্য্য ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত চালাইলে তাহার ফল যে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, তাহা যুদ্ধের সময়ে দেখা যায়। বিশেষতঃ গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ইহার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রচারকার্য্যের সাহায্যে সমগ্র এক একটি দেশকে যে কোনও মত গ্রহণ করান যায় ও তাহা করানও হইয়াছে। কোনও কোনও দেশে এইরূপ ভ্রান্ত প্রচারকার্য্য শিক্ষার ক্ষেত্রে হইয়াছে, এবং অল্প কালের মধ্যেই তাহার ভয়ঙ্কর ফল সমগ্র দেশকেই সংক্রামিত করিয়া তুলিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্ণয় করা মানব সভ্যতার সম্মুখে এক অতি বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল সমস্যা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে আমাদের সকলের বুদ্ধির ক্রিয়াতে অভিভাবনের স্থান অতি বিশাল। এক এক দেশে যে এক এক ধর্ম্মের, এক এক রাজনৈতিক মতবাদের প্রচলন হইয়াছে, তাহারও কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়। অবশ্য ইহা বলা চলে না যে এরূপ মতবাদ পোষণে বুদ্ধির কোনও স্থান নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, মানুষ প্রথমেই একটি মতবাদে দীক্ষিত হয়, পরে নিজ বুদ্ধির সাহায্যে উহার বিশ্লেষণ ও সমর্থন করে। মানবজীবনে বুদ্ধির যে আসল ক্রিয়াটি চোখে পড়ে, তাহা সত্যের অনুসন্ধান নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে সব সংস্কার আমরা অভিভাবন দ্বারা পাইয়াছি, সেগুলির সুস্পষ্টতা, দৃঢ়তা ও বিস্তার সাধনই বুদ্ধির কার্য্য। মানবজাতির এই সাধারণ অভ্যাসটির পরিচয় পাওয়া যায় বার্কের (Burke) চরিত্রে। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে কোন দলে যোগ দিবার সময়ে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইতেন। আবার দলে যোগ দিবার পরে উহারই সমর্থনে তিনি দার্শনিকের স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

অতএব অভিভাব্যতাকে মানবচরিত্রের শোচনীয় দুর্ব্বলতা মনে করিলে ভয়ঙ্কর ভুল হইবে। পুনরাবৃত্তি ও খেলার বৃত্তির ন্যায়, প্রাণীজীবনে এ

বৃত্তিটিও ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। মানুষের সমস্ত ব্যাপার যুক্তি অনুসারে পরিচালিত করাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যতদিন না সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার জীবন নিশ্চল থাকিতে পারে না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ অভিভাবনের সাহায্যে অন্ততঃ আংশিক সত্য দৃষ্টিও লাভ করিবে, এটুকু না পাইলে যথার্থই তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে।

শিক্ষকের পক্ষে অতি জটিল প্রশ্ন এই যে, অভিভাবনের প্রয়োগ কিভাবে করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে। উপরের সব কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উহা স্থির করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার বুঝা আবশ্যক যে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নিজেকে অদৃশ্য করিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে যতখানি অসম্ভব, ছাত্রদের মনে অভিভাবনের ক্রিয়া বন্ধ রাখাও ঠিক ততখানিই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এ কথাও তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিভাবন প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফুর্ত্ত ক্রিয়ার পক্ষে অনিষ্টকর নহে, বরঞ্চ মানুষের নিজ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিবার ইহা প্রয়োজনীয় পন্থা। প্রথম উক্তিটি হইতে বুঝা যাইবে যে শিক্ষার্থীগণের পরস্পরের মধ্যে অভিভাবন যেমন চলিতে থাকিবে, শিক্ষকের অভিভাবনও তাহাদের উপর ততখানিই প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু দেখিতে হইবে যে এ প্রভাব যেন জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করা না হয়। শিক্ষক শুধু নিজ উচ্চতর জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার অপরিণতচিত্ত শিক্ষার্থীর দলটির সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। তাহারা উহা হইতে যেটুকু প্রয়োজন গ্রহণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় উক্তিটি হইতে ইহাই ধরা যায় যে, শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীদের মনে অভিভাবন জাগাইবার শক্তিটি নিয়ন্ত্রিত করিয়া যতখানি সম্ভব তাহাদের যুক্তিসিদ্ধ সত্য অনুসন্ধানের অভ্যাসটি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কারণ ইহা না গঠিত হইলে মানুষের মনের বন্দীদশা ঘুচিবে না। এই উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষকের পক্ষে অভিভাবন প্রয়োগ করা শুধু সঙ্গত নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার শিক্ষার মধ্যেও হইতে পারে, আবার পরোক্ষভাবে সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থের সাহায্যেও হইতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনে যুক্তির আদর্শ জাগাইয়া তুলিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল বিরোধ আছে, সে সম্পর্কে শিক্ষক কোন্ পন্থা গ্রহণ করিবেন, তাহাও কি উপরে বর্ণিত যুক্তি দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে? তাহার উত্তর হইল এই যে, শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে দেখিতে হইবে যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে আদর্শ গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণা লাভ করিবার সুযোগ হইতে যেন কোনও শিশুই না বঞ্চিত হয়। উপরন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ছেলেমেয়েরা কৈশোরে (adolescence) উপনীত হওয়ার পরে এই সকল বিষয় যখনই স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িবে, তখনই তাহাদের সেগুলি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। অনিষ্টকর অভিভাবনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, কারণ অসংযম ও মিথ্যা সংস্কার হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। অজ্ঞতার মধ্যেই ইহা পুষ্টিলাভ করে ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ইহা কণ্ঠরোধ করিতে চায়। শিক্ষার্থীগণ আন্তরিকভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার এবং প্রত্যেকে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ যেন পায়। তবেই তাহাদের মনের যে গভীরতম প্রেরণাগুলির উপর শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের নির্ভর করিতে হইবে, সেগুলির সন্ধান তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পাইতে পারিবে।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

সহজাত প্রবৃত্তি

ক্ষুদ্র শিশু পৃথিবীতে আসিয়া যে সমস্ত ক্রিয়া দেখিতে পায় এবং পরে নিজস্ব করিয়া লয়, সেগুলির আসল প্রকৃতি ও উৎপত্তির কথা এখন ভালরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে আমরা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনে অনুচিকীর্ষার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাও দেখা গিয়াছে যে জীবজগতের, বিশেষতঃ মানুষের সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় ধারা অবিরাম কিভাবে চলিতেছে। এখন প্রাণীজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাহা এই যে আমাদের ক্রিয়াসমূহে পূর্ণ স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলি সর্ব্বদা কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পথ ধরিয়া চলে। আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহার ফলে আমাদের ক্রিয়াকলাপ এমন সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় চলিয়া থাকে। এমন কি অবাধ সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ারও সেই একই পন্থা।

এখানে জীবজগতের দৃষ্টান্ত দেখাইলে সুবিধা হইবে। কারণ মানবের ক্রিয়া এতই জটিল যে তাহার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। আবার শিশুর আচরণে বড়দের অনুকরণের প্রভাব এত বেশী থাকে যে উহা হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ভুল হইতে পারে। কিন্তু উচ্চতর জন্তুদের, যেমন কুকুর বা বানরের ক্রিয়া ও আচরণ কোনও কোনও বিষয়ে আমাদেরই ক্রিয়ার সরল প্রতিরূপ। তাহাদের আচরণের অনেকখানির মধ্যে যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ধারাগুলি শুধু জন্তুটির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নয়, পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। এগুলি আমরা সহজাত প্রবৃত্তি (instincts) নামে জানি। প্রাণীজীবনের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানবজীবনেও এই ক্রিয়াধারার কতকগুলি আসিয়া গিয়াছে। আর এগুলি এখনও আমাদের জটিল জীবনযাত্রার ভিত্তি, এরূপ মনে হওয়া অযৌক্তিক নয়।

এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝিতে হইলে ইতর প্রাণীদের আচরণ আর একটু যত্নসহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখা প্রয়োজন। উহারা যে সমস্ত জটিল ক্রিয়া

না শিখিয়াই শুধু প্রবৃত্তির সাহায্যে করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে অনেক সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। কীটের ন্যায় যেসব প্রাণীর জীবন এইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পূর্ণ চালিত, তাহাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করিবার শক্তি অদ্ভুত পরিমাণে থাকে। কিন্তু যখনই এমন কোনও সমস্যা আসে যেটি তাহাদের প্রবৃত্তির বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না, তখনই উহারা অপার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। সেইজন্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে 'অন্ধ' বলা হয় ও বুদ্ধিচালিত আচরণের বিপরীত বলিয়া গণ্য করা হয়। একথাও আমরা বলি যে পশুরা প্রবৃত্তির দ্বারা এবং মানব বুদ্ধি দ্বারা চালিত।

ফরাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গসঁ (Bergson) প্রদত্ত এক সুচিন্তিত মতবাদেও এই প্রচলিত ধারণাটি লক্ষিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রাণীজীবনের প্রথম স্তরে জীবের মনে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়ের বীজ সংমিশ্রিত ছিল। কিন্তু ক্রমোন্নতির সঙ্গে ইহাদের গতি সম্পূর্ণ পৃথক দিকে চলিয়াছে। কীটজাতীয় প্রাণীর ক্রিয়া বলিতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত। অপর দিকে মেরুদণ্ডী (vertebrate) জীবেদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। মানুষের যুক্তির মধ্যে, পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতার মধ্যে, ইহার সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের যেটুকু শক্তি কীটেরও আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহার মনেও বুদ্ধির ক্ষীণ রশ্মি মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। আবার মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবনেও প্রবৃত্তির গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়।

বার্গসঁর মতটি সাধারণ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা এবং মনোবিদ্যার যথাবিধি পরীক্ষাদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। আধুনিক কোনও কোনও মনোবিৎ মানুষের আচরণে প্রবৃত্তির কোনও স্থান আছে, একথা প্রায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই দুইটি যে, মানুষের আচরণে বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়, এবং উহা বাহ্য প্রভাব দ্বারাই চালিত হয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা অনেকটা বুঝা যায় ; আর তাহা ছাড়া ইতর প্রাণীদের শৈশব সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনোবিদেরা যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার ফলে এরূপ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল মনোবিদ্‌গণের মধ্যে অধ্যাপক কেলগ (Kellog) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষার জন্য

কয়েক মাস তাঁহারা তাঁহাদের শিশুপুত্রকে সমবয়সী এক বানরশিশুর সহিত রাখিয়া একসঙ্গে পালন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় শিশুটির ও বানর-শিশুর জীবনের প্রথম অবস্থার সাদৃশ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে যে সকল সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহার অন্ততঃ কিছু স্থান মানুষের জীবনেও আছে। এবং তাহার কোনও কোনও মূলগত কার্য্যকলাপে উহার প্রভাব রহিয়াছে, সে কথা বলা যায়।

মনোবিদ্‌গণ বলেন যে প্রবৃত্তি এক এষণাজাত প্রেরণা (hormic drive)। প্রাণীর বুদ্ধি ও ক্রিয়ার সকল শক্তি ইহার লক্ষ্য অনুসারে ইহারই নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতে পারে। এই কথাটিই সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায় যে প্রবৃত্তি আমাদের একটি সহজাত নিয়তি (determining tendency, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাহার প্রভাবে আমরা কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় ক্রিয়া করি। সুতরাং যে নিয়তিগুলি অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ হয়, সেগুলি হইতে যেমন আমাদের ক্রিয়ার উৎপত্তি ও পরিচালনা হইয়া থাকে, প্রবৃত্তি দ্বারাও ঠিক সেইরূপ হয়। আর সাধারণভাবে ইহাও বলা যায় যে, ইতর প্রাণীদের প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া একটি পরিচিত ও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে; কিন্তু মানুষের বেলায় উহাতে এত বৈচিত্র্য ও জটিলতা আসে যে উহার মূল কি, তাহাই বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। এই বিষয়টি পরে আরও দেখা যাইবে।

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ম্যাকডুগাল (Macdougall) যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহার প্রভাব সর্ব্বাধিক। তিনি বলেন যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির দুটি অংশ আছে, এগুলি সংযুক্ত হইলেও কতকটা পরস্পর নিরপেক্ষ। প্রথম অংশ হইল, বাহ্য কোনও বস্তু (বা ব্যক্তি) অথবা বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার (perceive) অন্তর্নিহিত জ্ঞানগত স্বভাব বা স্পৃহা (innate cognitive disposition)। দ্বিতীয়টি হইতেছে, এই বস্তু বা অবস্থার সম্মুখীন হইলে এক বিশেষ প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা (emotional excitement) ও ক্রিয়ার প্রেরণা (impulse to action) উপলব্ধি করিবার অন্তর্নিহিত অনুভূতিমূলক (affective) স্বভাব, উহা সেই বস্তু বা অবস্থার সম্পর্কে এক বিশেষ রকম

আচরণে প্রকাশ পায়। সুতরাং আমাদের বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ম্যাকডুগালের মতে সকল প্রবৃত্তিরই কেন্দ্ররূপে এক বিশেষ প্রক্ষোভ (emotion) অর্থাৎ অনুভূতি অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। মনে হয় যেন মানবজাতির আদি অবস্থায় যখন তাহারা জীবজগতের উচ্চতর প্রাণীগুলির সমান পর্য্যায়ে ছিল, তাহাদের তখনকার প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্য অবস্থার প্রবৃত্তির মধ্যে এই মূল প্রক্ষোভগুলিই যোগসূত্র। তাঁহার বর্ণিত প্রবৃত্তিসমূহ এবং উহাদের সংযুক্ত প্রক্ষোভগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমে দেখা যায় মাতার বাৎসল্যপ্রবৃত্তি (parental instinct), ইহার মধ্যবর্ত্তী প্রক্ষোভ হইল স্নেহ (tender emotion)। ইতর প্রাণীই হউক আর মানুষই হউক, অসহায় সন্তানের সান্নিধ্যে মাতার হৃদয়ে ইহার উদ্রেক হয়, আর সন্তানের রক্ষা ও বাৎসল্যের ক্রিয়ায় ইহা প্রকাশ পায়। মনে হয় যে, প্রাণীজীবনে আমরা পূর্ব্বের স্তর হইতে মানবের স্তরে পৌঁছিবার সময়ে এই প্রক্ষোভটির ভিত্তি আমাদের মনের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে ; তাই এক বিশেষ অবস্থায় এই বিশেষ ধরণের ক্রিয়ায় ইহার প্রকাশ ঘটে। এই ভিত্তিটি ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়াছে, যখন আমরা ইতর প্রাণীর স্তরে ছিলাম, তখন সেগুলি মাতার আচরণকে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য ইতর প্রাণীদের বাৎসল্যপ্রবৃত্তির ক্রিয়াতেও বৈচিত্র্য নাই বলিলে তাহাদের প্রতি বড় অবিচার করা হইবে, তবে মানুষের বেলায় এই প্রবৃত্তির বড় বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ রূপ দেখা যায়, এবং উহার যে কত বৈচিত্র্যময় পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিতে পারে, তাহার কোনও শেষ নাই। যেমন, গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে কোনও বৃদ্ধ বা শিশুর হাত ধরিয়া রাস্তা পার করাইয়া দেওয়া হইতে দরিদ্র শিশুগণের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, এ সব রকমের ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত হইতে পারে। তারপর সংগ্রাম (combat) প্রবৃত্তি। বাৎসল্য প্রবৃত্তি বা অন্য যে কোনও প্রবৃত্তির পথে বাধা পড়িলে (যেমন সন্তানদের প্রতি আক্রমণ চেষ্টা হইলে) এই প্রবৃত্তি উৎসারিত হয়। ইহার প্রক্ষোভ হইল ক্রোধ (anger)। কৌতূহল (curiosity) উদ্রিক্ত হয় যখন আমরা অজ্ঞাত

অথচ চিত্তাকর্ষক কোনও বস্তু বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। এই প্রবৃত্তির ফলে আমরা উহার সহিত পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টিত হই, ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রক্ষোভটি হইতেছে বিস্ময় (wonder)। মানবজাতির জ্ঞানের ক্রমবিকাশে এবং শিশুদের শিক্ষায় ইহার সবিশেষ গুরুত্ব আছে। আহার্য্য সন্ধান প্রবৃত্তি (food-seeking) ও ইহার সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভ রসনাতৃপ্তি (gusto) প্রাণীর আত্মসংরক্ষণে প্রধান প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যের দর্শন ও ঘ্রাণে এবং বিশেষ শারীরিক অবস্থায়, অর্থাৎ ক্ষুধা হইলে ইহার উদ্রেক হয়। প্রাণীর কোনও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ঘটিলে বিকর্ষণ (repulsion) ও ইহার অন্তর্বর্ত্তী প্রক্ষোভ বিরক্তির (disgust) উৎপত্তি হয়। হঠাৎ জোরে শব্দ হইলে বা কোনও বৃহৎ বস্তু নড়িলে বা সাধারণভাবে রহস্যজনক বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলে পলায়ন (escape) প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। ইহার ফলে প্রাণী নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকে, এক্ষেত্রে প্রক্ষোভটি ভয় (fear)। স্বজাতীয় অন্যান্য জীবের সান্নিধ্য ঘটিলে আসঙ্গ প্রবৃত্তি (gregariousness) জাগ্রত হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রক্ষোভটি হইল নিঃসঙ্গতা (loneliness)। আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) অতি গুরুতর প্রবৃত্তি, দুর্ব্বল প্রাণী সম্মুখে থাকিলে ইহার উদ্ভব হয়। ইহার প্রক্ষোভ হইল সার্থক আত্মানুভূতি (positive self-feeling), আর এক্ষেত্রে নিজ শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা আসে। ইহার পরিপূরক প্রবৃত্তি হইতেছে হীনতা স্বীকার (self-abasement) এবং উহার প্রক্ষোভ ব্যর্থ আত্মানুভূতি (negative self-feeling)। শ্রেষ্ঠ কোনও জীবের সম্মুখীন হইলে এ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, ফলে আমরা উহার প্রাধান্য মানিয়া লইতে বাধ্য হই। তারপরে যৌন প্রবৃত্তি (mating instinct) ও ইহার প্রক্ষোভ কাম (lust)। প্রয়োজনীয় বস্তু, বিশেষতঃ আহার্য্য ও গৃহের উপকরণ দৃষ্টিগোচর হইলে সংগ্রহপ্রবৃত্তি (acquisitive instinct) উদ্রিক্ত হয়। ফলে প্রাণী স্বভাবতঃ জিনিষটি আত্মসাৎ করিয়া সতর্কভাবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রক্ষোভটি হইতেছে স্বত্বানুভূতি (feeling of ownership)। বাসা বা আশ্রয় নির্ম্মাণের উপযোগী উপকরণ দেখিলেই নির্ম্মাণপ্রবৃত্তি(constructive instinct) জাগ্রত হয়, ইহার প্রক্ষোভরূপে আছে সৃষ্টিমূলক ভাব (feeling of creativeness)

প্রাণীর সংগ্রামপ্রবৃত্তি অভীষ্ট লাভে সফল না হইলে আসে অনুনয় (appeal), ইহার প্রক্ষোভ হইতেছে আর্ত্তি বা দুঃখ (distress)। হাসিকেও (laughter) প্রবৃত্তিরূপে গণ্য করা হয়, এটি অবশ্য শুধু মানুষেরই আছে, এবং ইহার প্রক্ষোভটি হইল আমোদ (amusement)। ম্যাক্‌ডুগালের মতে এমনই অবস্থায় ইহার উদ্রেক হইবে (যেমন কেহ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে) যে সে ক্ষেত্রে না হাসিলে আমাদের মনে বিরক্তি অথবা দুঃখের সঞ্চার হইত। সুতরাং প্রতিবার এরূপ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই এই প্রবৃত্তিটিতে আমাদের মনে স্বাভাবিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র বিবরণে অবশ্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির একেবারে সরল রূপটিই দেখান গিয়াছে। কিন্তু প্রাণীর আচরণে প্রবৃত্তির ক্রিয়া বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা কতকটা নির্দ্দিষ্ট ধরণের হইতে পারে ; পক্ষীর নীড়নির্ম্মাণ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিংবা প্রথম হইতেই ইহা নমনীয় ও পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে, তাহাও পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। মানবের প্রবৃত্তিসমূহ এই শেষোক্ত শ্রেণীর, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; সেই জন্য উহাদের স্বরূপ বুঝা কঠিন হয়। মানুষের বেলায় এগুলির পরিবর্ত্তন ও সেই জন্য জটিলতাও এত বেশী হয় যে কোনও একটি ক্রিয়ার মূলে যে কোন্ প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করাই কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন মানবশিশুর অদম্য কৌতূহল এবং সরল পরীক্ষা এবং রসায়নবিৎ বা পদার্থবিদের আগ্রহ, সংযম ও দক্ষতা, উভয়ই এক প্রবৃত্তিপ্রসূত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু দুটির মধ্যে এই যোগ আছে যে প্রথমটির ক্রমবিকাশের ফলেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি। পর্য্যটক ও আবিষ্কারকের দৃষ্টান্ত আরও জটিল মনে হইবে। ইহার মূলে আছে সেই অন্তর্নিহিত কৌতূহল ও ভ্রমণস্পৃহা, যাহা অনেক বিদ্যালয় পালান ছেলের মধ্যে খুব বেশী থাকে, এবং ইহার প্রভাবেই দুঃসাহসিক কাহিনীর প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। সংগ্রামপ্রবৃত্তিটিও অতি শৈশবে দৃষ্ট হয়। নানা লোকের জীবনীতে এই প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে হয় ত দেখা যাইবে যে শেষ পর্য্যন্ত ইহাকেই ভিত্তি করিয়া এক বড় ফুটবল খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, রাজনৈতিক দলের নেতা, বা এমন কি লোকহিতৈষীর পর্য্যন্ত পরিণতি ঘটিয়াছে। এই প্রবৃত্তির প্রথম সরল রূপটির বহু রূপান্তর বা

উদ্গতি (sublimation) ঘটিলেও ইহাই অন্তর্নিহিত ভাবে ক্রিয়ার প্রেরণাটি যোগাইতেছে। ইংলণ্ডের বিশিষ্ট মনীষী স্যামুয়েল আলেক্জাণ্ডার (Samuel Alexander) এই যুক্তি অনুসারে বলিয়াছেন যে বিজ্ঞানের সৃষ্টির মূলে কৌতূহলপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, গঠনপ্রবৃত্তির ফলে শিল্প ও সাহিত্যের এবং আসঙ্গ-প্রবৃত্তির প্রভাবে নীতিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য এরূপ উক্তি হইতে ইহা মনে করা ঠিক নয় যে মানুষের যে কোন ক্রিয়ার সবটুকুই এইভাবে (অর্থাৎ যে কোনও একটি মাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা) চালিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত প্রবৃত্তিটিকে ধরা যায় প্রধান কারণ রূপে, কিন্তু ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রবৃত্তিও থাকে, প্রায়ই অনেকগুলি থাকে। এগুলি এক সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া আচরণের এমনই জটিলতা আনিয়া দেয় যে তাহার মূল অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তি এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রক্ষোভের সহিত যুক্ত আছে। আর ঐ প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোভটিরও বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। সুতরাং প্রাণীর আচরণে প্রক্ষোভের গুরুত্ব অতি বিপুল; এইজন্য মনোবিৎ শ্যাণ্ড (Shand) বলিয়াছেন, প্রক্ষোভগুলিই "চরিত্রের ভিত্তি" (the foundations of character)। এমন কি কতক-গুলি প্রক্ষোভের অবস্থায় দেখা যায় যে দেহে এমন পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তিচালিত ক্রিয়ার সুবিধা হয়। যেমন ভয়ের সময় দেহ দ্রুত গমনের উপযোগী হয়, ক্রোধের বেলায় সংগ্রামের শক্তি আসে। এই-সব কারণে মনোবিৎ শ্রেষ্ঠ উইলিয়াম জেম্‌স্ (William James) অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহকর্ম্মী লাঁজের (Lange) সাহচর্য্যে প্রক্ষোভ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ জেম্‌স্-লাঁজ মতবাদ (James-Lange theory) প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কোনও একটী উদ্দীপকের (stimulus) প্রভাবে যে শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহারই ফলে প্রক্ষোভ অনুভূত হয়। জেম্‌সের নিজের কথায় বলিতে গেলে, "আমরা রোদন করিতেছি, এইজন্যই দুঃখ অনুভব করিতেছি, প্রহার করিতেছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছি, কাঁপিতেছি বলিয়া ভয় করিতেছে; রোদন, প্রহার, কম্পন যে যথাক্রমে দুঃখ, ক্রোধ ও ভয়ের অনুভূতির ফলে হইয়াছে, তাহা নয়।" এই মতবাদ প্রকাশিত

হওয়ার পরে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বহু অনুশীলন হইয়াছে; আর এ কথাও আমরা জানি যে প্রক্ষোভের মূলে শুধু শারীরিক পরিবর্ত্তন অপেক্ষা বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণও থাকে। তাহা হইলেও জেম্‌সের এই মতবাদটি এখনও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এবং ইহার বিশেষ গুণই এই যে প্রক্ষোভের ক্রিয়ায় দৈহিক পরিবর্ত্তনের স্থান সম্পর্কে ইহাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। কারণ অনেক সময়েই এ কথাটি ভুলিয়া যাওয়া হয়, অথচ আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রক্ষোভের সম্পর্কে ড্রেভারের (Drever) মতটি উল্লেখযোগ্য। ইনি ম্যাকডুগালের মতবাদ মোটামুটি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইনি দেখাইয়াছেন যে প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় প্রক্ষোভের প্রাধান্যের কথা সর্ব্বক্ষেত্রে মানা চলে না। ইনি বলেন যে, কোনও উদ্দীপক মনের কোনও প্রবৃত্তিতে সাড়া জাগাইলে তাহার ফলে মনে যে ভাবটির সঞ্চার হয়, তাহাকে শুধু একটি আগ্রহ (interest), বা ক্রিয়াটির সম্পর্কে সার্থকতাবোধ, এইটুকুই বলা যায়। এ আগ্রহটি স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হইবার পথে কোনও বাধা আসিলে তবেই প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। যেমন, ক্রোধ ও সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে আমরা পরস্পর সংযুক্ত মনে করি; কিন্তু সংগ্রামমূলক ক্রিয়ার মূলে সর্ব্বদাই যে ক্রোধ থাকে তাহা নহে। অনেক লোকই ত দুর্ভাগ্যক্রমে মনে করে যে যুদ্ধের আনন্দের জন্যই যুদ্ধ ক্রিয়াটি সার্থক হইয়াছে; সেরূপ ক্ষেত্রে মারামারি বাধাইবার বা চালাইবার জন্য ক্রোধের উদ্দীপকের আবশ্যক হয় না। উপরন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রে প্রক্ষোভপ্রবণতায় (emotionality) সাধারণভাবে তারতম্য আছে। আর প্রক্ষোভপ্রবণতা অল্প হইলে যে প্রবৃত্তি-মূলক শক্তিও সব ক্ষেত্রে কম থাকে, তাহা নয়। এই ধরণের ব্যাপারগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ম্যাকডুগালকেও শেষের দিকে নিজ মতবাদ অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাণীজীবনে প্রক্ষোভের স্থান ঠিক কি, সে প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হয় না। প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলশক্তিরূপে একটি প্রক্ষোভ রহিয়াছে, এ কথা যদি বা আমরা না মানি, তবে কোনও কোনও প্রক্ষোভ যে স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া)

আমাদের ক্রিয়া চালিত করে, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। যেমন ক্রোধ ও ভয়, এ দুটি প্রক্ষোভের প্রবৃত্তির সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ; অর্থাৎ, প্রবৃত্তির ন্যায় এগুলিও ক্রিয়ার উৎস। একটি বিশেষ রকমের উদ্দীপকের ফলে অর্থাৎ প্রাণীর আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং সে বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কোনও ক্রিয়ায় উহা প্রকাশ পায়। এ ক্রিয়াগুলি সর্ব্বদাই যে সংগ্রামমূলক তাহা নহে, যদিও সংগ্রামপ্রবৃত্তির সহিতই ক্রোধ প্রক্ষোভটি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ধরা হইয়াছে। জন্তুদের বেলায় উহাদের রাগের কারণ কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়, কারণ উহাদের আত্মসাম্মুখ্যের ক্রিয়াগুলির বৈচিত্র্যও বেশী নয়। আর ক্রোধের ফলে যে সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে, সেগুলিও নির্দ্দিষ্ট ও পরিচিত কয়েক ধরণের হইবে। যেমন ইহা সুনিশ্চিত যে, ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মুখের খাবার অন্য কুকুরে কাড়িতে আসিলেই সে ক্রুদ্ধ হইবে, আর প্রাণপণে কামড়াইয়া এই ক্রোধ সে প্রকাশ করিবে। তেমনই অতি ক্ষুদ্র শিশুর হাত হইতে প্রিয় খেলার জিনিষটি কাড়িয়া লইলে তাহার আচরণ ঠিক কিরূপ হইবে, তাহাও প্রায় এইরূপ সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখন কুকুরটির বেলায়, কোন্ কারণে তাহার ক্রোধ জন্মিবে, এবং উহার ফলে তাহার আচরণই বা কেমন হইবে, সেই ব্যাপারটি তাহার সারা জীবনই মোটামুটি এক রকমই থাকিবে। অতি বুদ্ধিমান যে কুকুর, সেও যে একটি ব্যঙ্গ কবিতায় ক্রুদ্ধ হইবে এবং শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য অন্য কুকুরদের সহিত দলবদ্ধ হইবে, এমন ব্যাপার সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শিশুর পরিণতি দাঁড়াইবে অন্যরূপ। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কোনও অন্যায়ের কথা শুনিলে, যেমন তাহার রচিত কবিতার মৌলিকতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইবে। এবং তাহার ক্রোধের প্রকাশভঙ্গীও হইবে তেমনই বিচিত্র। হয়ত সংবাদপত্রে এক ক্রোধ-সূচক পত্র প্রকাশিত করিয়া বা তাহার পরবর্ত্তী উপন্যাসে সেই সমালোচকের এক নিন্দাজনক চিত্র রচনা করিয়া সে ক্রোধের শান্তি হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্রোধ (প্রক্ষোভ) ও সংগ্রাম (প্রবৃত্তি) অনেক সময় সহগামী হইলেও সে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন নহে। ভয় এবং পলায়ন সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। একথা সত্য যে বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে ভয়ের সঞ্চার

হয়, এবং তাহার ফলে প্রায়ই বিপদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টাও দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে ইহা পলায়ন প্রবৃত্তিটির অংশ মনে হয়। কিন্তু ভয়ের প্রভাবে কোনও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তাও আসিতে পারে, যেমন ভয়াক্রান্ত জন্তু মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়া মানুষ হয় ত নিরাপত্তা খুঁজিয়া লইল, কিন্তু ভয়ের অনুভূতি কিছুই সে সময়ে হইল না, ভয় আসিল ঘটনাটির পরে।

এই সমস্ত কথা হইতে বুঝা যায় যে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনই পরিবর্ত্তনশীল। কারণ ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রাণীর সাড়া (response) শুধু প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভের একক ক্রিয়ার দ্বারাও উদ্ভূত হইতে পারে, আবার উভয়ের সংযুক্ত ক্রিয়ার দ্বারাও হইতে পারে। প্রাণীর জীবনে প্রক্ষোভের স্থান কোথায়, তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সঙ্কট মূহূর্ত্তে প্রবল প্রক্ষোভ উদ্রিক্ত হইল, ইহার ফলে দেহে অতি প্রয়োজনীয় অন্তঃক্ষরণ (internal secretion) হয়, যেমন য়্যাড্রিনালিন (adrenalin) ক্ষরিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পেশীর শক্তি ও নৈপুণ্য বাড়াইয়া দেয়।

যাঁহারা জীবদ্দশায় বিশ্বব্যাপী মহাসমর দেখিয়াছেন, প্রক্ষোভের প্রভাব যে কি অপরিসীম হইতে পারে, তাহার অধিক উদাহরণ তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইবে না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুষ্কৃতি ও বিপদের সময়ে ছাড়া, স্বাভাবিক কালেও উহার চরম গুরুত্ব আছে। যেমন, ক্রোধ প্রক্ষোভের উত্তেজনা বাড়িয়া আবার নিবিয়া গেল, কিন্তু ইহারই ফলে এমন এক আচরণ-ধারার সৃষ্টি হইতে পারে যাহার অস্তিত্ব ও পরিণতি বহু বৎসর চলিবে। এক পরোপকারী মহাত্মার জীবনীতে এইরূপ দেখা যায়। অসহায়ের প্রতি করুণা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু বালক বয়সে একটি ঘটনা না ঘটিলে তাঁহার জীবনের মহৎ পরোপকার কার্য্য হয় ত কখনও সম্পাদিত হইত না। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় একবার তিনি এক নিঃস্ব ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অতি শোচনীয় ব্যবস্থা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। এই প্রেরণাই তাঁহার মহত্ত্বকে স্ফূরিত করিল। শুধু এইরূপ বিশেষ মুহূর্ত্তে নয়, সব সময়েই প্রক্ষোভসমূহ আমাদের জীবনের, বিশেষতঃ সামাজিক জীবনের আনন্দ ও

আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এই কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সৌন্দর্য্যবোধ বিকাশের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কাব্য ও সঙ্গীত, উপন্যাস ও নাটক, কারুশিল্প ইত্যাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলে মানবের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। ফলে আমাদের অনুভূতির মধ্যে যা কিছু আদিম বর্ব্বরতা আছে, তাহারও সংশোধন হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রহিয়াছে। যেমন গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বিস্ময়, সার্থক আত্মভাব ইত্যাদি প্রক্ষোভের সহায়তা লইতে হয়।

শিক্ষকের কার্য্যের পক্ষে প্রবৃত্তিগুলিও বিশেষ সহায়ক। তিনি দেখিতে পাইবেন যে ছাত্রদের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুদের বিদ্যালাভে উৎসাহী করিতে হইলে যদি তিনি প্রবৃত্তিসমূহকে কাজে লাগান, তবে সুফলের সম্ভাবনা বেশী হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহল, সংগ্রহ, গঠন প্রভৃতি প্রবৃত্তির গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিমান শিশু মাত্রেরই অতি ছোট বয়স হইতেই তাহার নূতন দেখা জগৎটির নানা কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, ও তাহার অবিরাম জিজ্ঞাসায় আমরা তাহার পরিচয় পাই। তাহার এই জিজ্ঞাসাই হইল তাহার জ্ঞানলাভের মূল ভিত্তি। অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিও নানাভাবে তাহার শিক্ষার সহায়তা করে, কুশলী শিক্ষক সেগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবেন ও শিক্ষায় সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন। তাহা ছাড়া, কোনও শিক্ষার্থী যদি সহজভাবে কোনও প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া অনুসরণ করিতে থাকে, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। যদি আবশ্যক হয়, তবে উদ্গতি (sublimation) দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিজাত উদ্দাম ক্রিয়াকলাপের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে উহাদের আদিম ও পশুধর্মী লক্ষ্য হইতে ফিরাইয়া ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কোনও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার নামই উদ্গতি। শিশুকে মানুষ করার কার্য্যে ইহার অশেষ সার্থকতা আছে। যেমন উদ্গতির সাহায্যে কৌতূহল প্রবৃত্তিকে অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছনীয় বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিজ্ঞানের বিস্ময় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহে রূপান্তরিত করা যায়। তেমনই উদ্দাম আসঙ্গ প্রবৃত্তির উদ্গতি সাধন করিয়া সুদুর্লভ সামাজিক গুণে

পরিণত করা যায়। অভিজ্ঞ ও নিপুণ শিক্ষকের পক্ষে আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইবে না।

এই প্রসঙ্গের আলোচনা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে ইহার সহিত এ গ্রন্থের মূল যুক্তিটির সম্পর্ক কি তাহা সংক্ষেপে বিচার করা প্রয়োজন। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই আলোচনা হইতে কেহ যেন একথা না মনে করেন যে প্রবৃত্তিগুলির পৃথক অস্তিত্ব আছে ; আর যেমন চক্র ও অন্যান্য অংশগুলির সংযোগ করিয়া দিলেই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, মানুষের আত্মভাবও তেমনই পৃথক কতকগুলি প্রবৃত্তির সমবায়ে গঠিত। আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবের স্থান প্রথম, তারপর আসে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিসমূহ জীবের আত্মসাম্মুখ্যের বিশেষ পন্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রাণীজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এগুলিরও পরিণতি ঘটিয়া ক্রমে নির্দ্দিষ্ট রূপ আসিয়াছে, তাহার কারণ পৃথক ও জাতিগত ভাবে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদা রহিয়াছে। তবে প্রাণীজীবনে জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধারা কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, প্রবৃত্তিগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথা সত্য বটে, কিন্তু প্রাণীর সৃষ্টিমূলক ক্রিয়া প্রায়ই এমন পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে যাহা এই প্রবৃত্তি সমূহের নির্দ্দিষ্ট সীমার বহু উর্দ্ধে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আত্মভাবের পরিণতি

মানুষের যে সমস্ত শক্তি ও স্পৃহার কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সেগুলির বিকাশ ও সংযুক্ত ক্রিয়ার ফলে শৈশব হইতে তাহার আত্মভাব (self) কি ভাবে গড়িয়া উঠে তাহাই এখন দেখা যাইবে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

সাত বছর বয়সের একটি ছেলে প্রথম এক বড় সহরে বেড়াইতে গিয়া ট্রামগাড়ীতে চড়িয়াছে। গাড়ীর পরিচালক ও চালকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে তাহার কি অসীম আগ্রহ! ক্রমাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পিতাকে সে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরিয়া আহারও সমাধা হইল। এখন সে সারাদিনের ক্রিয়াকলাপগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে বসিল। ঘরটি হইল ট্রামগাড়ী, ঘরে উপস্থিত সকলেই যাত্রী। সেই হইল গাড়ীর পরিচালক, কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্গীর অভাবে গাড়ী চালাইবার ভারও তাহাকে নিজেই লইতে হইয়াছে। কোথা হইতে সে টিকিট রাখিবার জন্য এক ব্যাগ যোগাড় করিয়াছে, একটি ঘণ্টাও আসিয়াছে। মহা উৎসাহে সে ভাড়া লইতেছে, টিকিট দিতেছে, গাড়ী চালাইতেছে ও থামাইতেছে। ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে সামনে গিয়া সে ট্রাম লাইনের উপর ভিড় সরাইবার জন্য ঘণ্টা বাজাইয়াও আসিতেছে। এইরূপ অসীম ব্যস্ততার মধ্যে তাহার নিদ্রার সময় আসিল, সুতরাং বিস্তর আপত্তির মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়ান হইল।

এখন দুই তিন দিন ছেলেটি প্রধানতঃ ট্রামচালক রহিল। তারপরে ক্রমশঃ অন্যান্য ক্রিয়ার কথাও তাহার মনে আসিতে লাগিল। যেমন, ডাকহরকরা ব্যাগ হইতে চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে; ফেরীওয়ালা নানাবিধ জিনিষ বিক্রয় করিতেছে; গোয়ালা বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়া যাইতেছে; বা বৈমানিক মহাবেগে বহু দূরদেশে বিমান চালাইতেছে। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ট্রামচালক

হইয়া উঠিল ডাকহরকরা, ফেরীওয়ালা, গোয়ালা, বৈমানিক এবং এমনই আরও অনেক কিছু।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এই সুপরিচিত কাহিনীর সম্পর্ক কি, তাহাই এখন দেখা যাক। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে যে এক সুনির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তির ক্রিয়ায় ইহার স্চনা হইয়াছে, তাহা কৌতূহলপ্রবৃত্তি। কিন্তু ট্রামচালক, বৈমানিক, এ সমস্ত ছেলেটির কাছে মুহূর্ত্তের সামান্য আকর্ষণরূপে আসে না। এগুলির এমন দৃঢ় প্রভাব আছে, যাহার ফলে নূতন অবস্থা অনুসারে নিজের জীবনকে পরিবর্ত্তন করা শিশু একান্ত আবশ্যক মনে করে। সুতরাং এই নূতন অবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়ারূপে শিশুর এই সমস্ত খেলার উৎপত্তি। এগুলি তাহার আচরণের সার্থকরূপ, ইহাদের মূলে সার্থক আত্মানুভূতি (positive self-feeling) রহিয়াছে। বিশেষ সাফল্যের মুহূর্ত্তে এই ভাবটি বিজয়োল্লাসেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উঠে।

আমাদের ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে যতক্ষণ ছেলেটির আত্মানুভূতি (self-feeling) ট্রামচালনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ততক্ষণ তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভমূলক প্রেরণাগুলিও ঐ কর্ম্মের পোষকতা করিবে। সংগ্রহ প্রবৃত্তির ক্রিয়া ট্রাম টিকিট সংগ্রহে দেখা যাইবে। গঠন-প্রবৃত্তির সাহায্যে যখন যেটি প্রয়োজন তৈয়ারী করিয়া লইবার পরীক্ষা চলিবে। কাজে কেহ ব্যাঘাত ঘটাইলেই ক্রোধ দেখা দিবে। এইভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে।

এই ধরণের খেলাকে বলা যায় পরীক্ষামূলক আত্মগঠন। প্রকৃত আত্মগঠনের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ফল স্থায়ী নহে। যে পর্য্যন্ত মনভুলান বিশ্বাসের (make-belive) বয়স থাকে, ততদিন আমাদের আত্মসাম্মুখ্যও ঘূর্ণনশীল কম্পাসের কাঁটার ন্যায় একবার এদিকে, একবার ওদিকে চালিত হয়। উপরের ছেলেটি সাত বছর বয়সে সব রকম কাজই করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোনটিই স্থায়ী হয় নাই। বছর বার পরে হয়ত দেখা যাইবে যে সে সাফল্যের সহিত ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। ট্রাম পরিচালক বা গোয়ালার কার্য্যে তাহার আসক্তি বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অন্য সঙ্গীরা বিমান বহর বা শিক্ষাবৃত্তিতে খ্যাতি অর্জ্জন করুক, তাহাতেও তাহার আপত্তি

নাই। তাহার আত্মসাম্মুখ্য তাহার স্বকীয় বৃত্তিতেই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই সর্ব্বদা সে ইহাতে লাগিয়া আছে। কিন্তু ছেলেটির আত্মগঠনের এই যে পরীক্ষা, প্রথমে সাত বছর বয়সে এবং এখন কুড়ি বছরে, ইহার মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, এখন ইহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য একই রহিয়াছে; তাহা এই যে তাহার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজীবনের সমুদয় শক্তি তাহার আত্ম-সাম্মুখ্য যে দিকে চলিতেছে, সেই দিকেই নিয়োজিত হইতেছে। কৌতূহল ও গঠনপ্রবৃত্তি সম্ভূত যাবতীয় ক্রিয়া প্রধানতঃ এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যটির পোষকতা করে; এগুলি ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রায়োগিক নৈপুণ্যে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া সংগ্রহপ্রবৃত্তি, ক্রোধ, হিংসা ও আর সমস্ত মুখ্য ও গৌণ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ দ্বারা চালিত ক্রিয়াসমূহও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির পরিণতির সহায়তা করে।

এই আত্মভাবের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ হইতে উদ্ভূত সমগ্র কর্ম্মশক্তি এক দৃঢ় এষণাশৃঙ্খলায় (hormic system) সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তখন মানুষের উপর ইহার পূর্ণ আধিপত্য বিদ্যমান। অথবা বলা যায় যে সমুদয় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মমূলক স্বভাব বা স্পৃহাকে কেন্দ্র করিয়া মনের মধ্যে এক বিরাট রেখাসমন্বয় (engram-complex) গঠিত হইয়াছে। মনের অন্য রেখাসমন্বয়ের ন্যায় আত্মভাবও (self-complex) পরিবর্ত্তনশীল, নিশ্চল নহে, একথা মনে রাখিতে হইবে। ইহাই হইল মানুষের ব্যক্তিতার অনেকটা স্থায়ী ভিত্তি। তাহার অনুভূতি ও ক্রিয়ার সংযুক্ত শৃঙ্খলার মধ্যে ইহার ব্যঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ইহার নিজেরই ক্রিয়ার প্রভাবে ইহার মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এবং ক্রমাগত সম্বদ্ধতাবিধানের (consolidation) ফলে ইহার গঠনে সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতা আসিতেছে, সুতরাং ইহার অভিব্যঞ্জকতাও (expressiveness) বৃদ্ধি পাইতেছে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

নিপুণ জীবনীকারের অন্তর্দৃষ্টিতে বা কুশলী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মানুষের

মনের এই রেখাসমন্বয়েরই পরিণতি ও ক্রিয়াকলাপের চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। ইহার সকল জটিলতার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তথাপি মনোবিৎ শ্যাণ্ডের (Shand) বিশ্লেষণটি এক্ষেত্রে অনুসরণ করিলে সুবিধা হইবে। তিনি বলেন যে ইহার মধ্যে বিশেষ ধরণের কতকগুলি বৃহৎ অথচ গৌণ রেখাসমন্বয় রহিয়াছে, উহাদের ক্রিয়ার নাম তিনি দিয়াছেন রস (sentiment)। শ্যাণ্ড কি বিশেষ অর্থে কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝা আবশ্যক। যে ছোট ছেলেটি ট্রাম পরিচালক হইয়াছিল, তাহার কথা আবার মনে করিলে দেখা যাইবে, কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের সমস্ত ভাব ঐ একটি জিনিষের অনুসরণে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার সে মনোভাব সাময়িক না হইয়া যদি স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বলা যাইত যে ছেলেটির আত্মভাবের অংশরূপে ট্রাম-পরিচালকের বৃত্তির রস (অনুরাগ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে রস অনেকগুলি অনুভূতি, অর্থাৎ প্রক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের সমষ্টি, পৃথক একটি অনুভূতিমাত্র নহে ; এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ইহা সংগঠিত হয়, এবং ইহার মধ্যে খানিকটা স্থায়িত্ব থাকে।

রসের এক সহজ দৃষ্টান্ত হইল ধূমপানের আনন্দ। এই অভ্যাসের মূলে যে দৈহিক ক্ষুধা আছে, তাহার উৎপত্তির কথা হয়ত মনঃসমীক্ষকই বলিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিম্নস্তরের ক্ষুধার উপরে এমন এক প্রক্ষোভশৃঙ্খলা রহিয়াছে, যাহার ফলে তুচ্ছ শারীরিক ব্যাপার হইতে ইহার মধ্যে সামাজিক কৃত্যের মর্য্যাদা আসিয়াছে। ধূমপানের সুযোগটির জন্য মানুষ সাগ্রহে বসিয়া থাকে ; প্রয়োজনের সময়ে তামাক দিয়াশালাই না থাকিলে বিরক্ত হয় ; ধূম-পানের আনন্দটি দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে ; নানাবিধ তামাক সম্বন্ধে উৎসাহে মতামত জ্ঞাপন করে। কখনও পরিতৃপ্তির আনন্দ আসে, পরে যথাকালে আকাঙ্ক্ষার পুনরাবির্ভাব হয়। এ আনন্দের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়া গিয়াছেন, পাঠকমাত্রেই তাহার সহিত পরিচিত আছেন। এ সবই প্রকৃত রসের লক্ষণ। বেশভূষা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের যে মনোভাব সাধারণতঃ দেখা যায়, উহার সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইবে। সামান্য দৈহিক প্রয়োজনে এই রসের উৎপত্তি হইলেও বহুসংখ্যক প্রক্ষোভ ইহার পোষকতা করে। এবং ইহার প্রভাবে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও কলানৈপুণ্যের অনুশীলন হইয়া থাকে।

পরিচ্ছদের অত্যধিক পারিপাট্য স্থলবিশেষে হয়ত মন্দ হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত বেশের যে বিশিষ্ট মূল্য আছে, নিন্দুক ছাড়া কেহই সে কথা অস্বীকার করিবেন না। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যসাধনে ও সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকের বেশভূষার প্রতি অনুরাগের গুরুত্ব কতখানি, তাহা আমরা সকলেই জানি।

উপরে বর্ণিত দুইটি রসই অনুরাগসূচক—ধূমপান ও বেশভূষার প্রতি অনুরাগ। ইহাতে শ্যাণ্ডের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, অনুরাগ একটি প্রক্ষোভমাত্র নহে, বহুবিধ প্রক্ষোভের সমষ্টি। অনুরাগের বস্তুটি সম্পর্কে বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী এ প্রক্ষোভ-সমূহের কোনটির উদয় হয়, একটি অপরটিকে সরাইয়া তাহার স্থান অধিকার করে, কোনটি বা চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে, এইরূপ ক্রিয়া চলে। অনুরাগের বিপরীত হইল ঘৃণা। ইহাকেও রস বলা যায়। আর প্রথমে অদ্ভুত শুনাইলেও একটি কথা আমরা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব যে ইহার মধ্যে যে সমস্ত প্রক্ষোভের ক্রিয়া আছে, সেগুলি সবই অনুরাগের মধ্যেও বর্ত্তমান। কোনও জিনিষকে ভালবাসার ন্যায়, কোনও জিনিষকে ঘৃণা করার মধ্যেও, আনন্দ (উহার অনুপস্থিতিতে), বিরক্তি (উহার উপস্থিতিতে), পরিতাপ, আশ্বাস, আশা, নিরাশা, এ সকলেরই অনুভূতি বর্ত্তমান। অনুভূতি-গুলি এক, উহাদের কারণই বিভিন্ন। কোনও বস্তুর প্রতি অনুরাগের ফলে উহার সান্নিধ্যে আমরা আনন্দ পাই, উহার সহিত পূর্ণতর নবতর পরিচয় স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হই। পক্ষান্তরে ঘৃণার বস্তু আমাদের বিরক্তির কারণ হয়, আমরা উহাকে ধ্বংস করিতে চাই বা অন্ততঃ উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে চাই।

কোন্ জিনিষটির প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকিবে, কোন্‌টিকেই বা ঘৃণা করিব, শিক্ষাই আমাদের সে জ্ঞান আনিয়া দিবে। এ ধারণাটি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার মধ্যে গভীর সত্যতা রহিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে যদি আমরা মনে করি যে অনুরাগ ও ঘৃণার গুরুত্ব সমান, তবে বড় ভুল হইবে। অনুরাগের প্রভাবে আমরা প্রিয় বস্তুটির ভাল গুণ খুঁজিয়া বাহির করি, উহার উৎকর্ষ সাধন করি। সুতরাং ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিতে থাকে। কিন্তু ঘৃণার উদ্দেশ্য অপ্রিয় বস্তুটির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, সুতরাং

ইহার পরিণাম ধ্বংসাত্মক। ঘৃণার সার্থকতা তখনই মাত্র দেখা যায় যে ক্ষেত্রে ইহা কোনও বিষয়ের প্রতি অনুরাগের পোষকতায় প্রযুক্ত হয়। সে সময়ে যাহা কিছু ঐ অনুরাগের পথে বিঘ্ন ঘটায় অথবা উহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তাহা দূর করাই উহার কার্য্য। যেমন, তথাকথিত যে দেশভক্তি শুধু অপর জাতির প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা বড় নিকৃষ্ট ও নিষ্ফল। কিন্তু প্রকৃত দেশ-ভক্তির মহৎ প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন আমরা স্বদেশের কলঙ্কজনক ক্রিয়াসমূহ ঘৃণা করি, উহাতে দেশের সম্মান সুরক্ষিত হয়। তেমনই আরও ক্ষুদ্র এক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, সকল রকমের পাণ্ডিত্যের প্রতি অনুরাগের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইল, অনবধানতা ও ভুলত্রুটির প্রতি ঘৃণা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অনুরাগ বৃদ্ধি করা বিদ্যালয়শিক্ষার মুখ্য কর্ত্তব্য। আর ঘৃণার সহায়তা লইতে হইবে, বাগানের মালী যেমন অস্ত্র দিয়া আগাছা কাটে, কেবল সেইভাবে। উদ্যানে আগাছা জন্মিলে তাহা বৃক্ষের রস টানিয়া লয়, উহার সৌন্দর্য্য নাশ করে, সেজন্য মালী সেগুলিকে কাটিয়া ফেলে। তেমনই যে সমস্ত নিকৃষ্ট বস্তু বা ভাব উচ্চতম আদর্শের পক্ষে হানিকর, সেগুলির প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াই তাহাদের কাজে লাগাইতে হইবে। উপরন্তু ইহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কোনও বিষয় অধ্যাপনার প্রথম কথাই এই যে, বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃঢ় অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইবে। সেজন্য বিষয়টি এমন চিত্তাকর্ষকরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে যেন শিক্ষার্থী এক আনন্দকর কার্য্যের অনুশীলনে আকৃষ্ট হয়। যদি এই ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা যায় এবং চালাইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কোনও দুরূহ বিষয় আয়ত্ত করিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক যে নীরস পরিশ্রম, তাহা বাদ দিবারও প্রয়োজন হয় না; আমরা জানি যে প্রকৃত অনুরাগের পথ সমতল নয়, হইতেও পারে না। কারণ, বাধা, নৈরাশ্য ও প্রতীক্ষার ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই এক মহৎ অনুরাগরসে পরিণত হইতে সক্ষম হয়। আবার এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাহিরে কোনও ক্রিয়াই ছাত্রের মনে অনুরাগ সঞ্চার করিতে পারিবে না, যদি না সেটি তাহার কোনও প্রবল সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে সাড়া না জাগায়; আর মধ্যে মধ্যে যদি বিফলতার দুঃখের প্রতিষেধক রূপে অল্প স্বল্প সাফল্যও না ঘটে, তবে সে ক্রিয়াটির প্রতি

আগ্রহ স্থায়ী হইবে না। কোনও অভ্যাস বা খেলার সখ গড়িয়া তোলার বেলায় এ কথাটি কেমন খাটে, তাহা ম্যাক্‌ডুগাল সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। অন্যান্য উচ্চতর আগ্রহের ব্যাপারেও ইহার সত্যতা সমরূপ।

এক্ষণে আবার সেই ছেলেটির কাহিনীর সূত্র ধরিয়া তাহার মানসিক বিকাশের বিবরণটি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

অতি ক্ষুদ্র শিশুর মানসিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা যায় না। অবশ্য মনঃসমীক্ষকগণ বলেন যে উহাদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ এবং তাহার প্রতীকমূলক তাৎপর্য্য (symbolism) নির্ণয় করিয়া শিশুপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কথা তাঁহারা জানিতে পারেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ঠিক যে ভাবে জন্তুদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ এবং উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হয়, শিশুর বেলায়ও মাত্র তাহাই করা সম্ভব। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রথম কয়েক মাস বয়সের মধ্যেই মানুষের আত্মভাবের অতি শক্তিমান একটি অংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, মানুষের আদিম দৈহিক ক্ষুধাসমূহকে বা শারীরিক ক্রিয়াবলীর আনন্দ ও বেদনাগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে রসসমষ্টি গঠিত হয়, তাহাই হইল এই অংশটি। মনঃসমীক্ষকগণের মতে শৈশবের এই সকল রসের প্রথম সূচনা যে ভাবে হয়, তাহার বিপুল প্রভাব পরবর্ত্তী জীবনে বর্ত্তমান থাকে। কারণ ছেলেটির প্রকৃতি অনুগত হইবে অথবা দুর্দ্দমনীয় হইবে, বহির্বৃত (extravert) অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইবে কিংবা অন্তর্বৃত (introvert) অর্থাৎ মূলতঃ নিজের অনুভূতি ও চিন্তাতেই কেন্দ্রীভূত থাকিবে, সে সবই উক্ত প্রভাব দ্বারা অনেকখানি নির্ণীত হয়। এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত করা ছাড়া মনোবিকাশ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের সমস্ত উক্তির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিয়া কোনও লাভ নাই। অধিকাংশ লোকেই এগুলিকে আংশিক সত্যরূপে গণ্য করে। তবে ফ্রয়েডের মতবাদ আমরা এটুকু অন্ততঃ নিঃসন্দেহে মানিতে পারি যে মাতাপিতার সহিত প্রথম সংস্পর্শে এবং খানিকটা ভ্রাতাভগিনীদেরও সংস্পর্শের ফলে শিশুর মনে যে সব রেখাসমন্বয় গঠিত হইবে, উহার ভাল ও মন্দ উভয় প্রভাব তাহার ভবিষ্যৎ আচরণে দেখা যাইবে। জীবনের নবতর পরিবেশেও তাহার ক্রিয়াকলাপে এই অতি শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলিরই ছাপ থাকিবে। তাহার কারণ পাওয়া যায় শ্যাণ্ডের উক্তিতে। তিনি

বলিয়াছেন যে প্রবল রস মাত্রেই আমাদের মনে উহার নিজস্ব গুণগুলির সৃষ্টি করে, সেগুলির আবার অনুরূপ নূতন রসসমূহে পুনরাবির্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। যেমন ছেলেটির শৈশবে তাহার বাড়ীর বিড়াল কুকুরের প্রতি যেরূপ মনোভাব দেখা যাইবে. ভবিষ্যতে অধীনস্থ লোকেদের প্রতি তাহার ব্যবহারও সেই ধরণের হইবে। কিংবা সেগুলি যদি নিজরূপে প্রকাশ না পায়, হয়ত প্রতীক রূপে (symbolically) অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে দেখা দিবে; বা এমন অন্য কোনও নিদর্শন থাকিবে যদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে উহা অন্ধকার নির্জ্ঞানে (unconscious) ক্রিয়া করিতেছে। তেমনই ছেলেটি বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ায় অনুরাগী হওয়ার ফলে ধৈর্য্য সহকারে ও নির্ভুলভাবে কাজ করিবার আদর্শটি তাহার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, উহাই আবার তাহার ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যে সাফল্যলাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

মনে করা যাক যে এ ছেলেটির মাতাপিতা বুদ্ধিমান্ লোক। কিন্তু যেখানে মাতাপিতার বুদ্ধি বা সুযোগের অভাব ঘটে, সেরূপ ক্ষেত্রে শৈশবে পারিবারিক সম্পর্কের যে সমস্ত ত্রুটি থাকে, তাহার ফলে শিশুর চরিত্রে বহুবিধ দুর্ব্বলতা বা বিকৃতি আসিতে পারে। এগুলি আজীবন তাহার কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। আদুরে ছেলের কথা আমরা জানি, তাহার লক্ষণনির্ণয় করিবার জন্য মনঃ-সমীক্ষণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাল্যে শিশুপালনের অন্য জটিল রকমের ত্রুটিও আছে, যাহার ফলে বহু দুঃখ অনিষ্ট ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের গুরুতর বাধা হইতে পারে। যে ছেলে বিদ্যালয়ে অনবরত দুষ্টামি করে, সে যে পাপপ্রকৃতিবশতঃই সেরূপ করিতেছে, তাহা নহে। হয়ত সে মাতৃস্নেহ পায় নাই, তাই ঐ ভাবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে আনিয়া তাহার হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। সে জন্য শাস্তির যন্ত্রণাও হয় ত সে সহ্য করিতেছে। এইরূপ কারণে ক্রমাগত হিংসা ও অযথা আক্রোশের উৎপত্তি হইতে পারে, উহার বশে (পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত মেয়েটির মত) অনেকেই মন্দপথে চালিত হয়। অনেক সময়ে মাতাপিতা বা তৎস্থানীয় কোনও ব্যক্তির প্রতি, যেমন কোনও শিক্ষক বা বন্ধুর প্রতি এক অস্বাভাবিক সংবন্ধন (fixation) হয়, অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রীতি ও নির্ভরশীলতার ভাব হয়। ইহার ফলে, বয়সের উপযোগী সহচরদের সহিত স্বাভাবিক বন্ধুত্বের

সম্পর্ক গঠন, বা তেমন তেমন ক্ষেত্রে নিজস্ব ইচ্ছা প্রয়োগ করা অবধি কঠিন হইয়া উঠে ; ছেলে বরাবর আত্মনির্ভরতাহীন 'খোকা' থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ শিশুর বড় হওয়ার ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে সহজ বা নির্ব্বিঘ্ন নহে। মাতাপিতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব এই সম্পর্কে অতি গুরুতর। সুতরাং এই বয়সে যে সমস্ত অসুবিধা ও সঙ্কট ঘটিতে পারে, সেগুলির কথা তাঁহাদের ভালরূপে জানিয়া লইতে হইবে। এবং এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছোটদের নিজের পায়ে ভর দিয়া ঠিকভাবে দাঁড়াইতে শিখানই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিলে তাহাদের অত্যন্তই অপকার করা হইবে।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ছেলেটির জন্মের পর প্রথম কয় মাস, প্রথম ও পরবর্ত্তী বাল্যকাল, শৈশব, বালকবয়স ও কৈশোর (adolescence) এবং তৎপরে পরিণত বয়সে পদার্পণ করার মধ্যে কয়েকটি সুস্পষ্ট অংশ বা পর্য্যায় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি অবস্থারই স্বকীয় দৈহিক ও মানসিক লক্ষণসমূহ আছে। কোনও কোনও মনোবিৎ বলিয়াছেন যে, এই অবস্থাগুলি তরঙ্গের আকারে একটির পরে একটি আসে, অর্থাৎ, প্রত্যেকবার খানিকটা বৃদ্ধির পরই বৃদ্ধির পরিমাণ খানিকটা হ্রাস হয়। এবং প্রত্যেকটি অবস্থার পর এক একটি বিরতি আসে। কিন্তু মানুষের বৃদ্ধি সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এই অভিমত ভ্রান্ত বিবেচিত হইয়াছে। এখন দেখা যায় যে এই ক্রমোন্নতি যে এক বাঁধা নিয়মে সব ক্ষেত্রে বাড়ে ও কমে তাহা নহে, মোটের উপর স্থির গতিতেই বৃদ্ধি চলে। এ কথা সত্য যে দ্রুত খানিকটা বৃদ্ধির পরে কিছুকাল হয়ত বৃদ্ধি মন্দগতিতে চলিতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্ত্তন বিভিন্ন ছেলেমেয়ের বিভিন্ন বয়সে হইয়া থাকে, এবং বাহ্য বা অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত কারণই ইহার মূলে থাকে, কোনও সাধারণ নিয়ম এখানে খাটে না। তবে এই পরিবর্ত্তনের ফলে শিশুর ক্রমবিকাশে কোনও বৈচিত্র্য বা সঙ্কটও দেখা দিতে পারে। মনোবিৎ ষ্টার্ণ (Stern) তাঁহার শিশুকন্যার কথা বলিতে শেখার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সে পনের মাস বয়সে পনেরটি শব্দ শিখিল। তাহার পর কয়েক মাস বিশেষ কোনও উন্নতি দেখা গেল না। কিন্তু শিশুটির

উনিশ মাস বয়সে তাহার মাতাপিতার এই অভিমত ছিল যে ভিতরে ভিতরে তাহার কথার জ্ঞান বাড়িতেছে, হঠাৎ একদিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সে আশা পূর্ণ হইল, কারণ পঁচিশ মাস বয়সে সে একেবারে পঞ্চাশটি শব্দ সর্ব্বপ্রথম বলিল। সকল বয়সেই যে কোনও কাজ বা বিদ্যা সম্পর্কে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে। শিক্ষাপ্রণালীর দিক হইতে এগুলির যথেষ্ট প্রাধান্য রহিয়াছে, ষ্টার্ণও সে কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। অতি পরিণত মনের বেলায়ও এমন একটী কাল আসে, যে সময়ে পূর্ব্ব ক্রিয়াগুলির সন্নিবদ্ধতা সাধিত হয়, আরও উন্নতির চেষ্টাও চলিতে থাকে।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেটির যাবতীয় অভাব বাড়ীতেই মিটিল। মাতার যত্ন, পিতার রক্ষণ ও সাহায্য সে পাইল। তাহার আনন্দের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই সে অবাধে গ্রহণ করিল। আর নিজের এই আনন্দ বিধানের পন্থারূপে তাহার গুরুজনদের কাজে লাগাইতেও তাহার কোনও দ্বিধা জাগিল না। কিন্তু তাহার মাতাপিতা আধুনিক তন্ত্রের লোক। তাই তাহার বয়স যখন দুই বৎসর হইল, তখন তাঁহারা নিকটস্থ এক সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত শিশুবিদ্যালয়ে (Nursery School) প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য তাহাকে পাঠান স্থির করিলেন। এখানে যে সুন্দর শৃঙ্খলা ও শিক্ষাপ্রদ ক্রিয়াকলাপের উন্নত ও বৃহত্তর বন্দোবস্তের সুযোগ শিশুরা পায়, বাড়ীতে তেমন ব্যবস্থা করা খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব। মেলামেশা করিতে তাহারা শিখে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে খেলাধূলার মধ্য দিয়াই যে শুধু এই শিক্ষা হয়, তাহা নহে, প্রতিদিনকার নানা কার্য্য, যেমন ভোজনব্যবস্থায় সাহায্য করা, বিদ্যালয়গৃহ সজ্জিত করা ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও সে শিক্ষা চলে। শিশুবিদ্যালয়ে অত ছোট শিশুরা পড়া লেখা, অঙ্ক, এ সব করে না, না করাই বিধেয়। তবে মৌখিক ভাষায় ভাব প্রকাশ করার শিক্ষা আপনা হইতেই হয়, ইহারও প্রাধান্য কম নহে। তাহা ছাড়া নানাবিধ খেলাধূলা ও খেলনার ব্যবস্থা আছে। একাকী এবং সমবেতভাবে খেলা হয়। তাহাতে কল্পনা ও আবিষ্কারের স্থান রহিয়াছে। আবার দৌড়াদৌড়ি, নৃত্য, উঁচুতে উঠা, ইত্যাদি শরীরচর্চ্চারও সুযোগ আছে। এই বয়সে নিয়মিত পাঠদান অপেক্ষা এই সমস্ত উপায়েই শিশু বেশী শিখে। তাহা ছাড়া শিশুর

বিদ্যালয়ের ও বাড়ীর মধ্যে এক অযথা ব্যবধান থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। এই দুইটি প্রভাবের মধ্যে যাহাতে সংযোগ স্থাপিত হয়, সে চেষ্টা ভাল বিদ্যালয়-মাত্রেই করা হয়। সেজন্য তাঁহারা শিশুর মাতাপিতাকে বিদ্যালয়ে আসিবার জন্য উৎসাহ দেন। এখানে শিক্ষয়িত্রীর সহিত শিশুর পরিণতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেটি বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগে (Infants' Department) আসিল, সেখান হইতে সাত বৎসর বয়সে সে যথারীতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Primary বা Junior School) ভর্ত্তি হইল। এই বিদ্যালয়েই তাহার শৈশবের সাত হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত কাটিবে। এ বিষয়েও ছেলেটির মাতাপিতার ভাগ্য ভাল। কাছেই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আছে, তাহার বাড়িটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর, সেখানে ব্যায়াম ও উন্মুক্ত স্থানে খেলাধুলার সুব্যবস্থা আছে। ইহার পরিচালনায় বুদ্ধিবিবেচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিক্ষকগণও সুশিক্ষিত এবং কার্য্যে যথার্থ আগ্রহশীল। বিদ্যালয়টির ছাত্রদের পরিচ্ছন্নতা, আচরণ ও কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সুতরাং ছেলেটির মাতাপিতাও বেশ নিশ্চিন্ত আছেন যে এমন বিদ্যালয়ে পাঠাইলে তাহার স্বাস্থ্য, আচরণ, নীতিজ্ঞান অথবা তাঁহাদের সম্ভ্রম, সবই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ছেলেটি এখন বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে শিখিয়াছে, তাহার জানা যে কোনও বিষয়ে নিজ মতামত স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। সে পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে, আর নিজে নিজেও বহু সহজ বই সখ করিয়া পড়ে; অঙ্কশিক্ষাও তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা যে বিষয়গুলির সাহায্যে সাধিত হইবে, সেগুলি তাহার মোটামুটি আয়ত্ত হইয়াছে। আবার যে পরিবেশে তাহার শিক্ষার আরম্ভ, উহাতে ফ্রেবেল (Froebel) এবং মন্টিসরির (Montessori) প্রভাব যথেষ্ট আছে, এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়। এজন্য অন্যান্য ভাল বিষয়েও ছেলেটির রুচি ও শিক্ষা হইয়াছে; সে গান শিখিয়াছে, যে সমস্ত শিল্পে গঠন নৈপুণ্যের সাধারণ বিকাশ হয়, সেগুলির শিক্ষাও সে পাইয়াছে। তাহার ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সে প্রথম শৈশবের মত অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নহে, এখন নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিতেছে।

এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া, প্রথমটা একটু ভয়ে ভয়ে কাটিলেও খুব শীঘ্রই সে পূরা মাত্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার আত্মপ্রসাদ ও মর্য্যাদা লাভ করে। বাড়ীর যে সর্ব্বময় গুরুত্ব তাহার কাছে পূর্ব্বে ছিল, তাহা এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন গৃহ তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ের বৃহত্তর জীবনের আনন্দময় সহচরগুলির সহিত মিলিয়া নানা চিত্তাকর্ষক ক্রিয়ার মধ্যে একটু অবকাশ লইবার স্থানমাত্র। ছেলেটি বুদ্ধিমান ও ধীর, তাই বিদ্যালয়ে তাহার শৈশবের মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনের যাহা কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ সে গ্রহণ করে। এই বয়সের এমন কতকগুলি প্রয়োজন ও সংস্কার রহিয়াছে, যেগুলি প্রথম শৈশবের বা পরবর্ত্তী কৈশোরের অবস্থা হইতে বিভিন্ন, যদিও এগুলির উৎপত্তি প্রথম শৈশবে এবং পরিণতি কৈশোরকালে হয়। এই অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। উহাতে শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার মধ্যে মানুষের প্রধান শক্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইবে এবং সভ্য জীবনের মূল বৃত্তিগুলি তাহার মনে জাগাইতে হইবে। তাহার শক্তি, প্রেরণা ও প্রক্ষোভসমূহ যাহাতে সে ক্রমশঃ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সে দিকে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কারণ ইহাই নৈতিক ও মানসিক শৃঙ্খলার প্রাণবস্তু। যাহাতে সে নিজের কর্ত্তব্যের মান বাড়াইয়া তুলিতে ও উহারই পথ অনুসরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। আর এমনভাবে তাহার কল্পনা ও সহানুভূতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে, যাহাতে সে জীবনে ও আচরণে চিরদিন সুমহান আদর্শের অনুগামী হইতে পারে। উক্ত বালকটির বিদ্যালয় যদি এই সমস্ত কার্য্য করিতে পারে ত এ কথা বলা যাইবে যে উহার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

অধ্যাপক পিয়াজে (Piaget) শিশুদের সম্পর্কে কতকগুলি সুন্দর পরীক্ষা করিয়াছেন। এই বয়সের ছেলেরা যে সমস্ত ধারণা মতামত পোষণ করে, এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে অতি সুচিন্তিত ও সতর্ক প্রশ্ন দ্বারা তাহাই তিনি নির্ণয় করার চেষ্টা করিয়াছেন। যে ধারণাগুলি তাহাদের নিজস্ব, বড়দের কাছে শেখা নয়, সেইগুলি বাহির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার এ পরীক্ষার ফল বড় বিস্ময়কর। উহাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমান সভ্য ও বৈজ্ঞানিক জগতেও

বালকদের মনোভাব অনেকটা আদিম মানবের মত। কোনও বস্তু এবং ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য বেশী বয়সে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, শৈশবে সে জ্ঞান খুবই অল্প থাকে। শিশু মনে করে যে আমরা মাথা, মুখ, কান ইত্যাদির দ্বারা চিন্তা করি। বস্তুসমূহের নাম ও গুণ তাহার কাছে গোলমাল হইয়া যায়, যেমন, তাহার ধারণা এই যে, সূর্য্যকে দেখিয়া উহা যে উজ্জ্বল, এই কথা সে যেমন জানে, উহার নাম যে 'সূর্য্য', তাহাও সে তেমনই ভাবে জানে। আদিম মানুষের মত সে স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে। আবার তাহাদের মত শিশুও মনে ভাবে যে অচেতন বস্তুসমূহেরও প্রাণ আছে। নৃতত্ত্ববিৎ (anthropologist) এই বিশ্বাসকে বলেন সর্ব্বপ্রাণবাদ (animism)। তাহার এই আদিম ধারণা আছে যে টেবিল বা জানালার মত জগতের প্রত্যেক জিনিষই কৃত্রিমভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছে। আদিম জাতিগণের মত সে বিশ্বাস করে যে, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাহার নিজের এক ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, আর তেমনই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এরূপ পরস্পর যোগাযোগ বর্ত্তমান। এই বিশ্বাসই হইতেছে ইন্দ্রজালের (magic) ভিত্তি। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যেই এরূপ ঐন্দ্রজালিকের মনোভাব দেখা যায়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক এডমাণ্ড গসের (Edmund Gosse) বাল্য অভিজ্ঞতা হইতে ইহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন যে বাল্যে তাঁহার চেষ্টা ছিল যে এমন এক যাদুমন্ত্র বা ক্রিয়া আবিষ্কার করিবেন, যাহার সাহায্যে তাঁহার পিতার পুস্তকের ছবির পাখী ও প্রজাপতিগুলি পাতা হইতে উড়িয়া যাইবে।

শিশুর মনে যে কাণ্ডজ্ঞান, বাস্তববোধ ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারই পাশাপাশি এইসব অদ্ভুত ধারণা কিরূপে স্থান পায়, তাহা প্রথমটা দুর্ব্বোধ্য ঠেকিবে। ইহার কারণ এই যে মানুষের মনের গঠন সমান (homogeneous) নহে। প্রাচীন অট্টালিকাতে যেমন নানা যুগের এবং পদ্ধতির বিচিত্র গঠনসমাবেশ দেখা যায়, মনেরও অবস্থা সেইরূপ। অর্থাৎ মানসিকতার (mentality) বহু স্তর আছে, আমাদের মন বিভিন্ন সময়ে সহজেই এক স্তর হইতে আর এক স্তরে যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহাকে আমরা চতুর ব্যবসায়ী বলিয়া জানি, তিনিও কখনও আধুনিক মনোভাব হইতে

অসভ্য জাতির মনোভাবে চলিয়া যান, সে সময় হয়ত শুভ অশুভ লক্ষণের সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়, বা রাস্তার জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনাকেও তিনি বেশ গুরুত্ব দেন। তেমনই আবার আদিম মনোবৃত্তির মানুষ হয়ত কুসংস্কারে আস্থাশীল, অথচ মোটরগাড়ীর কলকব্জা সম্বন্ধেও তাহার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখা যায়। উপরে যে ছেলেটির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মন সমগ্রভাবে তাড়াতাড়ি আধুনিকতার স্তরে যাইবে, কারণ বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে আধুনিক সভ্যতার সংস্কার তাহাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া আছে।

ছেলেটির বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তাহার প্রথম শৈশবের প্রধান পার্থক্যটি ফ্রয়েডের ভাষায় এইভাবে বলা যায়। প্রথমে তাহার মনে যে ভাবটির প্রাধান্য ছিল, তাহার নাম সুখদুঃখনীতি (pleasure-pain principle), এখন তাহার স্থানে হইয়াছে বাস্তবনীতি (reality principle)। এই প্রভেদ ইতিপূর্ব্বে খেলার সম্পর্কেও দেখা গিয়াছে (সপ্তম অধ্যায়)। উহাতে আমরা দেখিয়াছি যে শিশুর ক্রিয়ার প্রথম বিকাশ হয় এক স্বপ্নের রাজ্যে, সেখানে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পায় এবং পরে বাস্তব অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য সাধন হইয়া থাকে। তবে এই দুইটি নীতির কথা বলিলে যে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি প্রেরণা বুঝায়, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে। প্রথম ভাবটিই দ্বিতীয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন উহার অন্ধ প্রবৃত্তিগত প্রেরণাগুলির মধ্যে বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ম্যাক্‌ডুগাল প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই অনুসারেই ইহা ঘটে। তাহা হইলেও ফ্রয়েডের বর্ণিত এই দুইটি মনোভাবের পরস্পর দ্বন্দ্বও অতীব সত্য ও গুরুতর ব্যাপার। বার বছরের ছেলে মূলতঃ বাস্তবধর্ম্মী ; সে জগতের, প্রধানতঃ তাহার সামাজিক আবেষ্টনের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে। কিন্তু প্রায়ই তাহার এমন অবনতির অবস্থা আসিতে পারে যে তাহার স্বাভাবিক আচরণের মূলে যে গূঢ়েষাগুলি থাকে, সেগুলি সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। সুতরাং তাহার প্রেরণাসমূহও শৈশবের ন্যায় সহজ পন্থায় পরিতৃপ্তি চাহে। এই জন্য খুব ভাল ছেলেমেয়েদেরও কখনও হঠাৎ ‘বদমেজাজ’, স্বার্থপরতা বা অন্যরূপ অন্যায়াচরণ দেখা যায়।

কিন্তু এই সাধারণ প্রভেদ ছাড়া এক বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট প্রেরণারও এই সময়ে উন্মেষ হয়। সেটি হইতেছে আসঙ্গলিপ্সা, দলে মিশিবার প্রবৃত্তি ; ইহাই সকল সামাজিক আচারের মূলাধার। অন্য সমুদয় প্রবৃত্তির ন্যায় আসঙ্গলিপ্সাও এক সরল শৃঙ্খলাবিহীন প্রেরণারূপে উদ্ভূত হইয়া অতি উচ্চ স্তরের বুদ্ধিগত আচরণে পরিণত হয়। দশ বছরের ছেলের আসঙ্গপ্রবৃত্তি থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে সামাজিক জীব বলা চলে না। বিশ্বজগৎ তখনও তাহার কাছে রহস্যময়, সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য অপরের সহায়তা ও সাহায্য তাহার চাই। অসভ্য জাতিদের যেমন শিকারের দল থাকে, প্রত্যেককেই হয় নেতা নয় অধীনস্থ শিকারী হইয়া থাকিতে হয়, তাহার অবস্থাও সেইরূপ। উচ্চতর স্তরের সামাজিক জীবন এই বয়সে থাকে না, উহার আরম্ভ হয় তাহার বৃদ্ধির সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে বা কৈশোরে।

এই প্রবৃত্তির বিকাশে আমরা ম্যাকডুগালের সাধারণ নিয়মটির খুব সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। সামাজিক কথাটির মার্জ্জিত অর্থটি অনুসরণ করিয়া যদি আমরা এই আসঙ্গলিপ্সা প্রবৃত্তিকে সমাজসঙ্গত আচরণের সহজাত প্রেরণা মনে করি, তবে ভুল হইবে। প্রথমে এই প্রেরণার ভাল মন্দ কোনও বোধ থাকে না, শুধু শিশু সক্রিয়ভাবে নিজ জীবনকে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য উন্মুখ হয়। এ সম্পর্কটি কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা নির্ভর করে এই প্রবৃত্তির পরবর্ত্তী পরিণতির উপর, প্রবৃত্তিটির মূলগত নির্দ্দিষ্ট কোনও গুণের উপরে নহে। যেমন এরকম লোকও আছেন যাঁহাদের আসঙ্গলিপ্সা খুবই প্রবল, তাই ঝগড়া করিবার সঙ্গী না থাকিলে তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়! তবে একথা সত্য যে শিশু বুঝিতে পারে যে অপরের সাহচর্য্যে যদি তাহাকে সদাসর্ব্বদা থাকিতে হয়, তবে নিজের ক্রিয়াকলাপ উহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়াই তাহাকে চলিতে হইবে, তাহাদের রীতিনীতি তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের সরল নীতির পরই শিশু বিশেষরূপে শিক্ষা করে দলগত নীতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার আচরণে দলের প্রভাব অতি শক্তিশালী হইতে দেখা যায়। কৈশোরের সূচনায় এই দলগত প্রেরণার পরিবর্ত্তন ঘটে। পূর্ব্বে দলের রীতিনীতি বিনা যুক্তিতে সে মূলতঃ মানিয়া লইত, তাহার স্থলে এখন সুস্পষ্ট সামাজিক চেতনার

(social consciousness) সঞ্চার হয়, উহার মধ্যে আসল নৈতিকতা ও ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান থাকে। কৈশোরে সমাজসেবা বা পরার্থপরতার আদর্শের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ দেখা যায়। এই বয়সে ছেলেরা আপন সমাজের সুখবর্দ্ধন বা নৈতিক উৎকর্ষসাধন করিবার আন্তরিক চেষ্টা করে। এমন কি, যদি সে দেখিতে পায় যে তাহার এই নবলব্ধ আদর্শের সহিত তাহার দলের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, তাহা হইলে সে উহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতেও দ্বিধা করে না, এবং নিজ পছন্দ অনুযায়ী জীবিত বা মৃত অন্য মহাপ্রাণ মানুষের সে অনুগামী হয়।

সুতরাং আসঙ্গলিপ্সা দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট সামাজিক জীবনই সকল মানুষের প্রথম নৈতিক শিক্ষার মূল। সাধারণতঃ লোকে ইহাতে যে আচারপদ্ধতি শিক্ষা করে, তাহা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের দৃঢ় স্থায়িত্ব ও কল্যাণের পরিপোষক। কিন্তু বিভিন্ন মানব সমাজ নানা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও একরূপ নহে। তাই সেগুলির নৈতিক বিধানেও বহু পার্থক্য দেখা গিয়াছে এবং এখনও দেখা যায়। একই সামাজিক সমষ্টির জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে এমন সুস্পষ্ট ও স্থায়ী প্রভেদ থাকিতে পারে যে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাতেও বিপুল বৈষম্য থাকে। আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিৎ ভেব্লেনের (Veblen) মতে আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যেও এরূপ এক নীতিগত বিভেদ রহিয়াছে। জাতিসমূহ যখন অসভ্য অবস্থায় ছিল তখন ইহার উৎপত্তি হয়। অসভ্য মানব, শাসন, যুদ্ধ, শিকার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া নিজের হাতে রাখিত, আর নীচ ও সাধারণ কার্য্য স্ত্রীলোকদের ভাগে পড়িত। দাসত্বপ্রথার উৎপত্তি হওয়ার পর এ প্রভেদ আর স্ত্রী ও পুরুষের ব্যাপার রহিল না, তখন দাসেরাই নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। কিন্তু বর্ত্তমানকালেও এ পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। সমাজের এক দিকে আছে অবসরভোগী মানুষ। অপর দিকে রহিয়াছে নিম্নতরশ্রেণীর লোক, তাহাদের দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়। অবশ্য ঠিক এক্ষণে আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, তাহাতে এই অবসরভোগী শ্রেণী যে একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

যে শিক্ষক মনে করেন যে শিক্ষার্থীর চরিত্রই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয়,

তিনি হয়ত এই সব কথা চিন্তা করিয়া একটু হতবুদ্ধি হইবেন। তিনি জানেন যে মানুষ যে বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ও কার্য্য করে, উহারই নৈতিক বিধান তাহার ক্রিয়াতে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাও তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে এই সামাজিক ব্যবস্থা ইতিহাসে বহুবার অনেক বদল হইয়াছে, আর বাস্তবিক বর্ত্তমানেও তাহার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে নৈতিক শাসনের নিজস্ব মূল্য কি দাঁড়াইবে? ইহা কি স্থান, কাল ও অবস্থা অনুযায়ী সুবিধামত গড়িয়া লওয়া আচারপদ্ধতি মাত্র, না তাহার চেয়ে অধিক কিছু ইহার মধ্যে রহিয়াছে? ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিধান আছে বলিলে কি মিথ্যা বলা হয়? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হইল এই যে, জ্ঞান ও শিল্পজগতে যেমন, নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও তেমনই, মনুষ্যসমাজ সময়ে সময়ে সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছন দিকে চলিয়াছে, অনেক সময়ে উহা পথও হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মনীষী মহাপুরুষগণ এই তিনটি বিষয়েই যে বিপুল উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি এমনই দৃঢ় ও স্থায়ী, যে উহা বেশীক্ষণ স্থানচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না। যেমন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মূল্য চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মানুষের কোনও স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষার সহিত দ্বন্দ্ব বাধিলে ইহাকে বিধাতার কঠোর নির্দ্দেশ বলিয়া মনে হইবে বটে; কিন্তু ইহাকে আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনরূপে ধরিলে ইহা আমাদের এক সতর্ক অথচ সদয় সুহৃদ ও উপদেষ্টার মত। তেমনই, সব মানুষকে আপন জ্ঞানে ভালবাসাই মহত্তম সামাজিক বিধি বলিয়া গণ্য হইবে, আর নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি ঔদাসীন্য, ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়ের পক্ষেই পরম অনিষ্টকর মনে করিয়া এগুলি হইতে আমাদের মুক্ত রাখিতে হইবে। এই সকল নীতি ও জ্ঞানের চিরন্তন সত্যতা ও সুমহান্ মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না, তবে অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই মূল্য বিভিন্ন আকারে দেখা যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোকে মুখে যেরূপ নীতিবাদই প্রচার করুক না কেন, তাহাদের কার্য্যকলাপে যে নৈতিক ধারাটি আসলে প্রকাশ পায়, তাহা উহারা যে বাস্তব সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকে ও ক্রিয়া করে, তাহারই প্রভাব হইতে উদ্ভূত হয়। শিক্ষার দিক হইতে এই কথাটির তাৎপর্য্য এখন লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমেই বুঝা যায় যে, বিদ্যালয়ের জীবনে

অবাঞ্ছিত ও অন্যায় যাহা কিছু থাকে, বিদ্যালয়ের সামাজিক অবস্থার রূপটি না বদলাইলে, কেবল নৈতিক উপদেশেই উহার সংশোধন হইতে পারে না। আর তাহা ছাড়া ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা যদি তাহাদের বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে না হয়, এবং আচরণগত যে সমস্যাগুলি তাহাদের অভিজ্ঞতায় আসে, সেগুলির সমাধানে সাহায্য না করে, তবে সে নীতিশিক্ষার কোনও মূল্য নাই। সুতরাং বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ সংস্কারসমূহের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে নিজ শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। আবার শিক্ষককে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি নিজে যে নৈতিক বিধান মানেন ও শিক্ষা দিতে চান, তাহার উপরও অবশ্যই কোনও বিশেষ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রভাব বর্ত্তমান। সুতরাং উহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা তাঁহার অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। ইহা যে শ্রেণী বা জাতিবিশেষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিপ্রসূত নহে, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের উদারতা উহাতে আছে, পূর্ব্বে সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই নিঃসংশয় হওয়া আবশ্যক।

আমরা বলিয়াছি যে কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সামাজিক প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কৈশোরসমস্যা সম্বন্ধে চিরদিনই সকলের সুগভীর আগ্রহ দেখা যায়। পূর্ব্বকালের মনোবিদ্‌গণ এবং বহু ঔপন্যাসিকও ইহার বহুবিধ তথ্য ও বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষক আর্ণেষ্ট জোন্‌স্ (Ernest Jones) দেখাইয়াছেন যে নবমনোবিদ্যায় এ সম্পর্কে অতি গুরুতর নূতন তথ্য রহিয়াছে। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, কৈশোর বয়সের অর্থাৎ আন্দাজ বার বৎসর হইতে পূর্ণ নরনারীর বয়সে পৌঁছান পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের প্রক্ষোভজীবনের বিকাশের সহিত, জন্ম হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী বিকাশের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় যেমন প্রথম শৈশব হইতে পরবর্ত্তী শৈশবাবস্থার আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয় বারেও তেমনই কৈশোরের চাঞ্চল্য ও উদ্দামতার পরে পূর্ণ বয়সের শান্তভাবটি আসে। সুতরাং বাহ্য প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও কৈশোর ও প্রথম শৈশবের গভীর সাদৃশ্য আছে। শিশু পাঁচ বছর বয়সের পূর্ব্বে যে সব সমস্যা সম্মুখে দেখিয়াছিল ও সমাধান করিয়াছিল, সেগুলিই আবার উচ্চতর স্তরে বার ও আঠার বছর বয়সের মধ্যে দেখা যায়। যেমন আত্মসংযমের সমস্যা। ইহার সহিত অল্পবয়সের কত

কর্ত্তব্য ও অসুবিধা জড়িত আছে। প্রথম শৈশবে যেমন প্রথমেই দৈহিক ক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল, কারণ ভদ্র মনুষ্যসমাজে প্রবেশলাভের পক্ষে উহাই প্রধান প্রয়োজন, তেমনই কৈশোরেও যে সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিল, তাহা বলিলে ভুল হয় না। তারপর শিশু আত্মানুরাগের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়া অবাধে নিঃস্বার্থভাবে অন্য মানুষদের প্রতি আগ্রহশীল হয়। আত্মকেন্দ্রীয় স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া সে বাস্তব জগতের সম্মুখীন হয়। এ সকল সমস্যাই পুনরায় কিশোরেরও আসে। তবে তাহাদের রূপ আরও পরিণত ও জটিল। আর এইগুলির সমাধান সে ভাগ্যগুণে বা নিজ সুবুদ্ধির বলে, সংজ্ঞানে বা নির্জ্ঞাত অবদমনের ক্রিয়ায়, যে ভাবে করিবে, তাহারই উপর, সে নিজ চরিত্রে কেমন গুণাগুণ লইয়া পরিণত বয়সে পদার্পণ করিবে, তাহা অনেকখানি নির্ভর করে।

আমাদের কাহিনীভুক্ত বালকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া এক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে সেও এখন এই মহাসন্ধিস্থলে, দেহ ও মনের এই নবজীবনের সূচনার মুখে পৌঁছিয়াছে। ইহার প্রাথমিক লক্ষণগুলি দু এক বছর আগে হইতেই দেখা গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে লম্বা হইয়া গিয়াছে, শৈশবের গোলগাল ভাবটি চলিয়া গিয়াছে। তাহার চড়া গলার জন্য সঙ্গীতে সুকণ্ঠ বলিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল, গলার সে স্বরও খারাপ হইয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে তাহার অধ্যয়নের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বেকার সখগুলি সে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন সে একটু চিন্তামগ্ন ও অবাধ্য হইয়াছে ; এক কথায়, তাহার অবস্থা যেন বিভ্রান্ত। কিন্তু ষোল বছরে সে আগেকার সেই শিশুটি নাই বটে, তথাপি সে দ্রুত এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইতেছে। এখন নিজের চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাহার অদ্ভুত মনোযোগ হইয়াছে, আর তাহার চালচলন সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিলে সে রাগ করে। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র নূতন এক চেতনা জাগিয়াছে। লেখাপড়ার দিকে, প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য সময় থাকিতেই সে উদ্যোগী হইয়াছে, আর এখন মহা উৎসাহে গণিত ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে ; সে জানে যে এইভাবে তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তির ভিত্তি গঠিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের খেলাধূলায়ও

সমান উৎসাহ দেখাইয়া সে প্রশংসা পাইয়াছে, সুতরাং শুধু 'বই মুখস্থ করা' ছেলে বলিয়া দুর্ণাম তাহাকে পাইতে হয় নাই। তাহার মনের কথা সে এখন আগেকার মত সকলের কাছে বলে না। যাহাদের সে সুযোগ আছে, তাহারা জানে যে তাহার মনেও বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছেলেটি এখন দুইটি অসীমের সন্ধান পাইয়াছে, প্রকৃতির অসীমতা ও তাহার নিজের আত্মার অসীমতা। শৈশবের যে স্বপ্নময় দৃষ্টি যথেচ্ছভাবে বাহ্য জগতের ব্যাপার লইয়া খেলা করিত, তাহার স্থানে এখন যে কল্পনার আবির্ভাব হইয়াছে, উহা জগতের গূঢ় তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিতে উৎসুক।

এইগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ছেলেটির মনে নূতন রসের (sentiments) আবির্ভাব হইতেছে; পুরাতন রসগুলির লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং বিস্তার ও গভীরতা বাড়িতেছে। এগুলির মধ্যে অবশ্য শৈশবের রসগুলির অন্তর্ভুক্ত বহু গুণ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সময়ে অবদমন (repression) এবং উদ্গতির (sublimation) ক্রিয়া যথেষ্ট চলিয়াছে। সুতরাং পুরাতন গুণগুলি এমন নবরূপ ধারণ করিয়াছে যে উহার ফলে ছেলেটির চরিত্রেও নূতনত্ব আসিয়াছে।

এই বৰ্দ্ধিত মানসিক গঠনের মধ্যে, ম্যাক্‌ডুগাল কথিত আত্মশ্রদ্ধার (self-regard) কথা বিশেষরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন। শৈশবে আমাদের রসসমূহ পশুরই মত বস্তুগত (objective) থাকে। লোভী কুকুর যেমন বড় হাড়ের টুকরাটি লইতে ছুটে, ছোট ছেলেও তেমনই মিষ্টান্নের মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে লইবার জন্য হাত বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করিবে না। ছোট মেয়ে নূতন সুন্দর জামাটি পরিয়া ময়ূর যেমন পেখমের বাহার দেখায়, ঠিক তেমনই নিজ সার্থক আত্মানুভূতি (positive self-feeling) চরিতার্থ করিবে। পূর্ণ বয়সেও এমন বস্তুগত দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। মানুষ কখনও কখনও তাহার ক্রিয়ার সম্মুখস্থ লক্ষ্যটিতে এতদূর মগ্ন থাকে যে আর সব কিছুই সে ভুলিয়া যাইতে পারে। তথাপি পশু হইতে মানুষের পার্থক্যই এই যে, অল্প বয়সেই সে বুঝিতে পারে যে জীবনের নাট্যে অভিনেতা হইয়া তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আর ইহাতে সে আনন্দ পায়। অতি শৈশবেই শিশু দেখে যে তাহার সুখ ও দুঃখের অনুভূতি তাহার দেহের সঙ্গে জড়িত, সেই জন্য সে নিজের

শরীর ও অন্য সব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে, আর সম্ভবতঃ উহারই ফলে তাহার আত্মচেতনার (self-consciousness) উন্মেষ হয়। ক্রমশঃ এই ভাবটি তাহার দেহ ছাড়াইয়া পোষাক খেলনা, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি বিস্তৃত হয় ; পরে নিজ গৃহ, মোটরগাড়ী, স্বহস্তে গঠিত ব্যবসায়, এবং আরও সব কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কারণ, এ সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে তাহার যে কেবল প্রত্যক্ষভাবে এইগুলির প্রতি প্রযুক্ত রসসমূহের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে ; তাহার অনুভূতি ও ক্রিয়াকে এই সমস্ত জিনিষের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত করিয়া অপর এক গৌণ আত্মশ্রদ্ধার রসও সৃষ্ট হয়। এক কথায় জগতের সহিত সম্পর্কে এইগুলিই তাহার প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে। এবং ইহার হ্রাসবৃদ্ধির ফলেই, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, আশা ইত্যাদি অনুভূতিগুলি জাগ্রত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধরূপে এক একটি রসে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে সে অপরের সম্পর্কে আসার ফলে নিজেকে কর্ত্তারূপে বিবেচনা করিতে এবং নিজ ক্রিয়ার দোষগুণের কথা ভাবিতে শিখে। মাতাপিতা ও শিক্ষকদের সুখ্যাতি ও নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি, বিদ্যালয়ের সমপাঠীদের নিরপেক্ষ এবং নির্ম্মম সমালোচনা, এবং পরে পূর্ণ বয়সে বন্ধুবর্গের সংযত কিন্তু প্রবল মতামত, এ সমস্তও যথাসময়ে আসে। ইহার ফলে নিজেকে বিবেচনা করিয়া তাহার নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়, সেইগুলিই তাহার আত্মশ্রদ্ধার শক্তিশালী অংশ হইয়া থাকে।

এইভাবে সুস্থ কিশোর মাত্রেরই মনে, তাহার নিজের বা আত্মভাবের সম্বন্ধে 'আদর্শ ব্যক্তি' হিসাবে একটি ধারণা বেশ সুস্পষ্ট আকারে গড়িয়া উঠে। সে নিজে কি, এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, সে ধারণাও খানিকটা হয়। এ আদর্শ শুধু এইটুকুই হইতে পারে যে আমার আচরণ সর্ব্বদা শিষ্টাচার সম্মত হইবে ; অথবা শিক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন দ্বারা আমি নূতন কীর্ত্তি এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত করিব। এ আদর্শ তাহার আত্মশ্রদ্ধার অংশ। এইভাবে সৃষ্ট আত্মশ্রদ্ধাই এখন তাহার জীবনের সমস্ত ব্যাপারে, বিশেষতঃ সঙ্কটের সময়ে, প্রবল ও প্রধান প্রেরণার উৎস হইয়া থাকে।

আমরা দেখিতে পাইব যে আত্মভাবের মূলে যে বস্তুগত রস আছে, উহাদের নিয়ন্ত্রণ করাই আত্মশ্রদ্ধার কার্য্য। মনে করা যাক যে এক অর্থ-

লোভী ব্যক্তির এমন সুযোগ উপস্থিত হইল যে সে অসদুপায়ে অথচ বিপদের বিনা আশঙ্কায় বহু টাকা পাইতে পারে। অন্ধ অভ্যাসগত সততার গুণে সে হয়ত অটল থাকিবে। কিন্তু উহা যদি যথেষ্ট প্রবল না হয়, তবু তাহার আত্মশ্রদ্ধার মধ্যে এতখানি শক্তি সঞ্চিত থাকিতে পারে, যাহার গুণে সে অর্থলাভ সম্পর্কিত রসটির প্রেরণাকে জয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষটি তাহার মানস দৃষ্টি সম্মুখস্থ লাভের বিষয়টি হইতে ফিরাইয়া নিজের উপর স্থাপিত করিল ও নিজেকে এই হীন কার্য্যের কর্ত্তারূপে বিবেচনা করিল। নিজের কথা বিবেচনা করার সময়ে তাহার মনে আসিল যে অতীতে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া তাহাকে কত লজ্জা ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হয়ত এগুলি কতদূর ভোগ করিতে হইবে। ফলে তাহার আত্মশ্রদ্ধা হইতে এমনই ঘৃণার উদয় হইল যে তাহার প্রভাবে সে যে এরূপ দুষ্কৃতির কর্ত্তা হইতে পারে, এ চিন্তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আত্মশ্রদ্ধাই হইল আমাদের বিবেক ও উহার অনুবর্ত্তী নীতিবোধের বাহন। বিবেকের গঠনে আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান কতখানি, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আত্মশ্রদ্ধা ইহা ব্যতীত আরও একটি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, উহারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমাদের আত্মসাম্মুখ্য যখন যে পথে সার্থকতা চায়, তখন আমাদের আত্ম-শ্রদ্ধাই উহাকে সেই দিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ বিষয়ে উইলিয়াম জেমস এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমার মনোভাব এমন হইতে পারে যে আমি মনোবিৎ হওয়ার জন্য উপস্থিত সমস্তই পণ করিতে পারি, অন্য কেহ এ বিদ্যায় আমার চেয়ে অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে মর্ম্মাহত হইব। কিন্তু গ্রীক ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকিলেও আমার কোন ক্ষোভ নাই। তাহার কারণ আমার নিজের মনোবিৎ হইবার আদর্শের সহিত আমার আত্মশ্রদ্ধা দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এক কথায় মানুষের আত্মসাম্মুখ্যকে অভিপ্রেত পথে চালিত করাই আত্মশ্রদ্ধার কার্য্য।

অবশ্য এই ক্রিয়াটিকে খুব সরল মনে করিলে বড়ই ভুল হইবে। আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে আত্মভাবের গঠন অতি জটিল। উহার বিকাশ বহুমুখী হইয়া থাকে, এবং কোনও কোনও অংশ শেষ পর্য্যন্ত খাপছাড়া হইয়া

পড়ে। কোনও গুণবান সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হয়ত এক বিশেষ আদর্শের অনুগামী হইলেন। তদনুযায়ী নিজ আত্মভাব তিনি গঠন করিলেন। স্বাস্থ্য, আত্মীয়, বন্ধু, ধনসম্পদ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এ সমস্তই তিনি ভালবাসেন, ও এসবের উপযুক্ত সমন্বয়ে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্র আত্মভাব গঠিত হইল। কিন্তু সবল চরিত্রের লোককেও নিজ আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়; আর দুর্ব্বলমতি মানুষ ত শুধু স্রোতে ভাসিয়া চলে, দৃঢ় আত্মভাবের গঠনই তাহার হয় না। সাধারণ মানুষ সচরাচর বাস্তব অবস্থার সহিত এক আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লয়। তাহার মধ্যে কয়েকটি পৃথক ও সুস্পষ্ট আত্মভাব সক্রিয় হইয়া উঠে, আর উহাদের মধ্যে খানিকটা দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষও সাধারণতঃ চলিতে থাকে। যেমন বলা যায় যে সেই ছেলেটির চল্লিশ বছর বয়স হইলে সে শুধু উৎসাহী ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারমাত্র থাকিবে না। আমরা মনে করিতে পারি যে সে এখন নিজের পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, পত্নীর প্রয়োজন সমূহের এবং ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার যথেষ্ট আছে; পল্লীর সে এক বিশিষ্ট অধিবাসী, সমাজসেবা ও নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ ও খ্যাতি রহিয়াছে। উপরন্তু দাবা বা ব্রিজ খেলারও তাহার খুব সখ, প্রায়ই সে খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া থাকে। তাহার জীবনের এই বিভিন্ন অংশ লইয়া যে পৃথক আত্মভাবগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি একসঙ্গে অনুসরণ করিতে গিয়া মাঝে মাঝে তাহার বিভ্রম ও দ্বন্দ্বও ঘটিতে পারে। না ঘটিলে তাহার অসাধারণ সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

সুতরাং প্রকৃতিস্থ মানুষের বেলায়ও আত্মশ্রদ্ধা যেভাবে মূল রসগুলির বিকাশ ও সংগঠন কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে, সে ক্রিয়া সম্পূর্ণ নহে। ইহার মধ্যে কতকটা দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে। আর যে ক্ষেত্রে মানসিক বিকৃতি বা ব্যাধির অবস্থা ঘটে, সেখানে কতকগুলি রস এমন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে মূল আত্মশ্রদ্ধাটি যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সে মানুষের যথার্থই একাধিক আত্মভাব গড়িয়া উঠে। এইভাবে বহুব্যক্তিত্বের (multiple personality) উদ্ভব হয়। ইহারই একটি বিখ্যাত বহু পর্য্যালোচিত উদাহরণ মর্টন প্রিন্স (Morton Prince) দিয়াছেন। সেটি এক বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ছাত্রীর কাহিনী, তাহার নৈতিক জীবনে কোনও নিদারুণ আঘাতের ফলে শক্তিমান এক নূতন ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি হইয়াছিল, উহার মনগড়া আর একটি নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে সে কখনও কখনও নিজের আসল সুসভ্য রূপটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বেয়াড়া ছোট মেয়েতে পরিণত হইত ও সেই অবস্থায় বহু অস্থিরতা ও খামখেয়ালীর পরিচয় দিত। পরে এইগুলির কথা জানিতে পারিয়া সে নিজেই স্তব্ধ হইয়া উঠিত।

যে ছেলেটির কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া মনোবিদ্যার নানা তত্ত্বের আলোচনা করা গেল, তাহার জীবনে এরূপ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই! এই তথ্যগুলির অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হইতে এই কথাই প্রবলরূপে সমর্থিত হয় যে, মানুষের আত্মভাব ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সংগঠিত ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সব ঘটনার বিবরণে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জ্ঞান ও ক্রিয়া

জীবের আত্মসাম্মুখ্যের বাহন তিনটি; অনুভূতি (feeling), জ্ঞান (cognition) এবং ক্রিয়া (conation)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আত্মভাবের (self) বিকাশ প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ও অনুভূতির দিক হইতে দেখান গিয়াছে। কারণ এইগুলি এক হিসাবে চরিত্রের ভিত্তি। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়ে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করা পাঠকের এখন প্রয়োজন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে অনুভূতিসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যেমন রসের সৃষ্টি হয় ও রসগুলির সাহায্যে আত্মভাবের গঠন হয়, তেমনই উহার সঙ্গে সঙ্গেই, অনুভূতি যে সব জিনিষে সাড়া দেয় ও যে সমস্ত ক্রিয়া চালিত করে, সেগুলিরও পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। বস্তুতঃ ইহা ব্যতিরেকে প্রথম ক্রিয়াটি ঘটিতেই পারে না।

জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক। শিক্ষায় এই কথাটি মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, জ্ঞান ও ক্রিয়া এক স্বাভাবিক সংযুক্ত রূপে দেখা দেয়, আর উভয়ের একটিকে নষ্ট না করিয়া অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সহজ ক্রিয়াতে এ সম্পর্কটি যেখানে বাহ্যতঃ দৃষ্টিগোচর নয়, সেখানেও অতি সহজে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, আমরা জানি যে কোনও বস্তু বা চিত্রের রূপটি মন দিয়া লক্ষ্য করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যরূপে মস্তক ও চক্ষু অনবরত নড়িবে, দর্শনেন্দ্রিয়ের পেশীগুলিরও সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। আবার পাঠক যদি হাঁ করিয়া ঠোঁট দুটি পৃথক রাখিয়া 'প্রান্তর', বা 'বক্তৃতা' এই ধরণের শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করেন, ত ঠোঁট ও জিভ নাড়িবার যেন এক দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারিবেন। তিনি আরও দেখিবেন যে উচ্চারণ যন্ত্রের অনুরূপ ক্রিয়ার অনুভূতিটি মনে জাগাইয়া না তুলিলে মনে মনেও এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি কয়েক ছত্র লিখিতে লিখিতে লক্ষ্য করেন যে সেই সময়ে মনের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়া চলিতেছে, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে লেখার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরে স্বগত উক্তিও

চলিতেছে, অর্থাৎ কথাগুলি মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হইতেছে। ইহাও দেখিবেন যে কোনও বানান সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে, তবে 'মনের চক্ষুতে' পলকের জন্য সেই শব্দের চিত্রটি ভাসিয়া উঠিবে। এইরূপ কোনও কথা বা সুরের আওয়াজটি যে মনের মধ্যে নিঃশব্দে ধ্বনিত হয়, তাহাকে বলা হয় শ্রাবণ প্রতিরূপ (auditory image), এবং অনুপস্থিত বস্তুর মানসিক চিত্রের নাম দার্শন প্রতিরূপ (visual image)। এই উভয়বিধ প্রতিরূপ মনের মধ্যে গঠন করা এবং উহার ব্যবহার করা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তির বহু তারতম্য দেখা যায়। কেহ কেহ, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চিন্তায় প্রধানতঃ কথা ও সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দার্শন প্রতিরূপ গঠন করিতে বিশেষ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ সকল স্বাভাবিক বালক বালিকার মনে দার্শন ও শ্রাবণ উভয় প্রতিরূপই সক্রিয় থাকে। বেশী বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহা অভ্যাস অনুশীলনের ফলেই ঘটিয়া থাকে। যখন কল্পনায় কোনও এক শারীরিক চেষ্টার অনুভূতি জাগাইয়া তোলা যায়, যেমন হাতটি পাশে রাখিয়া ভাবা যায় হাতটি উপরে উঠান হইতেছে, বা বসিয়া মনে করা যায় উঠিয়া দাঁড়ান যাইতেছে, এরূপ কল্পিত অনুভূতিকে বলা হয় চেষ্টা প্রতিরূপ (kinaesethetic image)। মুখ স্থির রাখিয়া শব্দ উচ্চারণ করিবার যে দৃষ্টান্ত একটু আগে দেওয়া হইয়াছে, সেও এই শ্রেণীভুক্ত। বহু শিশু এবং অল্পসংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তিদেরও আর একটি বিশেষ শক্তি দেখা যায়। তাহাদের দার্শন প্রতিরূপটি এত স্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব যে উহা স্মৃতিগত এক ভাসা ভাসা চিত্র না হইয়া আসল বস্তুটিরই সদৃশ। ইহাকে বলা যাইতে পারে সুপর্য্যবেক্ষণ প্রতিরূপ (eidetic image)। কোনও কোনও চিত্রকরের এই শক্তি অধিক থাকে। এমন দেখা যায় যে তিনি কোনও ব্যক্তিকে একবার সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার চিত্রটি আরম্ভ করেন, আর সেই একবারের পর্য্যবেক্ষণেই এমনভাবে তাঁহার চেহারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিয়া লন যে পরে আর তাঁহাকে সামনে না বসাইয়া শুধু নিজের মানসিক প্রতিরূপটির সাহায্যেই ছবি আঁকিয়া যাইতে পারেন।

উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াসমূহের বেলায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্পর্কটি এত সূক্ষ্ম

যে বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিলে ইহা চোখে পড়িবে না। কিন্তু যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিদর্শন সকল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা শিক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন শিক্ষার্থীকে বলা হয়, "মনে কর ক খ গ ত্রিভুজটিকে চ ছ জ ত্রিভুজটির উপর স্থাপন করা গেল," সে স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ক্রিয়া যথার্থ বাদ পড়ে নাই। যুক্তিদাতা বাস্তবরূপে ক্রিয়াটি করিয়া দেখাইতেছেন না বটে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই যুক্তিটির যৌক্তিকতা কেবল এই কারণেই আসিয়াছে যে বাল্যকাল হইতেই তিনি এইরূপ অসংখ্য ক্রিয়া করিয়াছেন, ও সেগুলির ফলের সহিত পরিচিত আছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। এটি বার্টের এক যুক্তি অভীক্ষা (Reasoning Test), দশ বছর বয়সের উপযুক্ত :—"আমি এক চৌমাথায় দাঁড়াইয়া আছি। আমি আসিয়াছি দক্ষিণ দিক হইতে, সহরে যাইতে চাই। ডান দিকের পথটি অন্য এক স্থানে গিয়াছে, সামনের পথটি এক ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া শেষ হইয়াছে। সহরটি কোন দিকে?" ইহার উত্তর 'পশ্চিম', পাঠক তাহা একাধিক উপায়ে নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি কল্পনা করিতে পারেন যে তিনি দক্ষিণদিক হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ডান বা পূর্ব্বদিকের পথটি অন্য স্থানে পৌঁছিয়াছে, সামনের বা উত্তরের পথও এক ক্ষেত্রে গিয়া মিলিয়াছে, অতএব এই দুইটিই বাদ গেল ও এইভাবে তিনি দেখিতে পাইলেন যে একমাত্র পশ্চিমের রাস্তাটিই বাকী থাকে। অথবা পাঠক এরূপ কল্পিত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে কল্পিত চিত্রের সাহায্য লইতে পারেন। কিংবা চারিটি দিকের কথা স্মরণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর দিক বাদ দিয়া দেখেন যে শুধু পশ্চিমদিকই বাকী রহিল। কিন্তু যে পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করুন না কেন, তিনি দেখিবেন যে বহু পরিচিত ক্রিয়ার উপরই তাঁহার যুক্তির সাফল্য নির্ভর করিতেছে। অসংখ্যবার এরূপ ক্রিয়ার ফলের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি এমন ক্রিয়া কল্পনায় যথাযথরূপে চালাইতে সক্ষম হন।

এই সকল কারণে ব্র্যাডলী (Bradley) এক অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, যুক্তি প্রয়োগ হইল, কল্পনায় সাধিত পরীক্ষাক্রিয়া (ideal experiment)। আমরা কল্পনায় ক্রিয়াটি করিতেছি, এবং তাহার ফল কি বিচার করিতেছি।

এমন কি চিন্তা যখন উচ্চ দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়, তখনও উহা ক্রিয়ার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে না। তাহার কারণ কথা হইতে চিন্তার উৎপত্তি, এবং অতি সূক্ষ্ম ভাব ব্যঞ্জক শব্দের মূলেও, মানসিক প্রতিরূপের ন্যায় কোনও দৈহিক ক্রিয়া বিদ্যমান। যেমন, বারো হইতে পাঁচ বিয়োগ করিলে সাত হয়, এই উক্তির অন্তর্গত ভাবটি দর্শনশাস্ত্রমূলক না হইলেও সূক্ষ্ম, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খুব ছোট ছেলে বা অত্যন্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তি ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এমন লোকের পক্ষে ইহা বুঝিতে হইলে বারোটি স্থূল বস্তু, যেমন পয়সা, গণিয়া লইতে হইবে, তাহার পর একটি একটি করিয়া পাঁচটি গণিয়া সরাইয়া, বাকী সাতটি গণনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে শুধু এইটুকু বলেন, 'বারো হইতে পাঁচ বাদ দিলে সাত হয়,' তাঁহার সে জ্ঞান এখনই হয় নাই। শিশু বা নির্ব্বোধের এখন যে অবস্থা, তাঁহাকেও সেই অবস্থা হইতেই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার এই উক্তিটি পূর্ব্ববর্ণিত গণনার অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াগুলিরই এক সহজ সংক্ষিপ্ত রূপ। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়ার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও উপরের ন্যায় কিছু সম্পর্ক থাকিবেই। এ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই আমরা উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, শিক্ষায় যে পুরাতন প্রবচন আছে, 'হাতে কলমে কাজ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে,' উহার ভিত্তি কি। উহার তাৎপর্য্য এই যে, বোধ এবং ক্রিয়ার মধ্যে এমন স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, উহাদের পৃথক করিলে ক্ষতি হইবে। বোধের দিকে এ ক্ষতির পরিমাণ অল্প নহে। এই সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। উচ্চ গণিত পরীক্ষায় সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ যখন তাঁহাদের অধীত সূত্রগুলির কার্য্যকরী প্রয়োগ শিখিবার জন্য পরীক্ষাগারে গিয়া দেখিলেন যে সূত্রগুলির সত্যতা হাতে কলমে প্রমাণিত হইতেছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইহার কারণ এই যে প্রভূত বুদ্ধি ও বিদ্যার অধিকারী হইলেও, ইঁহাদের শিক্ষা এতই সূক্ষ্ম ও বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন যে ইহার কার্য্যকরী প্রয়োগ সম্ভবপর হইতে পারে, সে ধারণাও তাঁহাদের

ছিল না। গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও ব্যবহারিক প্রয়োগ না শিখিলে গণিতের নিয়মগুলি অসার মনে হইবে। এই কারণে গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে, বিশেষতঃ প্রথম দিকে, হাতে কলমে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। যেখানে হাতে কলমে কাজ হইতে পারে না, সেখানেও ধারণা বা ভাবগুলি শুধু বাক্যগত যুক্তির সাহায্যে প্রকাশ না করিয়া, কাল্পনিক ক্রিয়ারূপে দেখাইতে হইবে। ইতিহাস শিক্ষায় নাটক অভিনয়ের পদ্ধতি বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ করিলে প্রত্যক্ষভাবেই উহা হাতে কলমে কাজের সমান হইবে। আবার ইতিহাস ও রাজনীতির তথ্যগুলি বর্ত্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে পরোক্ষভাবে তাহাও ব্যবহারিক প্রয়োগেরই মত, তবে সাধারণতঃ এরূপ পদ্ধতি অধিক বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষেই বেশী উপযোগী। কোনও বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক রাজনীতি ও শিল্পঘটিত সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বয়স্ক ছাত্রগণকে শিল্পকেন্দ্রে লইয়া যান। আর এক বিদ্যালয়ে স্থানীয় শ্রমিক সঙ্ঘের নেতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে বিতর্কসভায় (Debating Society) বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। যথোচিত বুদ্ধিসহকারে প্রয়োগ করিলে এরূপ পদ্ধতিতে রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। আর নীতিশিক্ষা যে স্বাভাবিক ও বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন, সে কথা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি। আবার আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষায় খেলার প্রেরণার প্রভূত গুরুত্ব আছে; সে যুক্তির সহিতও উপরের বিষয়টির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে।

পূর্ব্বে মনোবিদ্যায় শিখান হইত যে, ইন্দ্রিয়সমূহই (senses) সমস্ত উচ্চতর জ্ঞানের বাহন; বাহ্যজগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষ* জ্ঞানগত

* আমরা যখন কোনও বস্তু দেখি, শুনি, স্পর্শ, ঘ্রাণ বা আস্বাদ করি, তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত সংস্পর্শ হয়। পরোক্ষ সংস্পর্শের সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। যখন কোনও বস্তুর অনুপস্থিতিতে আমরা উহার কথা, শব্দ বা প্রতিরূপ সাহায্যে মনে করি, চিন্তা করি, অথবা অপরের লিখিত বা মৌখিক বাক্যের সাহায্যে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, তখন হইল পরোক্ষ জ্ঞানগত সংস্পর্শ। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্রিয়ার মধ্যেও এরূপ একটি প্রভেদ আছে, যেমন আমি নিজে গিয়া একটি জিনিষ আনিলাম, অথবা কথা বা লেখার সাহায্যে অপরকে দিয়া সে কার্য্য করাইলাম।

সংস্পর্শ ঘটে, তাহারই ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মনোবিদ্যায় এ ভিত্তি আরও বিস্তীর্ণ ধরা হয়, তাহা আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি। কারণ ইহাতে যে শুধু ইন্দ্রিয়ের সংবেদন (sensation) আছে, তাহা নহে; এই সংবেদন অনুভূতির সাহায্যে যে পেশীগত ক্রিয়ার সঞ্চার করে, উহাও রহিয়াছে। চিকিৎসাবিৎ শিক্ষক সেগুঁয়্যা (Seguin) সর্ব্বপ্রথম এই সত্যটির শিক্ষাগত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অল্পবুদ্ধি শিশুরা অনেক সময় অতি সহজ সুসমঞ্জস ক্রিয়া করিতে পারে না। স্বাভাবিকবুদ্ধি শিশুর মত ইহারা একটি বল ধরিতে বা গড়াইয়া দিতে পারে না; বা বলটি কোন দিকে গড়াইয়া গেল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মস্তক ও চক্ষুর ক্রিয়ার যেটুকু সমন্বয়সাধন (co-ordinatlon) করা আবশ্যক, উহাও তাহাদের সাধ্যাতীত। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের বুদ্ধির অল্পতার সহিত এই দোষটির সম্পর্ক আছে। এবং ইহার প্রতিবিধান দ্বারা তিনি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই বিধান অনুসরণ করিয়া মন্টিসরি স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাতেও ইহাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত বিকাশকে, পূর্ণ প্রাধান্য দিয়াছেন। মন্টিসরি বিদ্যালয়ে তিন চার বছরের শিশুরা, বোতামের ঘরে বোতাম বসান, লেসে সূতা লাগান ও বাঁধা, খুঁটা ও নানা আকারের বস্তুকে ঠিক উহারই উপযোগী ছিদ্রটিতে বসান, ইত্যাদি যে সব ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ও নির্ভুল ব্যবহারের অনুশীলন হয়, উহাতে বহু সময় অতিবাহিত করে। দেখা গিয়াছে যে এই পদ্ধতিতে উচ্চতর মানসিক শিক্ষা স্থাপনের সুন্দর ভিত্তি গড়িয়া উঠে।

বাহ্য ঘটনার প্রভাবে যে সংবেদনের উদ্রেক হয়, তাহা হইতে আবার ক্রিয়া বা চেষ্টাগত সাড়ার উৎপত্তি হয়। ইহাকে বলে সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া (sensori-motor reaction)। উল্লিখিত মতবাদ অনুসারে এগুলি হইতেছে, মানুষের সকল সাফল্যের মূল উৎস। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। এক কুকুরছানা পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। আমি তাহার কাছে গিয়া তাহার ঘাড়ের পার্শ্বে ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলাম। ফলে তাহার চর্ম্মের নিম্নে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। দুই চারিবার চাপড়াইবার পরে তাহার পিছনের পা

দুটি তালে তালে স্পন্দিত হইতে লাগিল, শীঘ্রই উহা হইয়া উঠিল আঁচড়াইবার প্রবল চেষ্টা। আমি চাপড়ান বন্ধ করিলে এই চেষ্টা মুহূর্ত্তেক চলিয়া শেষে থামিয়া গেল। এখানে কি ঘটিল বুঝিতে হইলে কুকুরটির চর্ম্মের নিম্নস্থ অংশের গঠনটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। যে স্থানটি চাপড়ানো হইয়াছে, সে স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে, সেগুলিকে প্রেষবিন্দু (pressure-spots) বলা হয়। এগুলির নীচে অতি সূক্ষ্ম শ্বেত সূত্রসমূহ সংযুক্ত আছে। সেগুলি গিয়া গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের (backbone) মধ্যস্থ সুষুম্না কাণ্ডে (spinal cord) গিয়া মিশিয়াছে। মিশিবার মুখে প্রত্যেকটি সূত্র এক একটি অতি ক্ষুদ্র গোলকের সহিত যুক্ত আছে, এগুলিতে স্নায়বিক পদার্থ আছে। এই গোলকসহ সূত্র হইল স্নায়ু (neurone), এগুলি স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) এক একটি অংশ। গোলকটি হইতেছে স্নায়ুকোষ (nerve cell), স্নায়ুর সজীবতা ও ক্রিয়ার ইহা কেন্দ্র। যে শ্রেণীর স্নায়ুর কথা এখন বলা গেল, তাহার কাজ হইল স্নায়বিক উত্তেজনাটি চর্ম্ম হইতে সুষুম্না কাণ্ডে পৌঁছিয়া দেওয়া, এইজন্য ইহাকে সংজ্ঞাবহ (sensory) স্নায়ু বলা হয়। অন্তর্মুখী (afferent) বা গ্রাহক (receptor) স্নায়ু নামেও ইহাকে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

স্নায়বিক প্রবাহটিকে এই সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বহন করিয়া লইয়া যায় একটি বা একাধিক আর এক শ্রেণীর স্নায়ুর মধ্যে। ইহাদের নাম সংযোজক (connector) স্নায়ু। এগুলি শুধু সুষুম্না কাণ্ডের ভিতরে থাকে। সুষুম্না কাণ্ডের পথে স্নায়বিক প্রবাহটি নানা পথ ধরিয়া এক সংযোজক স্নায়ু হইতে অপরের মধ্যে চালিত হইতে পারে। পূর্ণ চেতনার মধ্যে আসিতে হইলে প্রবাহটিকে উপরে উঠিয়া সুষুম্না কাণ্ডের উর্দ্ধস্থ মস্তিষ্ক (brain) নামক অংশে পৌঁছিতে হইবে। সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ইহা পৌছিবে এক ধূসর পদার্থের কুণ্ডলীকৃত বহিঃস্তরে (cortex), ইহা মস্তিষ্ক গোলার্দ্ধের (cerebral hemisphere) বহির্ভাগ। আবার, কোনও চেষ্টা বা ক্রিয়ার বেলায় প্রবাহটি সুষুম্না কাণ্ড হইতে তৃতীয় এক আর শ্রেণীর স্নায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বাহিরে আসিবে; ইহাকে বলা হয় ক্রিয়াবহ (motor) স্নায়ু, অপর নাম চালক (effector) বা বহির্মুখ (efferent) স্নায়ু। সুতরাং আমাদের

ক্রিয়াটি যদি ইচ্ছাচালিত (willed) হয়, স্বতঃপ্রসৃত প্রতিবর্ত্ত (reflex) ক্রিয়া না হয়, তবে উহার উৎপত্তি মস্তিষ্কেই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মস্তিষ্কই সকল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহারই সাহায্যে একদিকে আমাদের বস্তুগত পৃথিবী সম্বন্ধে দৃষ্টি ও বোধ জন্মে, অপর দিকে সকল অবস্থা অনুযায়ী ক্রিয়া ও সৃষ্টিকৌশলের অফুরন্ত শক্তির সঞ্চার হয়।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের সংযোজক স্নায়ুগুলি দ্বারা বাহিত প্রবাহটি অসংখ্য বিভিন্ন পথে আসিতে পারে। তেমনই আবার ইচ্ছামত যে কোনও চালক স্নায়ু দ্বারা এই প্রবাহ বাহিরে অর্থাৎ ক্রিয়ায় প্রকাশ হইতে পারে, তাহাও আমরা দেখিব। সুতরাং মস্তিষ্কের ইচ্ছাচালিত ক্রিয়াসমূহের মধ্যেও অশেষ বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। আবার স্নায়ুতন্ত্রে আরও একটি যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সাহায্যে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু দ্বারা গৃহীত সংবেদনটি সুষুম্না কাণ্ডের বাহিরে থাকিয়াই একেবারে ক্রিয়াবহ স্নায়ুতে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং এই ভাবে উৎসারিত ক্রিয়াগুলিকে ইচ্ছাশক্তি (will) দ্বারা পরিবর্ত্তন করা যায় না। এগুলি হইল স্বতশ্চালিত (involuntary) ক্রিয়া। রক্ত চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, উদর মধ্যস্থিত অন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়া ও এইরূপ অন্যান্য ক্রিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এখন কুকুরছানার উদাহরণটিতে ফিরিয়া আসা যাক। চাপড়াইবার সঙ্গে সৃষ্ট সংবেদনটি সুষুম্না কাণ্ডে পৌঁছিবামাত্র এমন একটি সহজ পূর্ব্বগঠিত পথ পায়, যেটি ধরিয়া উহা সংযোজক স্নায়ুর মধ্য দিয়া পায়ের ক্রিয়াবহ স্নায়ুতে পৌঁছিতে পারে। এবং এই কারণে আঁচড়ান ক্রিয়াটির উৎপত্তি হয়। নহিলে এরূপ উদ্দীপকের ফলে দেহে অন্য কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হইয়া আঁচড়ান ক্রিয়ারই উদ্ভব কেন হইল, তাহার কারণ বুঝা অসম্ভব হইয়া উঠিত। কতকগুলি সংজ্ঞাবহ এবং কতকগুলি ক্রিয়াবহ স্নায়ুর মধ্যে এই অন্তর্নিহিত যোগকে শারীরবিদ্‌গণ প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়া (reflex) বলেন। কোনও কোনও প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়ায়, যেমন পা নাড়া, চোখের খুব নিকটে কোনও বস্তু আসিয়া পড়িলে চোখ বোজা, এই সব প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়ার বেলায় ব্যবস্থাটি মোটামুটি সরল। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা অতীব জটিল।

তবে সংবেদন প্রবাহ পূর্ব্বসৃষ্ট পথটির দিকে সহজে যায় বটে, কিন্তু উহার গতি যে সেই পথের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোথাও কথা নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটি সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, এই পরীক্ষাটি ম্যাকডুগাল বর্ণিত। পাঠক তাঁহার একটি বাহু হাতের তালু নীচের দিকে করিয়া টেবিলের উপরে রাখুন। এই অবস্থায় সুতায় বাঁধা কোনও ভারী জিনিষ একটি আঙ্গুলে ঝুলাইয়া এক সেকেণ্ড বা আরও কম সময় অন্তর সেটিকে উঠাইবার চেষ্টা করুন। তিনি দেখিবেন যে, প্রথমে মাত্র সেই আঙ্গুলেই ক্রিয়াপ্রবাহটি সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ উহা অন্যান্য আঙ্গুলে, পরে বাহুর নিম্নভাগের পেশীসমূহে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র বাহু ও স্কন্ধে ছড়াইয়া পড়িল। এক্ষেত্রে আমরা মনে করিতে পারি যে ক্লান্তির প্রভাবে ক্রমশঃ মূল প্রতিবর্ত্ত পথে প্রবাহটির চলাচলের বিঘ্ন ঘটিল। ফলে প্রবাহটি নিকটস্থ অন্য পথসমূহে ছড়াইয়া পড়িল। এবং সেখানেও যেমন বাধার সৃষ্টি হইল, ইহার বিস্তারের সীমাও তেমনই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। আবার পরীক্ষা এবং ভুলসংশোধনের (trial and error) ফলে যখন কোনও ক্রিয়া বা ভঙ্গী ক্রমশঃ সন্নিবদ্ধ (consolidated) হয়, তখন ঠিক ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটে। সে ক্ষেত্রে ক্রমাগত অভ্যাসের গুণে সাফল্য আসার ফলে, ক্রিয়াপ্রবাহে ব্যবহার্য্য পথগুলির বাধা এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে শেষ পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর প্রতিবর্ত্ত গড়িয়া উঠে; এজন্য মনোবিদ্‌গণ ইহার নাম দিয়াছেন গৌণ প্রতিবর্ত্ত (secondary reflex)।

প্রাণীর প্রথম নড়াচড়া প্রতিবর্ত্তের ফলেই হইয়া থাকে। পরেও যে সমস্ত ক্রিয়াকৌশল সে শিক্ষা করে, তাহার মূলে প্রতিবর্ত্ত রহিয়াছে। যেমন প্রকৃতপক্ষে পাখীর ছানাকে খুঁটিয়া খাওয়া শিখিতে হয় না। আবার তাহার ডানা ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রের আবশ্যকমত পূর্ণতা ঘটিলেই সে বিনা শিক্ষায় উড়িতেও পারে। তেমনই মানবশিশুর জন্মাবধি চুষিবার প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়াটি প্রবল থাকে। তাহার স্নায়ুতন্ত্রের পরিণতির সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবর্ত্ত দেখা দেয়। প্রথমে সে স্থিরভাবে শুইয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু শীঘ্রই এক সময় আসে যখন কোনও কিছুই তাহার উঠিয়া বসা বন্ধ করিতে পারে না। পরে সে হাতে ভর দিয়া মেঝের উপর ছুটিয়া বেড়ায়, যদিও অন্য কাহাকেও এমন

অদ্ভুত ভঙ্গীতে চলিতে দেখে নাই। পরে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং হাঁটিতে আরম্ভ করে। এ ব্যাপারে বড়দের অযাচিত সাহায্য সে পায় বটে, কিন্তু চলার প্রতিবর্ত্তই ইহার আসল কারণ। এই সকল মূল প্রতিবর্ত্তগুলি আবার পরস্পর সংশ্লেষণের (synthesis) ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সেজন্য পরে আরও অনেক ক্রিয়া সম্ভবপর হয়।

এই সংশ্লেষণ কিরূপে সাধিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (একাদশ অধ্যায়)। আর কতকগুলি দক্ষতার ক্রিয়ার পরীক্ষায় এই প্রক্রিয়াটি যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে টাইপ করা শিক্ষার পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির পরিমাণ লেখ (graph) দ্বারা সূচিত হয়। দেখা যায় যে লেখগুলির উচ্চনীচ তরঙ্গ আছে; ইহাতে বুঝা যায় যে উন্নতির মাত্রা একবার বাড়ে, তারপর কমিয়া যায়, আবার বাড়ে, এইরূপে চলিতে থাকে। এইগুলি হইল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত প্রতিবর্ত্তগুলির সংশ্লেষণের এক একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা। প্রথম পর্য্যায়ে নির্ভুল অক্ষরের অভ্যাস গঠিত হয়; অর্থাৎ এমন এক গৌণ প্রতিবর্ত্ত গঠিত হয়, যাহার ফলে ইচ্ছা করিবামাত্র ঠিক চাবীতে ঠিক আঙ্গুলটি আপনি গিয়া পড়ে। এই অভ্যাস গঠিত হওয়ায় টাইপ করার গতি দ্রুত হয়, সুতরাং লেখটিও উপরে উঠে। শীঘ্রই কিন্তু বিরতি আসে, দেখা যায় গতি বৃদ্ধির মাত্রা কমিয়া গিয়াছে, শীঘ্রই আবার উহা বাড়ে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বেকার অক্ষরের অভ্যাসগুলি এখন শব্দাংশ ও শব্দের অভ্যাসে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইহার ফলে এক চেষ্টাতে সমগ্র বাক্যাংশ বা বাক্য টাইপ করিবার ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইবে। এই বৃহত্তর প্রতিবর্ত্ত সমষ্টিগুলি গঠিত হইবার সময়ে অক্ষর হইতে মনোযোগ অংশতঃ চলিয়া যায়, সেই কারণে ভুল ও দেরী হয় এবং উন্নতিরও হ্রাস দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই উচ্চতর অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে তবেই উহার অংশীভূত অক্ষরের অভ্যাসেরও সম্পূর্ণ উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। আবার এই শিক্ষাকার্য্য চলিবার সময়ে একাধিক শ্রেণীর মানসিক প্রতিরূপের (যেমন দৃষ্টি, স্পর্শ, ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া দেখা যায়। তবে দক্ষতা বাড়িলে আর এগুলি থাকে না, কোনও শব্দ বা বাক্যাংশ টাইপ করিতে হইলে, তদনুযায়ী ক্রিয়ার প্রেরণা তখন আপনা

হইতেই আসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কোনও কার্য্য শিক্ষার সময়ে উপযুক্ত প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়াটির প্রয়োগ প্রথম হইতে হইলে উহাতে অধিক সুফল পাওয়া যায়। মন্টিসরির পদ্ধতিতে অক্ষরের আকার শিখাইবার এই ব্যবস্থা আছে যে শিশুরা চোখে দেখার বদলে শিরীষ কাগজে কাটা অক্ষরগুলির উপর আঙ্গুল চালাইয়া অভ্যাস করে ও পরে চোখ বন্ধ করিয়া তাহাদের অক্ষরগুলি লিখিতে দেওয়া হয়। হয় ত উপরের নীতি হইতে এই ব্যবস্থারও কিছু সমর্থন পাওয়া যাইবে।

হাতের লেখা শিক্ষাদানে এ বিষয় হইতে কি সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কোনও কোনও শিক্ষক এক একটি শব্দ ধরিয়া লেখা আরম্ভ করিতে চান, কারণ শব্দের অর্থ আছে, অক্ষরের তাহা নাই। কিন্তু দেখা যায় যে, সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তলিপি শিক্ষা করিতে গেলে প্রথমে নিম্নতম অভ্যাস, অর্থাৎ অক্ষর লিখিতে শিক্ষার অভ্যাস, শিশুকে গঠন করিতে হইবে। যাহাতে শিশু পৃথক অক্ষরগুলির মধ্যেও খানিকটা অর্থ খুঁজিয়া পায়, সেজন্য কোনও খেলার পদ্ধতি, যেমন মন্টিসরির প্রণালী বা প্রচলিত অন্য কোনও ছেলেখেলা প্রণালী অবলম্বন করায় কোনও বাধা নাই। তবে উপরের টাইপ শিক্ষার বিশ্লেষণ হইতে দুইটি কথা বুঝা যায়। প্রথমতঃ, পৃথক অক্ষর হইতে শব্দ লিখিবার অভ্যাস শিশুর আপনা হইতেই যেন গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে শব্দগুলি শিশু সহজে পড়িতে পারে, তেমন শব্দই প্রথমে যেন তাহাকে লিখান হয়।

আবার পড়িতে শেখার মধ্যে আছে চিনিবার অভ্যাস ; প্রথমে অক্ষর, পরে শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, এইরূপে জটিলতার বৃদ্ধি হয়। এইভাবে চিনিবার অভ্যাস গঠিত হইলে তারপরে লিখন শিক্ষার জটিলতর অংশ আরম্ভ করা উচিত। তাহা হইলে পড়িবার অভ্যাসও ভাল ও নির্ভুল হয়, আবার নিজস্ব ক্রিয়াবিশিষ্ট পৃথক আর একটি শিক্ষা, লিখন শিক্ষারও বিকাশ ঘটে। কোনও অভ্যস্ত পাঠকের চোখের কাছে একটি ছোট্ট আয়না রাখিয়া পিছনে দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাঠকের চোখ লিখিত ছত্রের উপরে একভাবে নড়িতেছে না। প্রতি ছত্রে চোখ হয়ত তিন হইতে পাঁচবার নড়িতেছে, প্রত্যেকবার নড়ার পর সামান্য একটু থামিতেছে। এই থামার সময়টুকুতেই

চক্ষুর চিনিবার ক্রিয়াটি চলে, যে শব্দসমষ্টি অর্থসঙ্গতির দ্বারা পরস্পরসংযুক্ত, মুহূর্ত্তের এক নজরেই তাহার মর্ম্ম গৃহীত হয়। সুতরাং সাধারণতঃ পুস্তকপাঠে চিনিবার অভ্যাস এক একটি অর্থবিশিষ্ট শব্দসমষ্টি ধরিয়া হয়। শিশুদের নিম্নতম পর্য্যায়ের (অর্থাৎ প্রথমে অক্ষর, পরে শব্দ ইত্যাদি) চিনিবার অভ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এই অভ্যাস গঠিত করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষাদান-কালে এই নিয়মটিও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উচ্চতর অভ্যাসটি গড়িতে আরম্ভ হইলে তবে নিম্নতর অভ্যাসের গঠন সম্পূর্ণ হয়। আর শব্দের বানানের মধ্যে যা কিছু নিয়মের ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা বলা বাহুল্য যে, পড়িতে শিখিবার সকল অবস্থাতেই মনে রাখিতে হইবে যে শিশু যাহাই পড়িবে, তাহার যেন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে। যে বিদ্যালয়ে শিশুদের শ্রেণী বড়, সেখানে অনেক সময়ে এই প্রাথমিক বিধিটি অবহেলা করা হয়। তাই দেখা যায় যে, ছেলে যে কোনও বই পড়িতে পারে, কিন্তু বইয়ের লেখাগুলির যে কোনও অর্থ আছে, সে বোধই তাহার নাই। বলা বাহুল্য, পড়িয়া বইয়ের তথ্যগুলি আয়ত্ত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং সে শিক্ষা প্রথম হইতেই দিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়। জ্ঞানের পাঁচটি দ্বারের কথা বহুদিন হইতে আমরা জানি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ উত্তাপ ও দৈহিক যন্ত্রণার সংবেদন, ইহাদের সংজ্ঞা-বাহী স্নায়ুগুলি চর্ম্মে সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিপাক ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহের অন্তর্গত সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুসমূহ। ইহাদের সংবেদনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শারীরিক সুস্থতা, অসুস্থতা এবং স্বকীয় আরও নানা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অনুভূতির উৎপত্তি হয়। তৃতীয়তঃ, চেষ্টা সংবেদন (kinaesthetic sense), ইহারই সাহায্যে আমাদের মস্তক, দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটে।

স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে উপরের তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে বিভিন্ন ক্রিয়ার সংশ্লেষণ বা সমন্বয় সাধনই ইহার ক্রিয়া। আর মস্তিষ্কই বিরাট সমন্বয়সাধক যন্ত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি গুরুতর কথারও উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা এই যে, বিশ্লেষণও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া ; মস্তিষ্ক দ্বারা অতি

উচ্চতর বিশ্লেষণ কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হয়। যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র নাই বা অতি নিম্নস্তরের স্নায়ুতন্ত্র আছে, জগৎ ও নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে খুব সামান্যই উপলব্ধি করিতে পারে। এই উপলব্ধি আরও বেশী হইতে হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু বা তাহাদের গুণসমূহ জানিবার এবং উহাদের পার্থক্য বুঝিবার যে শক্তি থাকা প্রয়োজন, উহার তাহা নাই। উচ্চতর প্রাণীদের পক্ষে এ ক্রিয়া সম্ভবপর হয়; কারণ উহাদের সংজ্ঞাবহ স্নায়ুমণ্ডলীর অনেকখানি পরিণতি হইয়াছে, এবং আলোক, শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সহায়তা করিতেছে। আবার চেষ্টা বা ক্রিয়ার দিকেও অধিক মাত্রায় বিকাশ কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন প্রাণীর ক্রিয়াবহ স্নায়ুসমূহের বহুবিধ বিভিন্ন ক্রিয়া করিবার শক্তি থাকে। সুতরাং স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকে শুধু সংশ্লেষক বা বিশ্লেষক বলা চলে না। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ উভয়ই ইহার দ্বারা অনবরত সংঘটিত হয়। আর জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে উভয়েরই সমান পরিচয় আমরা পাই।

জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা শীঘ্রই আরও সবিস্তারে করা হইবে। তাহার পূর্ব্বে আরও এক শ্রেণীর আচরণ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যাইবে, ইহাতে এই সংশ্লেষণ ব্যাপারটির সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ইহাকে বলা হয় ইচ্ছাশক্তি। প্রচলিত মতে ইহা এক স্বতন্ত্র শক্তি; বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পরিমাণে এ শক্তি আছে, ইহার সাহায্যে লোকে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে এবং উহার বাধা অতিক্রম করে। ইহাতে ভুল এই যে, মানুষের অন্যান্য সকল ক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে বিভিন্ন করিয়া ইচ্ছাকে এক পৃথক শক্তিরূপে ধরা হইয়াছে। আসলে যে শক্তির দ্বারা মানুষ এক বিরাট সঙ্কল্প সাধন করে, আর যে শক্তির সাহায্যে মানুষ কথা বলিতে বলিতে একটি পিন কুড়াইয়া লওয়া বা জুতার ফিতা বাঁধার মত অতি ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করে, উভয়ই মূলতঃ এক শক্তি। উভয় ক্রিয়ার মূলে প্রেরণার যে সঙ্ঘবদ্ধতা আছে, পার্থক্য সেখানে। ম্যাকডুগালের মতে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সর্ব্বদাই আত্মশ্রদ্ধারসের (self-regarding sentiment, ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ক্রিয়া থাকে। সেরূপ হইলে অবশ্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণার ইহা থাকা সম্ভব নয়। আমরা এরূপ কোনও সীমা গ্রহণ করি বা না করি, একথা আমাদের মানিতে হইবে যে, কোনও কার্য্যকে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বলিতে হইলে সে ক্রিয়া

আমাদের প্রকৃতির ক্ষুদ্র অংশমাত্র দ্বারা চালিত হইলে চলিবে না, উহার মূলে কোনও বিরাট, গভীররূপে নিহিত, সর্ব্বব্যাপী ছাপসমন্বয় (engram-complex) থাকিয়া উহাকে শক্তি দিবে। অর্থাৎ যদি আমি নিছক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসবশতঃ পিনটি কুড়াই, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। কিন্তু পিন কুড়ান সম্বন্ধে যদি আমার অধিকার কেহ অস্বীকার করে, অথবা পিনটি যদি বিপজ্জনক বা দুর্গম কোনও স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিতে হয়, সে ক্ষেত্রে আমার আত্মশ্রদ্ধারসের ক্রিয়া আসিয়া পড়িবে। তখন এই পিন কুড়ানকেই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া বলা চলিবে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণভাবে রসসমূহের সৃষ্টির কথা যাহা বলা গিয়াছে, তাহা ছাড়া পৃথকভাবে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করার কোনও উপায় নাই। সুতরাং মন্টিসরি এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন যে শিশুর ইচ্ছাশক্তির পরিণতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে অবাধে স্বকীয় প্রেরণা অনুসরণ করিতে দিতে হইবে। কারণ, সর্ব্বদা যদি তাহাকে বাধা পাইতে হয়, বা শুধু অপরের অনুজ্ঞা পালন করিতে হয়, তবে শক্তিশালী রসসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সফল ও সুনিয়ন্ত্রিত আচরণের মূল ভিত্তিটিই গড়িয়া উঠে না। তাহার অতি শৈশবের রসগুলি স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ না হইতে পারার ফলে অবদমিত হইয়া থাকে। এবং শ্যাণ্ড (Shand) বর্ণিত সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উহাদের মন্দ গুণগুলিও পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট রসসমূহে চলিয়া আসিতে থাকে (এ বিষয়গুলি পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে)। ফলে শিশুটি বড় হইয়া এমনই এক মানুষে পরিণত হয় যে, শক্তি সহকারে ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত বিশাল ও দৃঢ়রূপে সংগঠিত মানসিক ভিত্তি তাহার থাকে না। কোনও সমস্যার সম্মুখীন হইলে, হয় তাহার সঙ্কল্পের চূড়ান্ত অভাব দেখা যায়, নয়ত ছেলেমানুষী ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত প্রচলিত ধারণার মধ্যে খানিকটা সত্যতা অবশ্য দেখা যায়। স্বকীয় শক্তির বিষয়ে মানুষে মানুষে বিপুল প্রভেদ আছে; এবং ইহার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই প্রভেদ অতি সুস্পষ্টরূপে নজরে পড়ে। আবার বিভিন্ন মানুষের মনের ভাবে যেরূপে জ্ঞানের দ্বারা অনুভূতি জাগ্রত

হয় এবং উহা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যেও যথেষ্ট বৈষম্য থাকে। এই কারণে জেমস দুই শ্রেণীর ইচ্ছাশক্তির কথা বলিয়াছেন। প্রথমটির ক্রিয়া এক বিস্ফোরকের (explosive) মত, উহাতে ভারটি অনুভূতিতে আসামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হইল অবরুদ্ধ (obstructed), মানসিক বাধ (inhibition) অবদমনের ফলে ইহাতে ক্রিয়ার উৎপত্তি বিলম্বে হয়। মনোবিৎ আক্ (Ach) এই বিশ্লেষণ আরও বিস্তারিত করিয়া প্রক্ষোভপ্রকৃতির (temperament) শ্রেণীবিভাগের যে ধারা প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিয়াছেন। পুরাতন প্রচলিত শ্রেণীবিভাগে চার রকমের প্রক্ষোভপ্রকৃতি বা শরীর রস (humours) আছে—আশাপ্রবণ (sanguine), পিত্তপ্রধান বা রোষপরায়ণ (choleric), শ্লেষ্মল বা জড় (phlegmatic) ও বিষাদবায়ুপ্রধান বা বিষণ্ণ (melancholic)। ইনি ইহার সহিত সতর্ক (cautious) এই পঞ্চম আর এক শ্রেণী যোগ করিয়াছেন। সতর্ক, আশাপ্রবণ এবং রোষপরায়ণ, এই তিন জাতীয় প্রকৃতিরই এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যে, বাহ্য ঘটনা ও প্রভাবে উহারা খুব সহজে সাড়া দেয়, দেহের ক্রিয়াবাহী গুণও ইহাদের প্রবল। আবার জড় এবং বিষণ্ণ, উভয়েরই এই গুণগুলির অভাব থাকে। ইচ্ছাশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, সতর্ক ও জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার মূল নিয়তিগুলি (determining tendencies) শুধু যে আরম্ভে অত্যন্ত দৃঢ় থাকে, তাহা নহে; সমগ্র ক্রিয়াটির মধ্যেও উহাদের শক্তি অব্যাহত থাকে। সতর্কপ্রকৃতির লোকের তৎপরতা ও সাড়া অধিক, তাই সে ক্রিয়া ভালবাসে, আর কাজটি চলিবার সময়ে সে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে খানিকটা সক্রিয় করিতে ও খাপ খাওয়াইয়া লইতেও সক্ষম। অপর দিকে জড় প্রকৃতির মানুষের জাগিয়া উঠিতে দেরী হয়, কিন্তু একবার জাগ্রত হইলে সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া ছাড়ে না। আশাপ্রবণ মানুষের সতর্ক প্রকৃতির মত সচেতনতা ও সজীবতা আছে। সমান আগ্রহে সে ক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করে, এবং সমরূপ প্রবল নিয়তি দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু শীঘ্রই সে উদ্যমের হ্রাস হয়, সুতরাং অনেক সময়ে সে কর্ম্মটি সমাধা করিতে পারে না। তবু তাহার আশাবাদিতার গুণে বিফলতার কথা শীঘ্রই সে ভুলিয়া যায়, সুতরাং নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময়ে তাহার

আগেকার ভরসা সহজেই আসিয়া যায়। এই তিন শ্রেণীর তুলনায় রোষপরায়ণ এবং বিষণ্ণ, এই দুই শ্রেণীর মানুষদের শক্তিশালী নিয়তিসমূহের অভাব দেখা যায়। তবে রোষপরায়ণ মানুষ কোনও ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে পারে না, তাই একাগ্র চেষ্টার অভাবে বিফলতা ঘটিলেও প্রকৃতিগত তৎপরতার গুণে নূতন চেষ্টা করিবার প্রেরণার তাহার অভাব ঘটে না, ফলে সব গোলমাল হইয়াও কোনরূপে 'কার্য্যোদ্ধার' হইয়া যায়। কিন্তু বিষণ্ণ ব্যক্তির রোষপরায়ণ প্রকৃতির দুর্ব্বলতা থাকে, কিন্তু সেরূপ অনুভূতি ও ক্রিয়ার তৎপরতা থাকে না। তাই সে নিষ্ফল ও বীতরাগ হয়, প্রবল স্বকীয় চেষ্টা করিবার শক্তিও তাহার থাকে না, আবার নিষ্ফলতার জ্বালার শক্তিও এত বেশী হয় না যে উহাতে নূতন উদ্যমের সঞ্চার হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সে সাফল্যলাভ করিতে পারে।

এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অন্তর্বৃত (introvert) এবং বহির্বৃত (extravert) প্রকৃতির (দশম অধ্যায়) প্রভেদটি তুলনীয়। আর কোনও কোনও মনঃসমীক্ষকের মতে বহির্বৃতি ও অন্তর্বৃতির ন্যায় এই বৈষম্যগুলিও অতি শৈশবে গড়িয়া উঠে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলি সহজাত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যাহাই হউক, শিশু যে বয়সে বিদ্যালয়ে আসে, তখন এগুলি পরিবর্ত্তন করা কঠিন, অসম্ভব বলিলেও চলে। সুতরাং শিশুর প্রকৃতিতে এ বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে পরিচালিত করার ব্যাপারে ইহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বুদ্ধির বিকাশ

জন্মের সময় শিশুর মনের অবস্থাটি কিরূপ থাকে, সে বিষয়ে মনোবিদেরা নানারূপ অনুমান করেন। এই সময়ের সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। জেমস বলিয়াছেন যে, সে সময়ে পৃথিবী যেন শুধু "এক বিরাট শব্দ ও গোলমালের ব্যাপার।" কিন্তু স্বাস্থ্যবান শিশুর যদি ইহা মনেও হয়, তবু সেজন্য কোনও কষ্ট থাকে না। তাহার দৈহিক প্রয়োজন ও ক্ষুধার বশে এবং নবজাগ্রত প্রবৃত্তিগুলির সাহায্যে সে এই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা মিটাইবার জন্য তাহার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। এদিকে তাহার প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়াগুলির ক্রমশঃ স্পষ্টতা ও সামঞ্জস্য আসিতে থাকে, সেগুলিই বলিতে গেলে তাহার ব্যবহারের অস্ত্র হইয়া উঠে। ঠিক জন্মের সময়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মনে করা যাক যে শিশুর এতটা বয়স হইয়াছে যে, সে কোনও বস্তু নজর করিতে পারে। কৌতুহলদ্বারা চালিত হইয়া তাহার সে দৃষ্টি এক চকচকে রূপার চামচে গিয়া পড়িল। তারপর কি ঘটিবে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। নজর করিবার, হাত বাড়াইবার, হাতের মুঠায় ধরিবার এবং লইবার সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্ত্তগুলির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। অবশেষে খানিক পরীক্ষা ও ভুলসংশোধনের (trial and error) পরে চামচটি শিশুর মুখে গিয়া পৌঁছিবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের যে কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা গিয়াছে, এই ঘটনাটির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ প্রথমেই শিশু উজ্জল চামচটি কম উজ্জ্বল পরিবেশের ভিতর হইতে বাছিয়া লইল। আর দ্বিতীয়তঃ, তাহার নিজের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট এক আকার ও অবস্থার একটি জিনিষ লক্ষ্য করাটিতেই এক সুসম্বদ্ধ ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। তারপর কি হইল দেখা যাক।

পরদিন চামচটি আবার তাহার চোখে পড়িল। এবারে সেটি প্রত্যক্ষ করামাত্র তাহার আনন্দ দেখা গেল। আর সে দক্ষতার সহিত সেটি মুখে পুরার কার্য্যটি সম্পন্ন হইল, পূর্ব্বদিনের সফল চেষ্টার ফলে সে দক্ষতা অনেক

বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার আচরণে কোনও সন্দেহই থাকে না যে জ্ঞানের দিক হইতে চামচটি সম্পর্কে তাহার মনোভাব ঠিক পূর্ব্বের মত নাই। কিন্তু ঠিক কি পার্থক্য ঘটিয়াছে? এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে শুধু এইটুকুই বলা যাইবে যে, এখন সে যেভাবে চামচটি প্রত্যক্ষ করিতেছে, সেই মনোভাবে পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আরও জটিলতা বা বৈচিত্র্য আসিয়াছে। সুতরাং চামচটি সেই জিনিষ হইলেও যেন ঠিক তাই নয়; চামচটির পূর্ব্বে দেখা আকার ও উজ্জ্বলতা, সেটিকে মুঠার মধ্যে রাখিয়া শীতল অনুভূতি, হাত বাড়ানো, চামচটি ধরা ও লইয়া আসা, এই সকল ক্রিয়ার সাফল্যের উল্লাস, এবং সব শেষে শীতল, কঠিন বস্তুটি মাড়ি দিয়া চাপিবার আনন্দ, এই ভাবগুলির প্রত্যেকটি শিশুর সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ শক্তির দ্বারা পৃথকভাবে গৃহীত ও সংযুক্ত হইয়া এক সমগ্র এবং নির্দ্দিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আকারযুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হইল। ফলে তাহার মনে যে ছাপসমন্বয়ের উৎপত্তি হয়, আবার চামচটি দেখিবার সময়ে উহাই সক্রিয় হইবে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে এ ক্রিয়ার অধিকাংশই স্পষ্ট চেতনার স্তরের নীচে থাকে বটে (পঞ্চম অধ্যায়), কিন্তু উহার উর্দ্ধে, অর্থাৎ চেতনার কাছাকাছি কিছু প্রভাবও দেখা যাইবে। যেমন চামচটি দ্বিতীয় বার দেখিবার সময়ে শিশুর যে উহা 'চেনা চেনা' লাগিয়া আনন্দ হইল, তাহার মধ্যে হয়ত এই অনুভূতি আছে যে, একবার চামচটি সম্পর্কে তাহার ক্রিয়া সফল হইয়াছে বলিয়া আবার উহা করিতে সে প্রস্তুত। এ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ কয়েকটি জিনিষ আছে। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করিবার অস্পষ্টভাবে অনুভূত এক অন্তর্নিহিত প্রেরণা। দ্বিতীয়তঃ, সে সময়ে আত্মসাম্মুখ্যের সাফল্যে যে উল্লাস জাগিয়াছিল, তাহারই পুনরুদ্রেক। তৃতীয়তঃ, চামচটি মুখে লইবার আনন্দের আংশিক পূর্ব্বস্মৃতি। চামচটি দ্বিতীয়বার দেখিলেএই ভাবগুলিও শিশুর মনে জাগে, সুতরাং উহার প্রতি মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। মনোবিদগণের ভাষায় শিশুর মনে উহার এক নূতন অর্থের (meaning) সৃষ্টি হয়।

কিছুকাল পরে শিশুর মাতা সগর্ব্বে লক্ষ্য করিলেন যে সে রান্নাঘরের বড় একটি কাঠের চামচের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। তাহার আচরণে বুঝা যায় যে, এই নূতন বস্তুটিকে সে পরিচিত রূপার চামচটির সহিত এক-

শ্রেণীভূক্ত ভাবিতে পারিয়াছে। ইহার মধ্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়ার উচ্চতর বিকাশ দেখা যাইতেছে। ইহাতেও কতকগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রথমতঃ, নানা অবস্থায় রাখা চামচটির বিভিন্ন আকারগুলি মিলিয়া শিশুর মনের মধ্যে চামচ সম্পর্কিত ছাপসমন্বয়টির মধ্যে ক্ষুদ্রতর অথচ স্পষ্ট এক ভাবসমষ্টি সংগঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কাঠের চামচটির আকার যে আগের চামচটির মত নড়িতেছে, উহা এই ভাব সমষ্টিকে সক্রিয় করিতে পারে, যদিও দুইটি চামচে আর কোনও মিল নাই। তৃতীয়তঃ, এই প্রেরণার ফলে যে ক্রিয়া চালিত হইল, উহার মধ্যে চামচ সম্পর্কিত সমগ্র ছাপসমন্বয়টির ক্রিয়া আছে, তাহার ফলে খানিকটা চিনিতে পারা সম্ভব হইল। খানিকটা বলা হইল এইজন্য যে, চামচটির প্রতি শিশুর মনোভাব কিরূপ হইবে, সঠিকভাবে তাহা বলা যায় না। হয়ত এমন এক অস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে, "এরূপ বস্তু আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি," কিংবা আরও একটু স্পষ্ট, "আমি ঠিক জানি ইহা চামচ, কিন্তু কেন তাহা জানি না", অথবা খুব স্পষ্ট, "এটি নিশ্চয় চামচ, কারণ অন্য চামচটি হইতে প্রভেদ থাকিলেও উভয়ের আকার একরূপ।" শিশুর পক্ষে অবশ্য এইরূপ স্পষ্টভাবে ও যুক্তিসহকারে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবে চামচটি দেখিয়া যে বিভিন্ন স্তরের ভাব তাহার মনে উদিত হয়, তাহারই তারতম্য বুঝাইবার জন্য এই কথাগুলি বলা গেল।

এক কথায় বলা যায় যে, শিশু চামচের অন্যান্য গুণ হইতে, অর্থাৎ উহার আয়তন, উজ্জ্বলতা, ইত্যাদি হইতে উহার আকারটুকুর বিমূর্ত্তন বা বিশ্লেষণ করিয়া (abstract) লইতে শিখিয়াছে। তবে সর্ব্বক্ষেত্রে এ কার্য্য যে সংজ্ঞানে হইবে, তাহা নয়। বিভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ (perception) ও প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) বা চিনিতে পারা সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা বিশেষ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে পর পর কতকগুলি ছবির সারি দেখান হইল। প্রত্যেক সারিতে কয়েকটি অদ্ভুত আকার আঁকা ছিল, প্রতি সারি খুব অল্পক্ষণ দেখিতে দিয়া আর এক সারি দেখান চলিতে লাগিল। প্রত্যেক সারির অন্তর্গত আকারগুলি বিভিন্ন, শুধু একটি আকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ খাড়া, শোয়ান ইত্যাদি নানা অবস্থায়) প্রত্যেকটি

সারিতে আছে। পরীক্ষার্থীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, সে যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে একই আকার একবারের বেশী আসিয়াছে, তখনই সে তাহা জানাইবে। আর সে অবস্থায় মনের ঠিক কি ভাব হয়, তাহাও তাহাকে বর্ণনা করিতে হইবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সব ছবিতে যে আকারটি বিদ্যমান, তাহা প্রত্যক্ষ করার ক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি পৃথক অবস্থা বা পর্য্যায় আছে। প্রথমে শুধু এই ভাবটুকু আসিল যে, কোনও একটি আকার একবারের অধিক দেখা গিয়াছে। তারপর উহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট এক ধারণা, যেমন গোল বা ছুঁচাল, জাগিয়া উঠিল। তারপর উহার আকার সম্বন্ধেও সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা আসিল, তবে উহার অবস্থা সম্বন্ধে তখনও সন্দেহ রহিল। সর্ব্বশেষে উহার আকার ও অবস্থা উভয় বিষয়েই নিশ্চয়তা হইল।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষের ক্রিয়ার কয়েটি পৃথক পর্য্যায় আছে, তাহাদের কয়েকটি অতিশয় অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট, অন্যগুলি স্পষ্ট। এগুলিকে ধারণা (concept) বলিতে পারা যায়, প্রতিকৃতি (pattern) বা ছাঁচও (schema) উহাদের বলা চলিতে পারে। কিন্তু যে নামেই উহাদের অভিহিত করা যাক না কেন, উহাদের নিষ্ক্রিয় ভাবিলে চলিবে না। ইহাদের পূর্ণ সক্রিয়তা আছে। নিয়তিসমূহ (determining tendencies) যেমন আমাদের কর্ম্মের চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, এগুলি তেমনই আমাদের চিন্তা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এমন কোনও নিয়তি হইতে পারে না, যাহার মধ্যে উহার প্রেরিত ক্রিয়াটির প্রতিকৃতি বা ছাঁচটি বিদ্যমান না থাকে। আবার নিয়তির মত ছাঁচটির মধ্যেও এক গূঢ়বার ক্রিয়া অনেকাংশে নির্জ্ঞানেই চলিতে থাকে। এখানে বলা যাইতে পারে যে, শব্দের অর্থও এইরূপ ছাঁচ বা প্রতিকৃতি মাত্র। শিশু যখন কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে শিখে, যেমন 'কুকুর' বা 'লাফান', তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়া আছে। প্রথমতঃ, যিনি সে শব্দ ইতিপূর্ব্বেই ব্যবহার করেন, এমন লোকের মধ্যে কিরূপ প্রতিকৃতি বা ছাঁচটি আছে, তাহার সন্ধান করা ; দ্বিতীয়তঃ, সেটিকে নিজস্ব করা ; তৃতীয়তঃ, মনের মধ্যে উহাকে শব্দটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা। পরীক্ষাদ্বারা এই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে।

আমাদের মনে যে সমস্ত সক্রিয় প্রতিকৃতি বা ছাঁচ আছে, তাহাদের অধিকাংশই আমাদের অভিজ্ঞতার বিমূর্ত্তন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদের কতকগুলি সহজাত। যেমন সকল মানুষের মধ্যে এই চেষ্টা রহিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি দিয়া পৃথক 'বস্তুসমূহ' বিশিষ্ট এক বহির্জগৎ গড়িয়া তুলে, সে বস্তুগুলি স্থান ও কালের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে ছাঁচগুলি অসংখ্য শ্রেণীর হইতে পারে। অপর দিকে পশুর প্রবৃত্তিতে (instinct) এবং মানুষেরও কোনও কোনও প্রবৃত্তির মধ্যে আরও বিস্তারিত ধরণের ছাঁচ থাকে। যেমন পক্ষী বাসা বাঁধিবার কালে (নীড়গঠন প্রবৃত্তি) চিরাচরিত পদ্ধতিই বজায় রাখে। এইরূপ জাতিগত কত রকমের ছাঁচ আছে, তাহাদের বৈশিষ্ট্যই বা কতরূপ হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইয়ুঙ (Jung) দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন জাতির প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের মধ্যে অদ্ভূত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। তিনি বলেন ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের মনে কতকগুলি আদিরূপ (archetype) বা জাতিগত ধারণা আছে। এইগুলি আমাদের স্বজ্ঞা (intuition) ও বোধশক্তিকে মানুষী আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ইয়ুঙের এই উক্তিটি অতিমাত্রায় বিস্তারিত করা অবশ্য ঠিক হইবে না, কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা যে আমাদের চারিদিকে জগৎকে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, তাহার কারণ ইহার মধ্যে প্রতিকৃতি খুঁজিয়া লইবার শক্তি আমাদের আছে। এবং এই কথাও সমান স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে উহাদের কতকগুলি ইয়ুঙ বর্ণিত আদিরূপ, যদিও অবশ্য অভিজ্ঞতার সহিত এগুলির অনেক বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসক যে নূতন রোগ নির্ণয় করিতে পারেন বা ইঞ্জিনীয়ার নূতন কোনও যন্ত্রের ক্রিয়া বুঝিতে পারেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন বহু প্রতিকৃতি বা ছাঁচ আছে, যাহার সাহায্যে নূতন ব্যাপারটি আয়ত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এই ক্রিয়া মনের মধ্যে কিভাবে চলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাও অনেক সময়ে আমাদের অসাধ্য হইয়া পড়ে, কারণ চেতন স্তরের নিম্নে গূঢ়ৈষাগুলির ক্রিয়াতেই প্রধানতঃ ইহা চলিতে থাকে।

প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার আলোচনায় আমরা স্বভাবতঃ দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে অধিক

স্থান দিয়াছি। কিন্তু এই সম্পর্কে যাহা বলা গেল, তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কোনও সঙ্গীতের সুর শুনিলে সেই সুরধ্বনির অন্তর্গত প্রতিকৃতি বা ছাঁচটি আমাদের মনে স্থান পায়। পরে আমাদের মনে সন্নিবিষ্ট এই প্রতিকৃতির সাহায্যেই, সে সুরটির সামান্য অংশ শুনিলে, বা অন্য কোনও সপ্তকে (scale) ঐ সুরটি শুনিলেও আমরা উহা চিনিতে পারি। তেমনই ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনিয়া ট্রামগাড়ী বুঝিতে পারা, স্পর্শ দ্বারা বা হাত বুলাইয়া কোনও একটি বই চিনিতে পারা, ঘ্রাণ সাহায্যে কমলালেবু বলিয়া দেওয়া, এ সকল ক্রিয়াও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা বা ছাঁচের ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হয়। শব্দটি শুনিলে আমরা চলন্ত ট্রামগাড়ী মনে মনে দেখিতে পাইব, গন্ধ পাইলে কমলালেবুটির দর্শন ও আঘ্রাণ আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসিবে, ঠিক যেমন বইয়ের ছাপা অক্ষর দেখিলে উহার তাৎপর্য্যটিও আমাদের মনে আসে। সুতরাং একদিকে যেমন প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব সংবেদনের (sensation) মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনই আবার একই অবস্থায় সাধারণভাবে একরূপ সংবেদন হওয়ার ফলে সকল মানবের মধ্যে এক বিরাট যোগসূত্রও আছে।

বুদ্ধিগত ক্রিয়াগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষেরই বিকাশ ঘটে; আর ইহারই সাহায্যে অন্য ক্রিয়াসমূহেরও স্বরূপ বুঝা যায়। অনেক দার্শনিকের লেখা পড়িয়া এইরূপ ধারণা হয় যেন পশুদের নিম্নতর মানসিক ক্রিয়া আর মানুষের একান্ত নিজস্ব মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। এরূপ ধারণা যে ভুল তাহা ইতিপূর্ব্বেও (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) দেখা গিয়াছে। মানসিক ক্রিয়ার সকল স্তরেই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়োগ এক সঙ্গে চলিতে থাকে। একটি কুকুরের প্রত্যক্ষক্রিয়া ও একজন জ্ঞানী ব্যক্তির চিন্তার প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। ঐ উভয় প্রক্রিয়ার সীমা, জটিলতা ও বিষয়ের দিক দিয়া উহাদের মধ্যে প্রভেদ ঘটে।

এই পার্থক্যের প্রধান লক্ষণগুলি কি, তাহা দেখা যাক। আমরা দেখিয়াছি যে সাধারণ প্রত্যক্ষের বেলায়ও প্রায়ই আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষের সীমাটুকু ছাড়াইয়া যায়। যেমন আমি শুধু যে ঘড়ঘড় শব্দ শুনিলাম তাহা নহে, ট্রামগাড়ীর শব্দ শুনিলাম; শুধু একটি রঙ দেখিলাম না, কমলালেবু দেখিলাম।

পশুদের বেলায়ও এই ধরণের প্রত্যক্ষের ক্রিয়া কতখানি উন্নত হইতে পারে, কুকুরের ন্যায় বুদ্ধিমান পশুর আচরণে তাহা লক্ষ্য করা যায়। প্রভু বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, উহা দেখিয়া সেও নিজের বেড়াইতে যাইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল। ইঞ্জিনীয়ার যখন একটি যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি আয়ত্ত করেন, বা কৃষক আকাশ ও বায়ুর অবস্থায় আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পান বা চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ দেখিয়া ব্যাধি এবং উহার ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে অবগত হন, ইঁহাদের এই জ্ঞানমূলক ক্রিয়াসমূহের সহিত কুকুরের ক্রিয়াটির প্রভেদ প্রধানতঃ এই যে, ইঁহাদের ব্যবহৃত মানসিক ছাঁচগুলি অনেক বেশী ব্যাপক ও জটিল। সুতরাং উন্নত সংশ্লেষণ শক্তি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার একটি লক্ষণ।

ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ হইল সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ক্রিয়া বা বিমূর্ত্তন। খুব বুদ্ধিমান কুকুরের বেলায় হয়ত দেখা যাইবে যে সে প্রভুর পোষাকের ধরণটি দেখিয়া এতদূর বুঝিতে পারে যে, ইহা কি তাঁহার হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইবার পোষাক, অর্থাৎ তাহাকে কি তিনি সঙ্গে লইবেন, না অন্যরূপ পোষাক। কিন্তু শিশুর বিশ্লেষণশক্তি অতি সত্বর কুকুরের সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যায়। যেমন আট বৎসরের শিশু হয়ত একটি আয়তক্ষেত্র দেখিল। উহা ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া, আর ১ বর্গ ইঞ্চিতে সমগ্র ক্ষেত্রটি ভাগ করা আছে। এ স্থলে সে সহজেই বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিতে পারিবে যে চার সারির প্রত্যেকটিকে ছয়টি করিয়া ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র আছে। সুতরাং সে না গণিয়াও বলিতে পারিবে যেক্ষেত্রটির আয়তন ৬ × ৪ বর্গ ইঞ্চি। উপরন্তু এই বিশ্লেষণেরই আরও সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা তাহার থাকিবে; কারণ সে বুঝিতে পারে যে এই আয়তক্ষেত্রের যে গুণ সে লক্ষ্য করিয়াছে, অন্য যে কোনও আয়তক্ষেত্রের বাহুগুলি যদি পূর্ণসংখ্যক ইঞ্চিতে মাপা যায়, তবে উহারও সেই গুণটি থাকিবে। অর্থাৎ, এই আয়তক্ষেত্র ও অপর আয়তক্ষেত্রের অন্য পার্থক্যগুলি বাদ দিয়া, উহাদের আকারগত যে গুণটি আছে, কেবল উহাতেই মন দিবার ক্ষমতা তাহার আছে। কারণ এই গুণটি আকারের উপর নির্ভরশীল বলিয়া, যে ক্ষেত্রটিরই এইরূপ আকার দেখা যাইবে, তাহার এই গুণও থাকিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে। গণিত ও বিজ্ঞানের যুক্তি অনুসরণ করিতে গেলে

উচ্চতর বিশ্লেষণশক্তি যে প্রথমেই আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে কথা বলা বাহুল্য। যেমন, বলবিদ্যায় (mechanics) আমরা বিভিন্ন বস্তুর কথা ছাড়িয়া উহাদের গতি এবং তাহার পরস্পর ক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করি। আলোকবিদ্যায় (optics) আলোকের প্রতি বস্তুর ক্রিয়া লক্ষ্য করি।

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মনোবিদেরা বলেন যে পশুর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ যে বস্তু বা ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে, সচরাচর তাহার স্থান উহাদের মনে থাকে না। এ নিয়মের অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। যেমন, কুকুর আওয়াজ করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে সে বেড়াইতে যাইতে চায়। তাহা হইলেও যে সব বস্তু বা ঘটনা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, সেগুলিতে মন দেওয়া প্রধানতঃ মানুষেরই ধর্ম্ম। সাধারণতঃ এইরূপ মানসিক ক্রিয়াকেই আমরা চিন্তা (thinking) বলি। চিন্তার সময়ে প্রত্যক্ষ জগতের বস্তু হইতে ছাঁচ বা ধারণাগুলি বিমূর্ত্তন করিয়া লইয়া, অর্থাৎ এক কথায় ভাবসমূহ (ideas) লইয়া, আমাদের মনের ক্রিয়া চলে।

এইভাবে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর উপস্থিতি বা সহায়তা ব্যতিরেকে অবাধে চিন্তা করিবার শক্তির পরিমাণ অনেকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। মনের বিকাশ কতখানি হইয়াছে, কিরূপ অভ্যাসসমূহ গঠিত হইয়াছে, বিষয়টির সহিত কতদূর পরিচয় আছে, সেই অনুযায়ী এ শক্তিরও তারতম্য হয়। যেমন (উপরের উদাহরণে) একটি ছেলে সহজেই আয়তন নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিল। ইহা অবশ্য চিন্তার ক্রিয়া। কিন্তু একথাও সত্য যে, প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত এক বাস্তব আয়তক্ষেত্রের সহায়তায় যদি তাহার ধারণাসমূহ গঠিত ও পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে এ আবিষ্কার তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহার মন এই আয়তক্ষেত্রটিকে বিশেষ এক আয়তক্ষেত্র রূপে না দেখিয়া সকল আয়তক্ষেত্রের প্রতীক (symbol) বলিয়া গণ্য করিতে পারে, তবে এই প্রতীকটির সাহায্য না লইয়া সকল আয়তক্ষেত্র সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হইতে পারে না। শিশুর ও অশিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তায় অনেক সময়ে এইরূপ বস্তুর প্রতীকের আবশ্যক হয়, নহিলে

তাহাদের মনে ধারণাগুলি কাজ করিতে পারে না। আঙ্গুল গণা এবং এইরূপ পরিচিত অনেক ক্রিয়ায় ইহা দেখা যায়। সেক্সপীয়ারের এক নাটকে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। একজন লোক কিরূপে তাহার স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে, উপরের ন্যায় বস্তুর প্রতীকের সাহায্য ছাড়া সে উহা পারিত না। বর্ণনাকালে তাহার জুতাযোড়া হইত তাহার মাতাপিতা, ছড়িটি হইত ভগ্নী, এবং টুপীটি হইয়া যাইত বাড়ীর দাসী। অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও অনেক সময়ে একটি কঠিন বা সূক্ষ্ম ধারণা আয়ত্ত করার কালে স্থূল বস্তুর প্রতীকের উদাহরণ সম্মুখে থাকিলে সেই ধারণাটিও আরও সহজে বুঝিবার সুবিধা হয়; এমন কি অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষী আছেন, যাঁহাদের মানসিক ক্রিয়া এই প্রণালীতে ছাড়া চলিতেই পারে না। যেমন, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) বলেন যে উপযুক্ত প্রতিরূপ বা মডেলের (model) অভাবে আলোকের তড়িৎ চুম্বকঘটিত তথ্যটি তিনি কখনও মানিয়া লইতে পারেন নাই। সুতরাং বিদ্যালয়ে সূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষা দিবার সময়ে মডেলের ব্যবহার এইভাবে মনোবিদ্যা দ্বারা সমর্থিত হয়। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই মডেল ব্যবহারে আপত্তি করেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ইহার ফলে শিক্ষার্থীর স্বকীয় চিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগের প্রেরণা বাধা পায়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিপরীত পক্ষে মনের ক্রিয়াগুলি চালিত করিবারই ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়; কোন কোন লোকের ইহার প্রয়োজন মাঝে মাঝে হয়, আবার কাহারও সর্ব্বদাই হয়।

ছবি ও নক্সার (diagram) ব্যবহারও এই পর্য্যায়ভুক্ত। অবশ্য আসল বাস্তব রূপ মডেলের তুলনায় এগুলিতে কম প্রকাশ পায় বলিয়া চিন্তার পরিচালনায় ইহাদের সহায়তাও অল্প হয়। ছবি ও ফটোতে রেখা ও রঙের বিন্যাসে যে বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠে, আমাদের মন উহাকে প্রতীকরূপে গণ্য করে, প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে নহে। এই প্রতীকের সাহায্যে মনে চিত্রিত বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি ছাঁচ বা ধারণার সৃষ্টি হয়। তেমনই, ছোট ছেলে মেকানো (Meccano) লইয়া খেলিবার কালে নক্সা দেখিয়া হয়ত এক সেতু বা ষ্টীমার নির্ম্মাণের ছাঁচটি আয়ত্ত করে। ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল

বলিয়া সে উহা মনে রাখিতে পারে না, তাই বার বার উহার প্রতীকরূপ নক্সাটি দেখিবার প্রয়োজন হয়। বীজগণিতে সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধেও মূলতঃ এই ব্যাখ্যাই খাটে। বীজগণিতের সাঙ্কেতিক রাশিগুলিও প্রত্যক্ষ বস্তুর মত, উহাদের প্রতীকরূপে রাখিয়া সংখ্যার পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। যেমন, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, ইহাতে দুইটি সংখ্যার এক বিশেষ সম্পর্ক প্রতীক সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। বীজগণিতের রাশির সাহায্যে গণিতবিৎ প্রথমে একটি সম্পর্কের ধারণাটি আয়ত্ত করেন; পরে তাঁহার মনে এই ধারণাটি হইতে উদ্ভূত অপর ধারণার সৃষ্টি হয়।

যখন আমাদের চিন্তায় কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ বস্তু বা প্রতীকের সহায়তা না থাকে, তখনই আমাদের ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ অবাধ বলা যাইবে। যে কোনও লোকের এইরূপ অবাধ চিন্তার মধ্যে পরিচিত বস্তু ও ঘটনা, অতীত ও ভবিষ্যতের কথা, কল্পনার সুখস্বপ্ন, এসবই স্থান পাইতে পারে। আবার প্রতিভাশালী মনীষীর মনে অতি উচ্চ স্তরের সূক্ষ্ম চিন্তা ও যুক্তির ক্রিয়া কেবলমাত্র ধারণাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ বস্তু বাদ দিয়া) চলিতে পারে। কোনও গণিতজ্ঞ প্রকাণ্ড ও দুরূহ গণিতের অঙ্ক মনে মনেই সমাধা করিতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও চিন্তার মধ্যে প্রতিরূপের (image) সহায়তা আবশ্যক হয়। আর প্রতিরূপ প্রত্যক্ষীভূত বস্তু বা ক্রিয়ার মানসিক চিত্র ছাড়া কিছু নয়, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ দার্শন প্রতিরূপ বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ স্বরূপ বলিয়া সাধারণ লোকের চিন্তা ও যুক্তিতে উহার স্থান খুব বেশী থাকে। দার্শন প্রতিরূপের সৃষ্টি করিতে না পারিলে বহু জিনিষের বর্ণনা অনেক লোকের প্রায় বোধগম্যই হয় না; তেমনই অনেক যুক্তির মধ্যেও, বস্তুসমূহের ক্রিয়ার চিত্রটি মোটামুটি স্পষ্টভাবে মনে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রধানতঃ থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের প্রারম্ভে জ্ঞান ও ক্রিয়ার পার্থক্য দেখাইতে গিয়া যে উদাহরণ দুইটি দেওয়া গিয়াছে, সেগুলি এ স্থলে প্রযোজ্য। যুক্তির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিরূপ কি ভাবে ক্রিয়া করে, তাহার আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বলা হইল যে, খ ক'এর উত্তর দিকে, গ খ'এর ঠিক ততখানি পূর্ব্বে, তাহা হইলে গ ক'এর কোন দিকে? এখানে গ ক'এর উত্তর পূর্ব্বদিকে,

যুক্তিদ্বারা এই উত্তর পাইতে গেলে দার্শন প্রতিরূপের ক্রিয়া আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

চিন্তার সর্ব্বপ্রধান বাহন হইল ভাষা, এখন তাহারই আলোচনা করা যাইবে। ভাষায় যখন লিখিত বা কথিত শব্দের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হয়, তখন উহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বস্তু। আবার আমাদের চিন্তার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রতিরূপের আকারেও, যেমন, দর্শন, শ্রবণ বা চেষ্টার প্রতিরূপে, ভাষার ব্যবহার চলে। ভাষা সম্পূর্ণরূপেই সামাজিক ব্যাপার। যেখানেই প্রাণীগণ আসঙ্গপ্রবৃত্তির প্রভাবে আত্মরক্ষা বা খাদ্যান্বেষণের চেষ্টায় মিলিত হয়, সেখানেই ভাষার প্রাথমিক ব্যবহার দেখা যাইবে।

অতি অল্পবয়স হইতেই শিশু নানারূপ শব্দ করে। সেই শব্দ এক দিকে সুর তাল বিশিষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয়, পরে উহাই সঙ্গীত হইয়া উঠে; অন্যদিকে এই শব্দ হইতেই শিশুর কথা বলা আরম্ভ হয়। মুগ্ধ মাতাপিতা প্রথম হইতেই উহার মধ্যে কথার আভাস পাইয়া থাকেন। শিশু কিভাবে কথা বলিতে শিখে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি বিষয় জানা গিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রকৃতিস্থ শিশু মাত্রেরই খুব অল্প বয়সেই ভাষার প্রতি অদম্য আগ্রহ হয়। দ্বিতীয়তঃ, কথার অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্বনিগুলি শুনিতে পাইবার এবং উচ্চারণ করিবার শক্তি তাহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। তৃতীয়তঃ, এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইলে, শুধু শব্দ ও বাক্যাংশ নয়, এমন কি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভাষার ধরণগুলি পর্য্যন্ত দ্রুত ও শুদ্ধভাবে আয়ত্ত করিবার শক্তিও তাহার বৃদ্ধি পায়। কারণে অকারণে ও খেলার মধ্যে অনবরত অভ্যাসের দ্বারা ইহার বিকাশ ঘটে। সে কথা মনে না রাখিলে এই শক্তি আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকিবে।

প্রথম কয়েক মাস শিশু যে সমস্ত কথা (অর্থাৎ শব্দ) উচ্চারণ করে, সেগুলি ঠিক নাম নহে। বরং উহা দ্বারা অনুভূতি বা ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। এমন কি শিশু যে প্রথমেই 'মা, বাবা' শব্দ বলিতে শিখে, অনেক ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এগুলি আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র, পরে মাতাপিতার প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের এই নামকরণ হয়। সম্ভবতঃ মানবজাতির ইতিহাসে ভাষার অনেকখানি এইরূপ অনুভূতির বাহন হিসাবেই প্রথমে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, মানুষ তাহার আদিম জীবনের অভিজ্ঞতা বা ভাবগুলির সাহায্যে জগতের জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলির তাৎপর্য্য বুঝিবার ও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। পৌরাণিক গল্পে, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানে এবং স্বপ্নের মধ্যেও এই আদিম ভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এক কথায় মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে নানা ব্যাপারেই ইহার প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে যেমন একটি অদ্ভুত বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে, অতি সূক্ষ্ম বস্তু বা ক্রিয়াকে পরিচিত কোনও ভাবের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন, যখন আমরা বলি 'বিদ্যুৎ প্রবাহ' বা 'আণবিক শক্তি' তখন এই দুইটি জটিল ব্যাপার আমাদের সুপরিচিত ধারণার সাহায্যে (শক্তি, দেহের মধ্যেই ইহা বিদ্যমান ; প্রবাহ, ইহাও আমাদের পরিচিত) প্রকাশ করা হইতেছে। কবির কল্পনাতেও অবশ্য অন্য পদ্ধতিতে হইলেও এইরূপই রূপান্তর ঘটে। কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি জগতের সাধারণ বিষয় ও দৃশ্যগুলিকেও বহু উচ্চতর ভাবের প্রতীকরূপে দেখেন। তিনি দেখাইয়া না দিলে উহাদের মধ্যে সেই ভাবের সন্ধান সাধারণ লোকে পাইত না। কল্পনার প্রভাবে যেন আমাদের চোখের সামনের পর্দ্দাটি সরিয়া যায়, আর তখন আমরা সব জিনিষের আসল রূপ ও সৌন্দর্য্যটি দেখিতে পাই। তাই কবি বলিয়াছেন যে কল্পনাবিহীন মানুষের দৃষ্টিতে মাঠের ফুলটি এক ফুলই মাত্র, তাহার বেশী কিছু নয়।

এখন আমরা যে প্রসঙ্গটির আলোচনা করিব, শিক্ষার দিক হইতে তাহার বিরাট গুরুত্ব আছে। তাহা হইতেছে স্মৃতি (memory)। স্মৃতির দ্বারা আমরা অতীত ঘটনা মনে রাখিতে এবং প্রয়োজনমত মনে আনিতে সমর্থ হই। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে স্মৃত্যুপস্থান বা স্বতঃস্মৃতির (mneme) কথা যাহা বলা গিয়াছিল, তাহা এখন মনে করিতে হইবে। সেখানে বলা গিয়াছিল যে প্রাণীর নিজ ক্রিয়ার প্রভাবসমূহ সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার যে স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, তাহাই হইল স্বতঃস্মৃতি। আরও দেখা গিয়াছিল যে, আমাদের বর্ত্তমান ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব থাকে, কারণ এগুলি আমাদের মনে স্থায়ী ছাপসমন্বয়ের সৃষ্টি করে। স্মৃতি শব্দটি অবশ্য স্বতঃস্মৃতির চেয়ে অনেকটা সঙ্কীর্ণ বুঝিতে হইবে। স্বতঃস্মৃতি সংজ্ঞান বা উপলব্ধির স্তরে

উপনীত হইলে তবেই তাহাকে স্মৃতি বলা চলিবে। ম্যাক্‌ডুগাল বলিয়াছেন যে, সমুদয় মানসিক ক্রিয়াতে অতীতের প্রভাব অস্পষ্টভাবে থাকে, স্মৃতির বেলায় অন্যান্য ক্রিয়ার চেয়ে তাহা স্পষ্ট ও মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

স্বতঃস্মৃতি ও স্মৃতির এই প্রভেদ কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইবে। অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করার বিষয়ে এই পরীক্ষা হইয়াছে। হয়ত কতকগুলি অর্থহীন শব্দ আমরা মুখস্থ করিলাম, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে সেগুলি মনে করা দূরে থাক, দেখিলে চিনিতেও পারিব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যাইবে যে আবার যদি এগুলি মুখস্থ করিতে যাই, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অল্পবার পড়িলেই সে চেষ্টা সফল হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রথমবারের চেষ্টার ফলে কয়েকটি ছাপসমন্বয় মনের মধ্যে সৃষ্ট ও সক্রিয় হইয়াছে। ইহাকে অবশ্য স্মৃতি বলা যায় না। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার এমন হয় যে শব্দগুলি দেখিয়া চিনিতে পারি যে এগুলিকে পূর্ব্বে শিখিয়াছিলাম, তবে তাহাকে প্রাথমিক স্তরের স্মৃতি বলা চলিবে। সুতরাং এইভাবে চিনিতে পারিলে তবেই স্বতঃস্মৃতি সংজ্ঞাত স্মৃতির প্রাথমিক পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার পরস্পর সম্পর্কটিও আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার যদি আমরা শব্দগুলি না দেখিয়াই সব মনে করিতে পারি, তবে তাহা আরও উচ্চতর পর্য্যায়ের স্মৃতি হইল। যথার্থ স্মৃতি বলিতে অতীত ঘটনা ঠিক যেরূপ ঘটিয়াছিল, সেইভাবে স্মরণ করা বুঝায়।

সুতরাং স্মৃতি এক জটিল প্রক্রিয়া। মনের মধ্যে ছাপসমন্বয়ের সৃষ্টি, সেগুলির সংরক্ষণ এবং যে অভিজ্ঞতাসমূহের ফলে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের স্মরণ করা, এই সব ক্রিয়াই ইহার অন্তর্গত।

স্মৃতির বিষয়ে বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা হইয়াছে। তাহা হইতে বহু সারগর্ভ তথ্য জানা যায়। এই সমস্ত পরীক্ষায় সাধারণতঃ উপরের মত অর্থহীন শব্দই ব্যবহার করা হয়। কারণ ইহাতে অর্থ ও আগ্রহের প্রভাবে আর কোনও তারতম্য হইতে পারে না। এরূপ শব্দসমষ্টি পরীক্ষাধীন ব্যক্তি মাত্র একবার দেখিয়া উহাদের কতগুলি মনে রাখিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করা হয়; ইহার দ্বারা স্মৃতির পরিধি নির্ণীত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে একটি গুরুতর

সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের কোনও বিষয় শিক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা বলা এবং বিষয়টি স্থায়ীভাবে স্মরণ রাখার (retention) শক্তির মধ্যে প্রভেদ আছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা বা অল্পকালের জন্য মনে রাখা নির্ভর করে বিষয়টি যতবার পড়া যায় এবং যতখানি চেষ্টাকৃত মনোযোগ উহাতে দিতে পারা যায়, এই দুইটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে পারার শক্তি বয়স হিসাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে শিশুর এ ক্ষমতা বয়স্কের চেয়ে অল্প। একজন পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে এই শক্তি তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ইহার দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তাহার পরেও পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি চলিতে থাকে ; এই বয়সে উহা সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠে, পরে উহার সামান্য হ্রাস হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে, মনে রাখার বিষয়েও যে তাহার সেই নৈপুণ্য থাকিবে, তাহা নয়। এ বিষয়ে বয়স্ক মানুষ অপেক্ষা শিশু নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা সম্ভবতঃ এগার বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ে, তারপর কমিয়া যায়। সাধারণ মানুষেরও ত এই অভিজ্ঞতা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে খুব ছোটবেলায় যে কবিতাটি মুখস্থ করা গিয়াছিল, অনেক বছর পরেও সেটি আগাগোড়া স্মরণ আছে, অথচ পরবর্ত্তীকালে শেখা আর এক জিনিষ একেবারেই মনে নাই। সুতরাং আমাদের যে ধারণা আছে যে যাহা কিছু আজীবন মনে রাখিতে হইবে তাহা শৈশবেই শিক্ষা করা উচিত, সে ধারণা খুব ঠিক। কবিতা মুখস্থ করার বেলায় সমগ্র কবিতাটি একেবারে মুখস্থ করা ভাল, না কবিতাটি কতকগুলি অংশে ভাগ করিয়া লইলে সুবিধা হয়, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ শিশুদের পক্ষে মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের কবিতার বেলায় সমগ্র পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। আবার কবিতাটি দীর্ঘ হইলে আংশিক পদ্ধতি অথবা উভয় পদ্ধতি মিলাইয়া লইলে ভাল হয়। আরও দেখা যায় যে বিষয়টি যতবার পড়া যাইবে, তাহার মধ্যে আবশ্যকমত বিরাম দিলে শ্রমের সংক্ষেপ হয়। অর্থাৎ একটি সন্দর্ভ একদিনে ছয়বার পড়ার চেয়ে পর পর তিনদিন দুইবার করিয়া পড়িলে স্মরণ রাখার পক্ষে অধিক সহায়তা হয়। এই বিরামের সময়ে সন্নিবদ্ধতা (consolidation) হয়, শিক্ষার পক্ষে উহার গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

একটি গুরুতর প্রশ্ন হইল এই যে, অভ্যাস দ্বারা স্মৃতির উন্নতি করা যায় কি না। প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্মৃতির উৎকর্ষবিধান সম্ভবপর ; তাই শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে ছাত্রগণকে সচেষ্ট করিতে বলা হয়। আধুনিক গবেষকেরা দেখিয়াছেন যে মুখস্থ করিবার ক্ষমতা এবং স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে মুখস্থ করিবার শক্তি অভ্যাসের ফলে বৃদ্ধি পায়। উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মুখস্থ করার চেষ্টার ফলেই সম্ভবতঃ এ উন্নতি ঘটিয়া থাকে ; এরূপ পদ্ধতির কথা উপরে বলা হইয়াছে। মনোযোগের বেলায় যেমন, স্মৃতির বেলায়ও তেমনই, আগ্রহের (interest) বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে বিষয়টির অর্থ আমাদের কাছে পরিস্ফুট, তাহা অনেক সহজে মনে রাখা যায়। এইজন্য শিশুকে যাহা কিছু শিক্ষা করিতে দেওয়া হইবে, তাহার অর্থ যেন সে ভালরূপে বুঝিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একেবারে প্রথম অবস্থায়ও শিশুকে সাধারণতঃ এমন কিছু মুখস্থ করান উচিত নহে, যাহার তাৎপর্য্য তাহার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। স্মরণ রাখার শক্তি সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, অভ্যাসের দ্বারা ইহার বৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর নহে। তবে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করিবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করান, তাহা হইলে তাহার স্মৃতির বিশেষ সহায়তা হইবে।

এখন বিপরীত পক্ষে বিস্মৃতির ব্যাপারটি লওয়া যাক। ইহাকে বরং স্মরণ করিবার অক্ষমতা বলিলে ভাল হয়। কারণ সচরাচর দেখা যায় যে আমাদের যে বিষয়টির বিস্মৃতি ঘটিয়াছে, আসলে তাহা সে সময়ে স্মরণ করিতে পারিতেছি না ; বিষয়টি যে আদৌ মনে নাই, তাহা নহে। এরূপ ভুলিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ, সময়ের ব্যবধান ও আগ্রহের অভাব। এ বিষয়ে গবেষকগণ দেখিয়াছেন যে, কোন বিষয় শিক্ষা করিবার অল্পকালের মধ্যেই অধিকাংশ বিস্মৃতি ঘটে। এই সময়ের আমাদের মনে রাখার পরিমাণ যদি লেখ দ্বারা সূচিত করা হয় ত দেখা যাইবে যে, সে লেখ প্রথমে দ্রুতগতিতে নীচে নামিয়া যায়, পরে ক্রমশঃ প্রায় অনুভূমিক বা সমান হইয়া আসে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, অধীত বিষয়ের পুনরনুশীলন করিতে হইলে পাঠের অল্পকাল পরেই তাহা করা ভাল। তাহা ছাড়া মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড অবদমনের

(repression) ফলে যে শ্রেণীর বিস্মৃতির কথা বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তাহার কথাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যে কারণে আমাদের স্মরণের বাধা ঘটে, তাহা আগ্রহের অভাব নহে, বরং আতিশয্য বলা যায়। যে ভাবটি স্মৃতির মধ্য দিয়া অনুভূতিতে আসিলে মনে দ্বন্দ্ব (conflict) বাধিবার আশঙ্কা আছে, সেগুলির অবদমন করিবার চেষ্টা চলে। সাধারণ নানা ভুল ভ্রান্তি ও স্মরণের ত্রুটি এই পর্য্যায়ভুক্ত, যেমন, নাম মনে না আসা, চিঠি ফেলিতে বা কথা রাখিতে ভুলিয়া যাওয়া, কথা বলার, লেখার, নাম ঠিকানা লিখিবার ভুল প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে।

উপরের আলোচনায় প্রায় সকল উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। এখন দুটি বিষয়ের কথা আরও একটু বলা যাইবে, আবিষ্কার (invention) ও যুক্তি (reasoning)। সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার অধিক প্রাধান্য এই দুইটিতে দেখা যায়। আবিষ্কারের রূপটি দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান একটি ছাঁচের (schema) মধ্যেই অত্যাবশ্যক ও গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আবিষ্কার ঘটিতে পারে। যেমন, যে বালকটি বাষ্পীয় যন্ত্রের কাজ করিত, অসামান্য প্রতিভাবলে সে উহাতে দড়ি লাগাইয়া উহা আপনা হইতে চলিবার প্রণালী আবিষ্কার করিল। আবার নূতন এক ছাঁচেরও সৃষ্টি হইতে পারে ; যেমন আবিষ্কারপ্রতিভায় বয়নচক্র বয়নযন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু নবাবিষ্কৃত ছাঁচটির যতই নূতনত্ব মনে হউক না কেন, উহা সাধারণতঃ পরিচিত ছাঁচ বা উহার অংশসমূহের নূতন সংশ্লেষণ বা সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন ট্রামগাড়ী ও পাম্প করিবার যন্ত্রের সমন্বয়ে রেলগাড়ীর সৃষ্টি হইবে। সাধারণ গাড়ীর মধ্যে গ্যাস-যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিলে এবং উহা পেট্রোল দ্বারা চালিত করিলে মোটরগাড়ী হইবে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। সব মানুষের মনে যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি রহিয়াছে, আবিষ্কারকুশলী মনীষীর প্রতিভায় তাহাই অনেক অধিক পরিমাণে আছে। অর্থাৎ অন্য লোকের মন বাঁধাধরা নিয়মে চলে ; কিন্তু আবিষ্কারকগণ বস্তুর গুণ বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির গণ্ডীটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। বস্তুসমূহ হইতে উহাদের গুণগুলি বিশ্লেষণ বা বিমূর্ত্তন করিয়া লইবার ও নূতন নূতন সৃষ্টির আকারে উহাদের সমন্বয় সাধন করিবার অনেক বেশী

ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে। সর্ব্বোপরি, এই শক্তিকে ফলপ্রসূ করার জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন, তাহারও অভাব তাঁহাদের নাই।

নীতিগত ভাবে, এই শ্রেণীর আবিষ্কার এবং যে সব কুশলী লেখক এক কল্পিত ঘটনাকে বাস্তব রূপ দেন, তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। যেমন ডিফো (Defoe) এক কল্পিত অবস্থার মধ্যে কতকগুলি সম্ভব ঘটনার সমাবেশ করিয়া রবিন্সন ক্রুশোর (Robinson Crusoe) কীর্ত্তি কথা রচনা করিয়াছেন। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, ঔপন্যাসিকের ছাঁচটি শুধু কল্পনারই ব্যাপার, বাস্তব ক্ষেত্রে উহা কোনও কাজে আসে না। কিন্তু নিছক কল্পনার সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ, কল্পনা আবিষ্কারের মত বাস্তব ক্ষেত্র হইতেই উহার ছাঁচগুলি লয় বটে, কিন্তু সেগুলির সমন্বয়ে এক নূতন আকার গড়িয়া তুলিবার বেলায় বাস্তবের সহিত উহার সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করে না।

যুক্তির অন্তর্গত মানসিক ক্রিয়াও অনেকটা আবিষ্কারের মত। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এমন একটি নূতন ছাঁচের সৃষ্টির চেষ্টা করি, যাহার সহিত বাস্তবের সঙ্গতি রহিয়াছে। উপরের উদাহরণে বালকটি যখন বাষ্পযন্ত্রটি স্বতশ্চালিত করিল, তখন সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিল যে দড়িগুলি উহাকে চালাইতে পারিবে। তেমনই গল্পের ক্রুশোও যখন ছাগচর্ম্মের বস্ত্র করিল, তখন উহা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহাও দেখান হইয়াছে। উভয়েই যুক্তি দ্বারা যে সব ছাঁচ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে তাহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ অন্যান্য ছাঁচগুলির বিরোধী কিছু নাই, এই বিশ্বাসই তাহাদের ছিল। বিজ্ঞানের অধিকাংশ যুক্তিই এই ধরণের; যেমন ভূবিৎ প্রস্তরীভূত অস্থি দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহা কোনও অধুনালুপ্ত পশুর কঙ্কাল। যেখানে উহার মৃত্যু হয়, সেস্থানে উহা সমুদ্র বা নদীর কর্দ্দমে চাপা পড়ে। কারণ এখানে বাস্তবসঙ্গত এই একটি মাত্র ছাঁচের যুক্তি খাটিবে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত ইত্যাদির যুক্তি প্রণালী আবার অন্যরূপ। এক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূলতঃ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহা বস্তুর সমগ্র স্থূল দেহের বিচার না করিয়া বস্তুর 'নিয়ম' (law) আবিষ্কার করে। যেমন নিউটন (Newton) প্রদত্ত গতির নিয়মসমূহ বা চুম্বকের

আকর্ষণের (magnetic attraction) নিয়ম। এগুলিতে সমগ্র বস্তুটি না ধরিয়া উহার ক্রিয়ার কতকগুলি সূক্ষ্ম গুণ বা বিধান আলোচিত হইয়াছে। গণিতের ক্ষেত্রে এইরূপ বিমূর্ত্তন বা বিশ্লেষণমূলক যুক্তি অন্যান্য বিজ্ঞানকেও ছাড়াইয়া যায়। এমন কি এক এক সময়ে মনে হয় যে বাস্তব জগতের সহিত ইহার কোনও সম্পর্কই নাই। আসলে অবশ্য তাহা নয়। সব রকমের সংখ্যা, ভগ্নাংশ, জটিল, অমূলদ (irrational), যেমনই হউক না কেন, শিশু যে সংখ্যা গণনা করে, তাহারই বৃহত্তর রূপ। তেমনই জ্যামিতির সমস্ত আবিষ্কার ও অনুশীলনও প্রত্যক্ষ বস্তুর গুণ ও সম্পর্ক বিচারের ফলেই সম্ভব হয়।

এখন মনোবিদ্যার এক আধুনিক শাখার উল্লেখ করা যাইবে। ইহার নাম সামগ্রিক মনোবিদ্যা (Gestalt Psychology বা Form Psychology)। এই গ্রন্থে বর্ণিত যুক্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে, শিক্ষা সম্পর্কেও ইহার কার্য্যকরী তাৎপর্য্য যথেষ্ট দেখা যায়। কয়েকজন নবীন জার্ম্মান মনোবিৎ মনোবিদ্যার এই নূতন বিভাগটির পথপ্রদর্শন করেন, ও এ সম্পর্কে বহু মূল্যবান পরীক্ষামূলক তথ্যাদি আবিষ্কার করেন। সামগ্রিক মনোবিদ্যার মূলকথাটি সংক্ষেপে হইল এই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রাণীর যে প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা যায়, সেখানে প্রতিক্রিয়া শব্দটির পদার্থবিজ্ঞানে প্রযুক্ত অর্থ টি খাটিবে না। উহাকে সাড়া বা উত্তর (অর্থাৎ চেতনাপ্রসূত) মনে করিতে হইবে। একদিকে দেখিতে হইবে যে প্রাণীর সংবেদন নিষ্ক্রীয় বা নির্জ্জীব নহে। উহার গঠন বা সৃষ্টিমূলক ক্ষমতা আছে, তাহারই সাহায্যে সমগ্র অবস্থাটি এক ছাঁচ বা প্রতিকৃতিরূপে জীবের জ্ঞানগোচর হয়। অপর দিকে প্রাণী যে ক্রিয়া দ্বারা সেই অবস্থায় সাড়া দেয়, তাহাও যান্ত্রিক (mechanical) বা নির্জ্জীব নহে। সে ক্রিয়ার মূল গতিটি প্রবৃত্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এবং প্রতিবর্ত্ত (reflex) দ্বারা চালিত হইতে পারে। কিন্তু বাহ্য পরিস্থিতিটি জ্ঞানগোচর হওয়ার ফলে প্রাণীর মনে যে ছাঁচটি গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রাণীর ক্রিয়ার ছাঁচটিও ঠিক তদনুযায়ী হইবে।

পশুগণের আচরণে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর পরীক্ষা মনোবিৎ কেহলার (Kohler) করিয়াছেন ; ইনি সামগ্রিক

মনোবিদ্যার স্রষ্টাগণের অন্যতম। তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল, বানরের মনোবৃত্তি। বানরের মনে অদম্য কৌতূহল ও ক্রিয়াতৎপরতা আছে, কলা খাইবার লোভও কম নহে। এই জন্য কেহলার কতকগুলি কলা বিভিন্ন অবস্থায় এমনভাবে রাখিলেন যে সোজাসুজি চেষ্টায় সেগুলি পাওয়া যাইবে না। কলাগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে একটু জটিল ক্রিয়ার প্রয়োজন। দেখা গেল যে এইরূপ নানা অবস্থায় রাখা কলাগুলির সম্মুখে বানরেরা যখন আসিল, তখন এমন ক্ষেত্রে মানুষের যেরূপ হইত, তাহাদেরও ঠিক তেমনই বুদ্ধির নানাবিধ তারতম্য লক্ষ্য করা গেল। কলা সংগ্রহ করার ব্যাপারে, যে সমস্ত বস্তু তাহাদের চোখের সামনে ছিল, সেগুলি ব্যবহার করার মধ্যেই প্রধানতঃ তাহাদের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ রহিল। যেমন যে কলাটির তাহারা নাগাল পাইল না, তাহা পাড়িবার জন্য খাঁচার এক কোণ হইতে একটি বাক্স আনিয়া কলার নীচে রাখিল, প্রয়োজন হইলে আরও এক বাক্স আনিয়াও প্রথমটির উপরে স্থাপন করিল। অধিকাংশ বানরেরই এতটা বুদ্ধি দেখা গেল যে, প্রয়োজন মত তাহারা কলাটি যষ্টী দিয়া পাড়িবার চেষ্টা করিল, শুধু তাহাই নয়, কলাটি ঠেলিয়া আর এক দিকে লইয়া গিয়া পাড়িবার সুবিধাও করিয়া লইল। অর্থাৎ সমগ্র পরিস্থিতির এক জটিল প্রতিকৃতি বা ছাঁচ গড়িয়া লইয়া তদনুযায়ী ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা তাহাদের দেখা গেল। তবে সব চেয়ে বুদ্ধিমান যে বানরটি, সে আরও অনেকখানি বুদ্ধির পরিচয় দিল। খেলাচ্ছলে সে একটি যষ্টি লইয়া অপর একটির ফাঁপা মুখটিতে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এইভাবে দীর্ঘ যষ্টীর সাহায্যে চতুর বানর দূরের কলাগুলিও পাড়িয়া লইতে সক্ষম হইল। আরও এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় সে দিল, অন্য কোনও বানর তাহা পারে নাই। খাঁচার বাহিরে এক মই ছিল, সেটি আনিয়া তাহাতে চড়িয়া সে কলা পাড়িয়া লইল।

ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে প্রত্যক্ষ স্তরের (perceptual level) বুদ্ধিযুক্ত ক্রিয়ায় এবং মানুষের সূক্ষ্ম যুক্তির মধ্যে মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই। কেহলারের মনোজ্ঞ পরীক্ষাসমূহ দ্বারাও সেই যুক্তিই সমর্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষার দিক ইহতে এই তথ্য গুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহা ছাড়া জ্ঞানের ক্রিয়া সম্বন্ধে স্পিয়ারম্যানও সম্প্রতি যে মূল্যবান নীতিগুলি আবিষ্কার

করিয়াছেন, শিক্ষার বিধি ও প্রয়োগের সমগ্র ক্ষেত্রে সেগুলির অশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ইনি দেখাইয়াছেন যে সমস্ত জ্ঞানমূলক ক্রিয়াই তিনটি সহজ নিয়মের অনুবর্ত্তী। এ গুলিকে বলা হয় জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম (noe-genetic principles)। নিয়মগুলি হইতেছে, অভিজ্ঞতার উপলব্ধি (apprehension of experience), সম্পর্ক নির্ণয় (eduction of relations) ও অনুবন্ধী নির্ণয় (eduction of correlates)। প্রথম নিয়মটি এই যে, যখনই কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসে, তৎক্ষণাৎ আমরা উহার গুণগুলিও অনুভব করি। যেমন, একটি রঙ আমাদের অনুভূতিগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গেই সেটি যে সবুজ রঙ, সে কথাও আমাদের মনে আসিবে। তেমনই কোনও শব্দ, গন্ধ বা ক্রিয়ার বেলায়ও উহাদের স্বরূপটি আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আসিবে। আর তাহারই সঙ্গে অনুভবকারীর নিজের জ্ঞানটিও জাগিবে। অর্থাৎ শুধু যে সবুজ রঙটি আমার অনুভূতির মধ্যে আসিল তাহা নহে; আমিই যে সবুজ রঙটি দেখিলাম, সে জ্ঞানও আমার মনে জাগিল।

দ্বিতীয় নিয়মটিতে এক ধরণের বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য ও উহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, সেইটি ধরা হইয়াছে। যেমন, মনে করা যাক যে দুইটি সবুজ দাগ আছে, তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিক গাঢ় ও বৃহৎ। প্রথম নিয়মটিতে দেখা গিয়াছে যে, এরূপ স্থলে আমি দুটি দাগেরই স্বরূপ দেখিব। এখন দ্বিতীয় নিয়মটির কথা এই যে, এক্ষেত্রে আমি যে শুধু দুটি দাগ দেখিব, তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আমার মনে বিকাশ পাইতে থাকিবে যে, প্রথমটি দ্বিতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর ও গাঢ়তর। তেমনই পর পর যদি এমন কয়েকটি সংখ্যা সাজান থাকে যে প্রত্যেক সংখ্যা আগের সংখ্যাটির দ্বিগুণ, তবে সেগুলি দেখিলে সংখ্যাগুলি যেমন বুঝা যাইবে, সেইরূপ, সংখ্যাগুলি কয়েকবার দেখিতে দেখিতে উহাদের মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্কটি আছে, সেই জ্ঞানেরও উদয় হইবে।

ইহারই ঠিক বিপরীত ব্যাপার তৃতীয় নিয়মে দেখা যাইবে। যেমন আমাকে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র দেখাইয়া ইহার চেয়ে বড় একটি ক্ষেত্র আঁকিতে বলা হইল। জ্ঞানোৎপত্তির তৃতীয় নিয়ম অনুসারে, এই বড় সম্পর্ক বিশিষ্ট ক্ষেত্রটির অনুবন্ধীর জ্ঞানও আমার মনে আসিবে ও আমি নির্দ্দিষ্ট চিত্রটি

আঁকিতে পারিব। ইহার আর একটু জটিল দৃষ্টান্ত এই। হয় ত কোনও অনুষ্ঠানের শেষে বাদ্যযন্ত্রে জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মানুষের মানসিক ক্রিয়া কোন পথে চলে, তাহার অতি সরল নির্দ্দেশ এই নিয়মগুলিতে পাওয়া যায়। এবং সকল স্তরের চিন্তাতেই এগুলি ঘটিবে। আমাদের মনের ধর্ম্ম এই যে, যখনই কোনও ক্রিয়া আমাদের অভিজ্ঞতাগোচর হয়, তখনই মনের মধ্যে উহার সম্পর্ক ও অনুবন্ধীর বিচার আরম্ভ হয়। এই-ভাবে অভিজ্ঞতাটির মধ্যে নূতন অর্থ ও তাৎপর্য্য (meaning) আসে। এই অর্থটি কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে আমাদের মনে ইতিপূর্ব্বেই যে সমস্ত ভাব ও সম্পর্কজ্ঞান সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহারই উপর। এইজন্য একই ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই নিয়মগুলি দ্বারা আমাদের পূর্ব্বকথিত এই উক্তিটি প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম যুক্তির মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য নাই। কারণ দেখা যাইতেছে যে উভয় ক্ষেত্রেই একই নিয়ম বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়া করে; উপরন্তু প্রত্যক্ষীভূত ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশেই যুক্তির ক্রিয়া আসে। তাহা ছাড়া যে মানসিক ছাঁচ (schema) ও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ক্রিয়ার (analytico-synthetic activity) উপর এই গ্রন্থে আগাগোড়া গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, উহাদের প্রকৃতিও এই নিয়মগুলির সাহায্যে ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। আবার শিক্ষানীতি ছাড়া হাতে কলমে শিক্ষাদান কার্য্যেও এই নিয়মসমূহ হইতে সহায়তা পাওয়া যাইবে, কারণ এগুলির সাহায্যে শিক্ষাদান পদ্ধতির দোষগুণ বিচার যথাযথভাবে করা যাইবে।

উপরের আলোচনাটি সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আত্মসাম্মুখ্যের যে বাহ্য প্রকাশ জ্ঞানমূলক ক্রিয়ায় দেখা যায়, তাহার আপাত লক্ষ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই এক। সে লক্ষ্য হইল যে, ব্যক্তি নিজ সৃষ্টিমূলক স্বাধীন সত্তা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টায় অনরবত বহির্জগতের উপর নিজ বুদ্ধিগত আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়। শৈশবে সে চেষ্টা প্রত্যক্ষগত ক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায়। শিশু যখন চকচকে রূপার চামচ দেখিয়া আনন্দ পাইল, অথবা উহাকে খেলিবার জিনিষ বলিয়া চিনিতে পারিল, তখনই সেটির

উপর তাহার বুদ্ধিগত আধিপত্য খানিকটা আসিয়া গিয়াছে। আবার মানসিক পরিণতির সঙ্গে এই নিষ্ক্রান্ত আপাত লক্ষ্যের ভিতর হইতে সংজ্ঞাত উদ্দেশ্যের তিনটি ধারার আবির্ভাব হয়। এগুলি সর্ব্বদা পরস্পরের সংস্পর্শ আসিলেও সম্পূর্ণ পৃথক। এই উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যবহারিক (practical), সৌন্দর্য্যমূলক (æsthetic) এবং নৈতিক (ethical), এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন করা যাইবে।

জ্ঞানমূলক ক্রিয়ার ব্যবহারিক দিকটি সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। আমাদের অনেক জ্ঞানের ক্রিয়ারই কোনও স্পষ্ট কার্য্যকরী উদ্দেশ্য থাকে। যেমন পথিক যে পথ জানিয়া লইতেছে, তাহার কারণ সে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে চায়। যে ব্যক্তি দক্ষ মোটরগাড়ীর চালককে যন্ত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, গাড়ী চালাইতে শেখাই তাহার উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেও অনেক সময়ে প্রত্যক্ষভাবেই এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে, তবে কোনও কোনও স্থলে ইহা থাকে না বা চোখে পড়ে না। যে বালক সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ কেন হয় উহার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী, তাহার অবশ্য এমন আকাঙ্ক্ষা থাকে না যে সে ইচ্ছামত গ্রহণ ঘটাইবে, কিন্তু তাহার এই মনোভাবে জ্ঞানের আধিপত্য লাভের ইচ্ছা বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ বিজ্ঞানচর্চ্চা বলা হয়, তাহার মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে কোনও অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। অতএব অধিক স্থলেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যবহারিক আধিপত্য, বা অন্ততঃ প্রকৃতির উপর বুদ্ধির অধিকার বিস্তার, একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে যদি মনে করা যায় যে নিউটন, ফ্যারাডে, ডারউইন, জগদীশচন্দ্র, আইনষ্টাইন, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মূল্য শুধু প্রকৃতির উপর প্রভুত্বলাভ, তবে বড় ভুল হইবে। এ সমস্ত আবিষ্কার অবশ্য বস্তুগত; যাহা আছে, তাহার প্রতিই ইহার লক্ষ্য, সুতরাং ইহা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহার অন্য দিকটি বিচার করিলে ইহাকে সৌন্দর্য্য বা শিল্পের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়। শিল্পের মধ্যেও উপযোগ বা কার্য্যকরিতার (utility) স্থান আছে, কিন্তু উহা শিল্পসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কারণ, যখন জ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু কার্য্যোদ্ধার, তখন মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্রিয়াও শুধু সেই কার্য্যের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্লান্ত পথিক সহরের আকারটির

বৈশিষ্ট্য বা দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে কেবল সেইটুকু জ্ঞানলাভ করিবে, যেটুকুর সাহায্যে সে নিজ গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারে। তেমনই পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নের পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলিই শুধু পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মানসিক ক্রিয়া সেই ক্রিয়াটিকে উদ্দেশ্য রাখিয়াই চালিত হয়, উহার বহির্ভূত কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নহে। শিল্পকলা সম্বন্ধে যে কথা প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (Benedetto Croce) বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে সুবিধা হইবে। ক্রোচে বলেন যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ বা সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পকলার আসল সার্থকতা। অর্থাৎ, আগে যাহা বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি শিল্পের মধ্যে দেখা যায়। চিত্রকর যখন কোনও মানুষ বা দৃশ্যের সুন্দর ছবি আঁকিতে বসেন, তখন সকলে সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছে, ঠিক তাহারই যথাযথ চিত্র সৃষ্টি করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার স্বজ্ঞায় (intuition) ব্যক্তি বা দৃশ্যটি যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে রূপায়িত করাই তাঁহার কার্য্য। এমন কি যাহা স্বভাবতঃ কুরূপ, তেমন বস্তুরও একখানি মনোরম চিত্র হয়ত তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। আমরা যখন দেখি যে শিল্পীর অমৃতময় দৃষ্টিতে সাধারণ বা সৌন্দর্য্যহীন বিষয়ও সুন্দরে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আমরাও উহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই, অর্থাৎ উহাতে প্রকাশভঙ্গীর সার্থকতা দেখিতে পাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিল্পীর মনে যে গঠন বা সৃষ্টিমূলক ক্রিয়া চলে, তাহাই শিল্পকলার আসল কার্য্য। যে কবিতাটি পড়িতেছি, অথবা যে চিত্র বা মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা এই ক্রিয়ারই সফল রূপ, এবং শিল্পীর সৃষ্টিপ্রচেষ্টা অপরের কাছে পৌঁছিয়া দিবার পন্থাস্বরূপ। আর শিল্পীর বার্ত্তা যখন আমাদের মনে সাড়া দেয়, অর্থাৎ আমরা যখন তাঁহার শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য্য অনুভব করি, তখন উহা সৃষ্টি করিবার সময়ে যে ক্রিয়াসমূহ তাঁহার মনে চলিয়াছিল, সেগুলি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের মনেও চলিতে থাকে। এ বিষয়ে ইংরাজ দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের (Alexander) অভিমতও ক্রোচের অনুরূপ। তিনি বলেন যে শিল্পের উৎপত্তি যে ক্রিয়ার

ফলে হয়, তাহার উদ্দেশ্য স্বকীয় উৎকর্ষ বর্দ্ধন। সৌন্দর্য্যানুভূতি সম্বন্ধেও তিনি ক্রোচের সহিত একমত। শিক্ষায় সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশসাধনের পক্ষে ইহার সমধিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোনও শিল্পবস্তুর, যেমন কবিতা বা চিত্রের সৌন্দর্য্য নিষ্ক্রিয়ভাবে উপভোগ করার নাম সৌন্দর্য্যানুভূতি নহে। উহার সৃষ্টিকালে শিল্পীর মনে যে ক্রিয়াগুলি হইয়াছিল, সেগুলির সক্রিয় পুনরাবৃত্তি আমাদেরও মনের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য দেখা যায় যে, কোনও কবিতা বা সঙ্গীত এক সময়ে আমাদের মনে অপরূপ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইল, অপর এক সময়ে কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আমাদের মনে উহার সৃষ্টিক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি কতদূর পূর্ণরূপে চলিতেছে, তাহারই উপর এ সাড়া নির্ভর করিবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীর মনে এই পুনর্ব্বার সৃষ্টির ক্রিয়াটি যাহাতে ঠিকভাবে চলে, সে বিষয়ে তিনি যেন সহায়তা করেন। সুন্দর বস্তুটির অজস্র সুখ্যাতি করিয়া বা সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আর শিক্ষকের নিজ সৌন্দর্য্যানুভূতির নবীনতা ও সজীবতা অক্ষুণ্ণ থাকাও সমধিক প্রয়োজন।

ইতিপূর্ব্বে (সপ্তম অধ্যায়ে) বলা গিয়াছে যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির (অতএব সৌন্দর্য্যবোধেরও) ক্ষমতা, আমরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করি, তাহার চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান, এই কথা ভাবিবার কারণ আছে। কোনও কোনও প্রতিভাবান শিক্ষক চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার সময়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সৃষ্টিক্রিয়াকে উৎসাহদান করিয়া যে সুফল পাইয়াছেন, তাহা দ্বারা এই মত সমর্থিত হয়। তাহা ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেরই অন্ততঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ করিবার শক্তি আছে, অথচ আমরা ইহা মনে করি না যে আমাদের অজ্ঞানে অন্তরের মধ্যে আমরাও শিল্পী। কারণ যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যাইতেছে, তাহা ত প্রকৃতিতে নিহিত নাই। প্রত্যক্ষকারীর মনে যে সৃষ্টিক্রিয়া চলিতেছে, উহার ফলে তাঁহার মনের রঙটিতেই সে দৃশ্য রঞ্জিত হইতেছে, ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে।

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পমূলক ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা ইহাই দেখিতে

পাইতেছি যে, আমাদের আত্মসাম্মুখ্য এই ক্রিয়াগুলিকে আশ্রয় করিয়া বাহ্য জগতে প্রকাশ পায়। আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত ভাব উদিত হয়, এবং বাক্যে বা অন্য আকারে আমরা যাহা কিছু সৃষ্টি করি, সে সবই ইহাদের অন্তর্ভূক্ত। বিজ্ঞান ও শিল্প, উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে গঠনমূলক আধিপত্য লাভ। তবে ইহাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হউক বা শুধু জ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত করুক, যাহার অস্তিত্ব বা সত্তা আছে, তাহারই মধ্যে ইহার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিল্প নিজ বস্তু বা বিষয়কে খেলাচ্ছলে যে ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু অবশ্য ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বিজ্ঞানের ন্যায় শিল্পেও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর প্রায়োগিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী, সূত্র ও তথ্যাদি আয়ত্ত থাকা চাই, এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং ও নির্ম্মাণকৌশলেরও প্রয়োজন হইতে পারে, তেমনই শিল্পীকেও শিল্পকার্য্যের সকল নীতি পদ্ধতি ও কারিগরী কৌশলে পারদর্শী হইতে হইবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, ইঞ্জিনীয়ারকে সৃষ্টিমূলক বৈজ্ঞানিক বলা যাইবে না, বা কারিগরকে প্রকৃত শিল্পী বলা চলিবে না, যদি না তাঁহাদের প্রচেষ্টায় এই আধিপত্য লাভের প্রয়াসটি না থাকে, যদি না উপস্থিত উদ্দেশ্যটির উর্দ্ধে, 'সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টিক্রিয়া' এই মনোভাবটি উহাতে প্রকাশ না পায়।

বিজ্ঞান ও শিল্প ছাড়িয়া এখন নীতিবাদের কথা বিবেচনা করা যাক। দেখা যাইবে যে আত্মসাম্মুখ্যের গঠনমূলক ক্রিয়া এখানেও রহিয়াছে। তবে পার্থক্য এই যে, সে ক্রিয়া বহির্জগতের প্রতি প্রযুক্ত নহে ; মানুষের আচরণ ও আধ্যাত্মিক জীবনই ইহার লক্ষ্যস্থল। নীতির দ্বারা মানুষের আচরণ সংযত হয় এবং জীবনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বুঝা সম্ভব হয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, শিশু যখন অন্যের সহিত নিজ আগ্রহ আকাঙ্ক্ষাগুলির সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন অনুভব করে, তখনই তাহার নৈতিক পরিণতির প্রথম সূচনা হয়। সুতরাং নৈতিক জ্ঞানও প্রারম্ভে একরূপ ব্যবহারিক জ্ঞান। কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণের উপযোগিতা বেশী, শিশু সেই জ্ঞানই চাহিতেছে। কিন্তু তাহার নৈতিক বোধ যত গভীর হয়, সে ততই বুঝিতে পারে যে নৈতিক ক্রিয়ার লক্ষ্য সর্ব্বদাই ব্যক্তির মঙ্গল

বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মঙ্গলকে জগতের কল্যাণের সহিত অভিন্ন বিবেচনা করিলে তবেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সুতরাং যে বিধানের বিশ্বজনীন সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাই তখন হইতে নীতিজ্ঞানের লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বিদ্যালয় ও ব্যক্তিতা

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা গিয়াছিল যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতার বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ বিদ্যালয় জীবনের সামাজিক গুণের কথাও অনেকখানি বলিতে হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয়ের জীবন ও পাঠচর্চ্চার সহিত ছাত্রের ব্যক্তিগত মানসিক পরিণতির সম্পর্ক কি, তাহাই এখন ভালভাবে বিচার করিয়া দেখা যাক।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, এমন কি সুনাম-বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে পড়িয়াও, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতা পঙ্গু হইয়াছে, উৎসাহ ও আশা নিভিয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী মনীষীদের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। ইহার চেয়ে আক্ষেপের কথা আর কি হইতে পারে? দেখা যায় যে এরূপ ক্ষেত্রে অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের উন্নতি হয় সত্য, কিন্তু ইহার যা কিছু সুকৃতি তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ যে ছাত্রের কিছু বিশেষ শক্তি প্রতিভা ছিল, তাহার অবনতি ঘটে। অংশতঃ এরূপ হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে, এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করা যাইবে না। ছেলেদের মধ্যে অনেকটা আদিম মনোবৃত্তি আছে। সুতরাং উহাদের দলটিকেও নিজের উপর ছাড়িয়া দিলে স্বাভাবিকরূপেই উহার মধ্যে আদিম সমাজের গুণ ফুটিয়া উঠে। সেখানে সামাজিক রীতির শাসন হইয়া উঠে অতি কঠোর, আর কোনরূপ খামখেয়ালী নির্ম্মমভাবে দমিত হয়। তারপর অত্যধিক প্রতি-যোগিতাও ইহার একটি কারণ। মাত্রাবিহীন প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান জগতের এক মহা শত্রু হইয়া উঠিতেছে, বিদ্যালয়েও উহার অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। কিন্তু এই কারণগুলির পিছনে আরও গভীরতর কারণ আছে। তাহা এই যে, ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে লোকের বড় ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। তাহার উল্লেখ প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছিল। কেহ কেহ অস্পষ্ট বা খোলা-খুলিভাবেই এমন ধারণাও পোষণ করেন যে, মানুষের আচরণ সমাজসঙ্গত

হইতে হইলে ব্যক্তিতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, উহার বিকাশ ঘটান চলিবে না ; আত্মভাবের পরিণতি সাধন না করিয়া উহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ইহার মধ্যে আসল ভুলটি কি, তাহা বলা যাইতেছে। এ স্থলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আমাদের যে ক্রিয়ায় সামাজিক প্রবৃত্তির স্থান আছে, এবং যাহাতে উহা নাই, তাহাদের উভয়ের যে পার্থক্য, স্বার্থপরায়ণ ও সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। বলা বাহুল্য এরূপ মনে করা ভুল। অতি বড় স্বার্থপর কর্ম্মের মধ্যেও সামাজিক প্রবৃত্তির পূর্ণ ক্রিয়া থাকিতে পারে। যেমন, এক জুয়াচোর, তিনি মানুষের দুর্ব্বলতা জানেন, তাহার অন্যায় সুবিধা লইয়া লোককে ঠকান। তাঁহার সামাজিক প্রেরণাগুলি শক্তিশালী বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। আবার অতি সুস্পষ্ট সামাজিক কার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বদাই প্রবল আত্মভাবের প্রেরণা থাকিবে। যেমন, কোনও সুশিক্ষিত সমাজসেবক সভ্যতা হইতে বহু দূরে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া মানুষের মঙ্গলসাধনে রত থাকিতে পারেন। তিনি অনেক কিছু ত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু আত্মভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সে কথা বলা যায় না। বরঞ্চ তাঁহার এই চেষ্টা এক অসাধারণ শক্তিমান আত্মভাবের বাহ্য প্রকাশ না মনে করিলে ইহা দুর্ব্বোধ্য ঠেকিবে।

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্বার্থপ্রবণ বা অসামাজিক কার্য্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায়। অনেকে আছেন যাঁহারা কার্য্যসাধনে অপরের পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করেন, কিন্তু অপরের প্রতি যে কোনও কর্ত্তব্য তাঁহাদের আছে, একবারও সেকথা মনে করেন না। কোনও লোক নিজের অর্থবৃদ্ধির জন্য অন্যের জীবনে নীচতা ও শূন্যতা আনিয়া দিয়াছেন। কোনও পিতা ছেলেমেয়েদের স্নেহশ্রদ্ধা শুধু নিজের আরাম বর্দ্ধনের সামগ্রী মনে করেন। অন্যের নিকট হইতে সুবিধা লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির অতি গর্হিত চেষ্টার এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আবার এমন আচরণও দেখা যায় যে কোনও ব্যক্তি মানবজাতির সৃষ্টি ও দানসমূহের সম্পূর্ণ সুবিধা লন, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে তাঁহারও যে কিছু দিবার আছে তাহা মানিতে চাহেন না। যেমন শিল্প বা সাহিত্যের জ্ঞানাভিমানী যে ব্যক্তি শুধু নিজ রুচিরই সেবা করেন, জগতের ভাণ্ডারে কোনও দান করেন না, বা যিনি বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশের

(Cavendish) মত নিজ আবিষ্কৃত অপূর্ব্ব তথ্যগুলি গোপন করিয়া রাখেন, মানবসমাজের কাজে লাগিতে দেন না, তাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর ক্রিয়াই স্বার্থপর বা সমাজবিরুদ্ধ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পরিণত মানুষের আচরণ মাত্রেরই সামাজিক তাৎপর্য্য আছে। কারণ উহা যে আত্মভাব দ্বারা চালিত, তাহাতে সামাজিক প্রভাব পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। ইহা হইতে এরূপ ধারণা হয়ত হইতে পারে যে, কোনও ক্রিয়া ভাল কি মন্দ, তাহা ক্রিয়াটির সামাজিক মূল্য বা উপযোগিতার উপর নির্ভর করিবে। সাধারণভাবে প্রতিদিনকার ব্যাপারে এ কথা চমৎকার খাটিলেও ইহাকেই চরম সত্য বলা যায় কি না সন্দেহ। কোনও ক্রিয়ার সামাজিক মুল্য আছে বলিয়াই ক্রিয়াটি ভাল, তাহা নহে। ক্রিয়াটির মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ যদি প্রকাশ পায়, তবে সমাজের পক্ষেও উহার উপযোগিতা থাকিবে, এই কথা বলিলে ঠিক হয়। অনেক সময়েই আমরা যখন কোনও কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করি, তখন সমাজের বিষয় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত অসংযমকে আমরা গর্হিত বলিয়া যখন নিন্দা করি, তখন উহার কোনও সামাজিক ফলাফলের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা এরূপ করি না। অনেক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বেলায় উহার সামাজিক উপযোগিতা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় থাকে না। কোনও ব্যক্তি সাহিত্যানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিবে, অথবা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করিবে, সামাজিক ভালমন্দের দিক দিয়া এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর কি? এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাহ্য কোনও মানদণ্ড দ্বারা সাধারণতঃ মানুষের আচরণ বিচার করা যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ বলা গিয়াছে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), শিল্পসৃষ্টির ন্যায় মানুষের জীবনকেও অভিব্যঞ্জকতা (expressiveness) দ্বারা বিচার করিতে হইবে। শিল্পীর রূপসৃষ্টির ন্যায় আমাদেরও নিজ জীবন ইচ্ছামত গড়িবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমাদের সামর্থ্য ও উপকরণের পক্ষে যতখানি সম্ভব, ততখানি ভাল করিয়াই এ গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ, আমাদের প্রকৃতিকে অসংযত ও বিশৃঙ্খলরূপে বিকাশ পাইতে দিতে চলিবে না, আমাদের সৃষ্টিমূলক শক্তির সাহায্যে নিজ ব্যক্তিতাকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলাই

আমাদের কর্ত্তব্য। শুধু এইভাবেই আমরা বিশ্ববিধাতার অভীষ্ট কার্য্যের সহায়তা করিতে পারি। এই বিধান এমন নয় যে ইহার সাহায্যে আমরা আগে হইতেই আমাদের আচরণের রূপটি নির্ণয় করিতে পারিব। কারণ, সৃষ্টিকার্য্য শেষ না হইলে উহার স্বরূপ বলা যায় না, শেষ হইবার পরেও প্রথমে মানুষ উহার প্রকৃত মূল্য বুঝে না, এমনও দেখা যায়। বহু কবি, বৈজ্ঞানিক ও অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অনেকবারই দেখা গিয়াছে যে, সে সময়ে তাঁহাদের কর্ম্মের মূল্য লোকে বুঝিতে পারে নাই এবং উহার প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু পরে সেই প্রচেষ্টাই সার্থক প্রমাণিত হইয়াছে ও শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত বিকাশের দিক দিয়াই কেবল মনুষ্যজীবনের মূল্য বিচার হওয়া সম্ভব; এবং উপযোগ (utility) বা কার্য্যকরী উপকারিতার সহিতও ইহার কোনও অসামঞ্জস্য নাই, সে বিশ্বাসও পূর্ণরূপে রাখা চলিতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিণতি সাধন, এই নীতির সঙ্গে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক করিয়া তোলা বিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য, এই কথাটির কোনরূপ অসঙ্গতি নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও খেয়ালীপনা এক কথা নয়, এবং সব শিশুই বিরাট প্রতিভার ভাবী সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কার্লাইল (Carlyle) একটি অতি সারবান কথা বলিয়াছেন যে, মৌলিকতার গুণ নূতনত্ব নহে, আন্তরিকতা। সাধারণ অর্থে আমরা যাহাকে মৌলিক বলি না, সেও এই আন্তরিকতার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু নিজ স্বভাবের ধর্ম্ম মানিয়া চলিবার স্বাধীনতা যাহার আছে, আন্তরিকতা শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব। এই জন্য শিক্ষার্থীদের মনে ভ্রাতৃভাব ও সমাজসেবার আদর্শ গড়িয়া তোলা বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য হইলেও, এই কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে, যে, প্রকৃত সেবা শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশের প্রয়োজন। এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ আমরা তাহাকেই বলিব, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বভাবের অবাধ পরিণতির জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা সমাজের নিকট হইতে পাইতে পারিবে, এবং তাহার নিজস্ব যাহা কিছু আছে, তাহা দান করিয়া সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।

এখন আবার এই কথাই বুঝা গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য স্বাধীন ক্রিয়ার উৎসাহদান, উহার সঙ্কীর্ণতা সাধন বা দমন নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত শৃঙ্খলা (discipline) যে গুরুতর স্থানটি অধিকার করিয়া আছে, উহার প্রকৃত রূপটি কি হইবে, এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শৃঙ্খলা ও বিদ্যালয়বিধির (school order) পরস্পর প্রভেদের কথা ভাবিতে হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে যে এই দুইটি ক্রিয়া পাশাপাশি চলে বা একেবারে মিলিয়াও যায় বটে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক উৎস সম্পূর্ণ পৃথক। বিদ্যালয় জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যেরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয়, তাহা বজায় রাখাই হইল বিদ্যালয়বিধির কার্য্য। এবং আমরা দেখিয়াছি (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা (routine-tendency) ও অনুকরণকে (imitation) ভিত্তি করিয়া ইহা গড়িয়া তুলিলে ইহা সব চেয়ে কার্য্যকরী হয়। কিন্তু শৃঙ্খলা বিদ্যালয়বিধির ন্যায় বাহ্য বস্তু নহে, মানুষের ক্রিয়া ও আচরণের অন্তরতম উৎসকে ইহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। শৃঙ্খলা হইল এই যে, মানুষ নিজ প্রেরণা ও শক্তিসমূহকে এমন এক বিধানের মধ্যে সমর্পণ করে, যাহা সেগুলির উদ্দামতাকে এক সুসমঞ্জস রূপ দেয়। এবং তাহার উদ্দাম প্রেরণা ও শক্তিসমূহকে ইহা সংযত করে। শৃঙ্খলার প্রভাবে কর্ম্মকুশলতা আসে, শক্তির সদ্ব্যবহার হয় ; ইহা না থাকিলে সে স্থলে নিষ্ফলতা ও অপচয় দেখা যাইত। আমাদের প্রকৃতির কোনও কোনও অংশে হয়ত এ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিতে পারে, কিন্তু মোটের উপর ইহাকে আমরা স্বেচ্ছায়ই মানিয়া লই। আমাদের প্রকৃতিতে পূর্ণতম পরিণতি বা অভিব্যঞ্জকতা (expressiveness) লাভ করিবার যে অন্তর্নিহিত আগ্রহ আছে, তাহার স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার ফলে এ সংযম আমরা সহজেই স্বীকার করিয়া লই।

সুতরাং শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবদ্ধতার (consolidation) প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য আছে। ইহাকে উচ্চস্তরের সন্নিবদ্ধতা গণ্য করা যাইতে পারে, নিম্ন শ্রেণীর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার মধ্যে উদ্দেশ্যের উপলব্ধি খানিকটা থাকে। যেমন ক্রীড়াকুশলী ব্যক্তির দৈহিক ভঙ্গীসমূহকে শৃঙ্খলাযুক্ত বলিলে ভুল হইবে না ; কারণ সংজ্ঞাত চেষ্টার ফলেই উহাদের সৌষ্ঠব ও নৈপুণ্য, এক

কথায় অভিব্যঞ্জকতা, সাধিত হইয়াছে। তেমনই কোনও মানুষ যদি জীবনে কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহারই সহায়তায় নিজ গুণ ও শক্তির বিকাশ করিতে পারেন, তবে বলা যাইবে যে, অবস্থার গুণে তাঁহার শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছে। আমরা অবশ্য স্বকীয় শৃঙ্খলা গঠন করিতে পারি; প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াও যাঁহারা মহত্ত্বের শিখরে আরোহণ করেন, তাঁহাদের বেলায় সহজেই এই কথা খাটে। কিন্তু তাহা হইলেও সঙ্কীর্ণ ও অপরিণতচিত্ত মানুষের উপর উদার ও উন্নতমনা ব্যক্তির যে প্রভাব, সচরাচর তাহারই ফলে শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়। শৃঙ্খলাগঠন প্রক্রিয়ার কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট মনোবিত্যাসঙ্গত ক্রম সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রথমে ধরিতে হইবে যে, আমার কোনও কার্য্য করিবার যথার্থ ইচ্ছা আছে; এবং সেটি করার বিষয়ে আমি অক্ষম ও অন্য একজন অধিক সক্ষম, এ জ্ঞানও আমার রহিয়াছে। তারপরে এই অক্ষমতার উপলব্ধিতে মনে ব্যর্থ আত্মানুভূতি (negative self-feeling) জাগিবে। সেই সঙ্গে আমার আদর্শ কুশলী ব্যক্তিটির ক্রিয়ার তুলনায় আমার ক্রিয়া কোন অংশে কি পরিমাণে নিকৃষ্ট, তাহাতে মনোযোগ দিবার আগ্রহ আসিবে। সর্ব্বশেষে আসিল এই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি। এখন যথার্থ পদ্ধতিটি সম্পর্কে পূর্ব্বের চেয়ে অধিক জ্ঞান হইল, আর চেষ্টা সফল হইলে সেজন্য সার্থক আত্মানুভূতি (positive self-feeling) আসার প্রভাবে উন্নত ছাঁচ বা আদর্শটি মনে স্থায়ী হইল।

এখানে বলা যাইতে পারে যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এক বালকের মানসিক বিকাশের যে কল্পিত বিবরণ দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে প্রথম ট্রাম গাড়ী চড়ার সময়ে এবং তাহার পরে ছেলেটির মনে এই দুই পর্য্যায়ের ক্রিয়ার উদাহরণ দেখা গিয়াছিল। প্রথমে বিস্মিত দৃষ্টিতে ট্রাম চালকের কার্য্যাবলী দেখিয়া ছেলেটির মনে নিজের অক্ষমতার বোধ জাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনোযোগ সহকারে সেই ক্রিয়াগুলি করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল; এইভাবে বারবার করার সঙ্গে ক্রিয়াটিতে উৎকর্ষও আসিল। বিত্যালয়ে গিয়া বালক তাহার শিক্ষক এবং সঙ্গীদের কাছে যে শৃঙ্খলা শিক্ষা করে, তাহাও এই শ্রেণীর। ইহার প্রভাবে সে ঠিক পথটি দেখিতে পায়, এবং উহা অনুসরণ করিবার আগ্রহও তাহার মনে জাগে। বিত্যালয়ের উন্নত সংস্কার হইতে যে

শৃঙ্খলা আসে, তাহার ক্রিয়াও সেইরূপ। সেখানে বালক যে আদর্শটির সন্ধান পায়, তাহাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, অস্পষ্টরূপে হইলেও সে তাহা বুঝিতে পারে। সুতরাং সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সগর্ব্বে উহার অনুগামী হয়। আবার গণিত, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা ইত্যাদি বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় অনুশীলনের ফলেও যে শৃঙ্খলার বোধ জাগে, উহাও মূলতঃ অন্য কিছু নয়। এক্ষেত্রেও তরুণ শিক্ষার্থী বড় আবিষ্কারক ও লেখকের উন্নত চিন্তাধারা বা রচনানৈপুণ্যের সংযত ভঙ্গীটি আয়ত্ত করিতে শিখে। অর্থাৎ, শিক্ষানবীশ যেমন দক্ষ কারিগরের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়ানৈপুণ্য শিখিবার চেষ্টা করে, এ শিক্ষাও সেইরূপ।

বিদ্যালয় জীবনে শাস্তির (punishment) স্থান কি হইবে, তাহার উল্লেখ না করিয়া শৃঙ্খলা সম্বন্ধে এ আলোচনা শেষ করা যাইবে না। প্রচলিত বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজই হউক, আর বাহিরের বৃহত্তর সমাজই হউক, যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই অন্যায়ও আছে, বালকদের প্রকৃতি অপরিণত বলিয়া তাহাদের অন্যায়ের সম্ভাবনা বরং বেশীই থাকিবে। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিবিধানে শাস্তির কার্য্যকরিতা কিরূপ, তাহা আমাদের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শাস্তির মূলগত উদ্দেশ্য চার শ্রেণীর হইতে পারে, সংশোধন (reformation), নিবারণ (prevention), রক্ষা (protection) ও প্রতিশোধ (retribution)। ইহার মধ্যে সংশোধক শাস্তিরই বিদ্যালয় জীবনে প্রধান গুরুত্ব আছে, তাহার সঙ্গে নিবারণের দিকটিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান হয়। এক্ষেত্রে মূলকথা ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে শাস্তির উদ্দেশ্য গঠনমূলক হওয়া উচিত, দমনমূলক নহে। শুধু অন্যায় নিবারণ করিলেই চলিবে না, তাহার স্থানে ন্যায়সঙ্গত বৃত্তিগুলিও শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত ও সক্রিয় না করিলে অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হইবে না। অন্যায়কারী যাহাতে উচিত কর্ত্তব্যটি স্বেচ্ছায় সাধন করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেওয়া শাস্তির প্রকৃত লক্ষ্য; নিষিদ্ধ ক্রিয়াটি নিবারণ করিলেই ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। অপরাধীগণের দণ্ডবিধিতেও এই সত্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা হইতেছে যে, শুধু দমন দ্বারা অপরাধীর সংশোধন হয় না। অপরাধীর বিপথগামী শক্তিপ্রেরণার নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্গতিসাধন করিলে

(sublimation) তবেই আসল প্রতিকার হয়। বিদ্যালয়বিধির পক্ষে হানিকর কতকগুলি দুষ্কার্য্য, যেমন সময়ানুবর্ত্তিতার ত্রুটি বা অবাধ্যতা ইত্যাদির প্রতিবিধানের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের মঙ্গলের জন্য বিদ্যালয়ের এই বিধানসমূহ বজায় রাখা প্রয়োজন। তবে বিদ্যালয় সমাজের সকলের অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার্থীর যদি ইহাতে সম্মতি না থাকে, তবে এই শাস্তির কোনও নৈতিক সুফল হয় না। মারামারি বা এইরূপ সামান্য অসামাজিক ক্রিয়ার বেলায় অন্যায়কারীকে সমবেত খেলাধূলা হইতে বাদ দিলেই যথেষ্ট শাস্তি হইল। কারণ, অন্য সকলে কেমন মনের আনন্দে খেলা করিতেছে, তাহাকেই শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে, ইহাতে তাহার মনের অনুতাপের প্রভাব অতি প্রবল হইবে। অবশ্য অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা অস্থিরতার ফলে দুষ্টামী করে। এবং সে অস্থিরতায় কারণ নানারূপ হইতে পারে, যেমন স্ফূর্ত্তিহীনতা, নিদ্রার স্বল্পতা কিংবা মুক্ত বায়ুতে ব্যায়ামের অভাব। সে অবস্থায় ছেলের খেলা বন্ধ করিয়া আটক রাখিলে তাহার ব্যাধির প্রকৃত ঔষধটি হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখার সমান। যখন শিশুর অন্যায় এমন হয় যে, উহাকে পাপ গণ্য করা চলে, তখন শাস্তির মধ্যে সে অন্যায় দমন অপেক্ষা সংশোধনেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া উঠে। সে ক্ষেত্রে অতীতের অন্যায়ের কথা না ভাবিয়া আশায় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হয়। অপর সকলের দৃষ্টিতে নিজেকে ছোট মনে হইলে শিশু লজ্জা পায় বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত পন্থাটিতে চলার অভ্যাস হইলে তবেই শিশুর যথার্থ সংশোধন হয়। সুতরাং বিচক্ষণ শিক্ষক কখনও ছাত্রের মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলিকে দমন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন না; উহার কারণ দূরীভূত করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, শিশুর বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত প্রেরণাগুলির ক্রিয়াই সাধারণতঃ এইগুলির কারণ। উহাদের মধ্যে অসংযত অনুরাগ ও বিরাগসমূহ থাকে, তাহাদের ক্রিয়া সংজ্ঞানে বা অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে। বিবেচনা সহকারে এই প্রেরণাগুলিকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারিলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

আর একটি সাধারণ কথা বলিয়া এ আলোচনা শেষ করা যাইবে। পূর্ব্ব-

কালে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে শাস্তি বা শাস্তির ভয়ই বিদ্যালয়-শাসনের মূল ভিত্তি। বর্ত্তমানে কিন্তু এমন কথা বলিলে উহাকে আদিম কুসংস্কার গণ্য করা হইবে। আজকাল যে শিক্ষকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন যে, কোনও বিদ্যালয়ে শাস্তির বজ্রবিভীষিকা সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই যে, উহা অন্য যে বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্প, তাহার চেয়ে যে বাহ্য বিধিব্যবস্থার ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ, বাস্তব ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় না। বিদ্যালয়-জীবনে অন্যায় ঘটিবে, তাহার প্রতিবিধানও করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে স্বভাবগত পাপ মনে না করিয়া নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি বিবেচনা করাই ঠিক। অর্থাৎ উহা হইতে বুঝিতে হইবে যে পাঠ্যসূচী, শিক্ষাপ্রণালী কিংবা বিদ্যালয়ে অথবা গৃহে শিশুর শরীর বা মনের উপযোগী ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি রহিয়াছে।

এই গ্রন্থে আমরা পূর্ব্বাবধি সাধারণভাবে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিদ্যালয় সমাজ বটে, কিন্তু এ সমাজের বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা চাই। যেমন, এ সমাজটি হইবে স্বাভাবিক, বিদ্যালয়ের মধ্যে ও বাহিরের জীবনে বড় কোনও ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয়ে এমন সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না যাহাতে শিক্ষার্থীর শক্তি সীমাবদ্ধ বা নিষ্পেষিত হয়। ইহার নীতি উদার হওয়া চাই, যাহাতে ইহার মধ্যে সকলের স্থান থাকে, এবং শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই স্বাভাবিক জীবনের শক্তি ও পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। গতানুগতিক কোনও আচরণগত আদর্শ বজায় রাখা ইহার কার্য্য নয়, বিশ্বজনীন নীতি ও আদর্শ দ্বারা ইহা চালিত হইবে। একটা পুঁথিগত জীবন সৃষ্টি করিয়া বিশাল জগতের ভাবধারার সহিত ইহার বিচ্ছেদ রাখা চলিবে না, বরং বুদ্ধির দিক দিয়া অন্ততঃ তাহার সহিত ইহার পূর্ণ সংযোগ থাকিবে। অপরদিকে বিদ্যালয়সমাজে এইটুকু কৃত্রিমতাও থাকিবে যে, ইহা বহির্জগতের যথার্থ প্রতিকৃতি হইলেও, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা শক্তিমান, শুধু তাহারই স্থান ইহাতে থাকিবে। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ই জাতির প্রাণশক্তির কেন্দ্র ; এখানে অবশ্য বিদ্যালয় অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য সর্ব্বরূপ শিক্ষালয়ই বুঝিতে হইবে। জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি দৃঢ় করা, ঐতিহাসিক ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা, অতীতের গৌরব এবং ভবিষ্যতের আশা অক্ষুণ্ণ রাখাই বিদ্যালয়ের বিশেষ কার্য্য। বিদ্যালয়গুলির সাহায্যে সমগ্র জাতি বুঝিতে পারিবে যে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ,

মঙ্গলকর শক্তিসমূহের উৎস কোথায়। দেশের মহাপুরুষগণ যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন, এগুলি সমুদয় দেশবাসীকে সেই স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহাদের আত্মসমালোচনার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, নিজ আদর্শের সংশোধন ও কর্ম্মশক্তির পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন করিবার সামর্থ্যও আসিবে।

আজকাল প্রায়ই বলা হয় যে নাগরিকতা শিক্ষার (education for citizenship) সমধিক প্রয়োজনীয়তা আছে। উপরের উক্তিগুলি যে প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত। উহা হইতে অবশ্য এমন বুঝায় না যে নাগরিকতা শিক্ষাকে এক পৃথক বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় গণ্য করিতে হইবে। বিপরীতপক্ষে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ ও শৃঙ্খলা যদি ঠিক হয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি যদি শিক্ষনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, তবে উহার ফলে নাগরিকতা সম্বন্ধে বোধ স্বভাবতঃই জাগিবে। দ্বিতীয় কথাটিই প্রথমে লওয়া যাক। অধিকাংশ বালকেরই সব জিনিষ বুঝিবার একটা জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে। যেমন টেলিফোন, মোটর গাড়ী, বেতার যন্ত্র কি করিয়া চলে, নাবিক কেমন করিয়া জাহাজে সমুদ্র পার হয়, বৈজ্ঞানিক কিরূপে আকাশ পথে সারা পৃথিবী ঘোরাফেরা করে, রসায়নবিৎ কি ভাবে পুরাতন দ্রব্যের বিস্ময়কর রূপান্তর সাধন এবং নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি করে, এই সমস্ত বুঝিবার যথার্থ স্পৃহা প্রায়ই তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। বালকের পক্ষে এরূপ অনুসন্ধিৎসা একটুও অস্বাভাবিক নয়, বরং শিক্ষালাভের কোনও স্তরে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এইভাবেই সে দেখিতে পায় বিজ্ঞান বা গণিতের আসল সার্থকতা কি এবং বর্ত্তমান জগতের ক্রিয়াকলাপে এই সকল শ্রেণীর জ্ঞানের স্থান কতখানি। রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের উৎপত্তি কি ভাবে হয় এবং কিরূপে উহারা নিজ লক্ষ্যসাধনের জন্য সচেষ্ট হয়, প্রকৃতির সম্পদসমূহ কি ভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার এবং উহার শ্রীবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, ইত্যাদি নানা বিষয় ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠ হইতে দেখান যায়। মনের দিক হইতে এ শিক্ষার সমধিক মূল্য আছে। ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থী বুঝিতে পারে বিদ্যালয়ের বাহিরে বৃহত্তর মানব সমাজ কিরূপে চলিতেছে ; ফলে তাহার সামাজিকতা বা নাগরিকতার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

আবার বিদ্যালয়ের কার্য্য ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার মূলগত যে আদর্শ ও ধারণা-

সমূহ থাকে, সেইগুলি অনুসরণ করাও শিক্ষার্থীর অভ্যাস হইয়া যায়। ফলে তাহার নৈতিক বোধে এগুলির প্রভাব স্থায়ীভাবে থাকে। সুতরাং বিদ্যালয়-ব্যবস্থা যদি সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত হয়, তাহার দ্বারাও নাগরিকতা শিক্ষা সুন্দরভাবে হইতে পারে। অবশ্য বিদ্যালয়জীবনে নাগরিকতা শিক্ষায় সাফল্য-লাভ অর্থে বৃহত্তর জগতের নাগরিকতায়ও অনুরূপ সাফল্য বুঝায় না। বিদ্যালয় হইতে জগতে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা পাইতে হইলে জগতের ক্রিয়াকলাপের সহিত শুধু বুদ্ধির সংযোগ থাকিলেই চলিবে না। সে সকল ক্রিয়া যাঁহারা চালিত করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কার্য্য, দায়িত্ব ও ত্যাগ, এ সবের সহিত শিক্ষার্থীর সহানুভূতির কল্পনাগত যোগ চাই। যেমন কর্ম্ম-কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা, নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের নিকট হইতে তাঁহাদের অভিমত শুনা (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যেরূপ বলা হইয়াছে), ইত্যাদি এইরূপ সহানুভূতি জাগ্রত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা বা মৌখিক উপদেশের চেয়ে, এই সকল কার্য্যকরী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবন্ত স্পর্শ শিক্ষার্থীর হৃদয়ে পৌঁছায় এবং উহার মধ্যে নাগরিকের কর্ত্তব্য ও সেবার ভাবটি জাগাইয়া তুলে।

বিদ্যালয়ের সমাজ স্বাভাবিকও বটে, কৃত্রিমও বটে, ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। এই কারণে শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় এমন কতকগুলি সমস্যা আসিয়া পড়ে, যেগুলির মীমাংসা এক কথায় কঠিন, বা অসম্ভব বলিলেও চলে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। যেমন শিক্ষার্থীদের আবাসিক বিদ্যালয়ের (Boarding School) প্রথা। এ সম্বন্ধে অনেকে এই আপত্তি তুলেন যে ইহাতে ছেলেমেয়েরা গৃহের স্বাভাবিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। এই আপত্তির উত্তরে বলা চলে যে, বিদ্যালয় ও উহার ছাত্রাবাসের পরিচালনা উৎকৃষ্ট হইলে সেখানে সামাজিক জীবন ও ভাব এত উন্নত হয় যে, উহার দ্বারা পারিবারিক জীবনের ক্ষতি অতি ভালভাবেই পূরণ হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে না। আর আমাদের দেশে অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় ছেলেমেয়েদের ছাত্রাবাসে রাখিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার রীতি কম রহিয়াছে বলিয়া এখানে এই সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোটের উপর দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে লোকের দিবাবিদ্যালয় (Day School) অর্থাৎ

গৃহে থাকিয়া দিনের বেলায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপর অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষার (co-education) প্রশ্নটিও ঠিক এইরূপ অমীমাংসিত আছে। ইহার সমর্থকগণ বলেন যে, একত্র শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েরা পরস্পরকে জানিতে পারে ; তাহার ফলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়। আবার সর্ব্বদা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পরের সংস্পর্শ ও আলাপ হয় বলিয়া, ছেলেদের ও মেয়েদের পরস্পরের সম্পর্কে অযথা কৌতূহল ও উত্তেজনার সম্ভাবনাও দূর হয়। উপরন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই পক্ষে পরস্পরের প্রভাব সাধারণভাবে মঙ্গলকর, এবং এইভাবে উভয়ের নৈতিক আদর্শেরও কতকটা সমন্বয় ঘটিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এ প্রথার বিরোধী, তাঁহারা দেখান যে, কিশোরবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া অবাধে নিজ নিজ বৃত্তির অনুসরণ করিতে চায়। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিদ্যালয় জীবনের শেষভাগে, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা কৈশোরে পদার্পণ করিলে, অন্ততঃ এই ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় যে, বালক ও বালিকারা পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া স্বকীয় বিশেষ গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধন করিবে। কিশোর বয়স সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের আবিষ্কর্তা সুপণ্ডিত শ্লটারও (Slaughter) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবু অন্ততঃ শৈশবে একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা যে উত্তম, এ বিশ্বাস ক্রমশঃই বিস্তার-লাভ করিতেছে। আর কৈশোরেও যে ছেলে ও মেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা অন্যায়, এ কথাও সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, লেখাপড়ায় ও খেলাধূলায় বালকবালিকাগণকে অবাধ মেলামেশা করিবার কতটা সুযোগ দেওয়া সঙ্গত ও কতটা নয়, এখনই সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না ; কারণ, এ সম্পর্কে আরও বহু পরীক্ষা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আর একটি ভিন্নরূপ সমস্যা হইতেছে সাধারণ (general) এবং বৃত্তিমূলক (vocational) শিক্ষার পরস্পর দোষগুণের কথা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমর্থকগণ এই সারবান যুক্তি দেখান যে, কৈশোরে বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলি আয়ত্ত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে,

কোনও একটি বিশেষ বৃত্তি আয়ত্ত করার মধ্যে কোনও শিক্ষাগত মূল্য নাই। তাঁহাদের এই যুক্তি অবশ্য তত শক্তিমান্ নহে। প্রশ্নটি শিক্ষার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যেগুলি শিখান বিদ্যালয়ের কার্য্য নহে। হয় ত ছেলেটি ভবিষ্যতে ট্রামগাড়ীর পরিচালক বা পাহারাওয়ালা হইল, সে শিক্ষা বিদ্যালয়ে প্রথম হইতে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্য অনেক বৃত্তিতে এই কথা খাটিবে না। হয়ত শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে নাবিক, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, স্থপতি বা কৃষিজীবী বা এমনই কিছু হইবে। এই সকল বৃত্তি দ্বারা মানবজীবনের যে অভাব মিটে তাহা সামান্য বা ক্ষণিকের নহে। এ বৃত্তিগুলির অতীত গৌরব-মণ্ডিত, ইহাদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তি বহু শ্রেষ্ঠ চরিত্রের বিকাশ ঘটাইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগও এগুলিতে পাওয়া যায়। এ সকল বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যবোধের উপযুক্ত বিকাশ চাই। শিক্ষার্থীকে এই সমস্ত প্রাচীন বৃত্তির কোনও একটি অনুসরণে শিক্ষা দিলে দেখা যায় যে, সে নিজ কর্ত্তব্যসাধনে সমগ্র মন নিয়োগ করে। এরূপ ব্যবস্থায় বিদ্যাভ্যাসে তাহার এতখানি আগ্রহ হয় যে, সাধারণ ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় শ্রেষ্ঠ বালকদের মধ্যেই শুধু তাহা দেখিতে পাইবেন। শুধু তাহাই নহে। যে কার্য্য প্রত্যক্ষরূপে শিক্ষার্থীকে তাহার নিজের নির্ব্বাচিত লক্ষ্যস্থলটির দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, যে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে নিজেই বুঝিতে পারায় তাহার এক মর্য্যাদা ও সক্রিয় ভাব জাগ্রত হয়, উহাতে প্রায়ই তাহার মনে নূতন কর্ম্মশক্তির সঞ্চার হয়, সাধারণ শিক্ষায় তাহা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকিত। এইভাবে তাহার মানসিক উন্নতি ঘটে ও নৈতিক বোধও জাগিয়া উঠে। এক কথায়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথার্থই উদারনৈতিক শিক্ষা হইয়া দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষায়, শিশুর নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া সেই বৃত্তির স্থানকে অগ্রগণ্য ধরা হইয়াছে। তাহার কথা অন্যত্র বলা গিয়াছে।

সাধারণভাবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্বন্ধেও আমাদের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বের

মতই হইবে। যদি এ শিক্ষা উদার পন্থায় দেওয়া যায় তবে ইহার পূর্ণ সার্থকতা আছে। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই এই শিক্ষা দিতে হইবে এমন কথা নহে। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থাতেই ইহার যথেষ্ট স্থান থাকা চাই, কারণ বৃত্তি শিক্ষার সামাজিক মূল্য যথেষ্ট, এবং ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীর কার্য্যকরী প্রেরণা সফলরূপে চালিত হয়।

এখন পাঠ্যস্থচীর (curriculum) কথা আলোচনা করা যাক। কি শিক্ষা দেওয়া যাইবে, কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা কিভাবে স্থির করা যাইবে ?

এই স্থত্রে যে মানদণ্ডটি সহজে চোখে পড়ে, তাহা হইল প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে তাহার ছেলে কিছু নিরর্থক জ্ঞান অলঙ্কার হিসাৰে আহরণ করুক. তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু মোটের উপর তাহার বিদ্যা এমনই হওয়া উচিত যে উহা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় হয়। এবং তাহার এই 'প্রয়োজনীয়' কথাটির অর্থ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই মত উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ ইহার মূলে ভালরূপ যুক্তি আছে। সাধারণ মানুষ যদি সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করিতে পারিত, তবে দেখা যাইত যে সত্যই সে কৃষ্টির বিরোধী নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পুঁথিগত নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে কৃষ্টিকে বাস্তব জীবনে উহার মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, উহারই বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ। এই ভুলের মোহ শিক্ষকগণের চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। সাধারণ ব্যক্তি যে মনে করে এই ভুল হইতে অবর্ণনীয় অনিষ্ট হয়, তাহা খুবই সত্য। যেমন যে শিক্ষক বিত্তালয়ে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান কেবল 'মানসিক কসরতের' ব্যাপার মনে করেন, তাঁহার দ্বারা শিক্ষার যতটা অনিষ্ট হয়, যিনি এই বিষয়ের শিক্ষা বিদ্যালয় হইতে একেবারে উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহার দ্বারা অতটা হয় না। আজকালকার দিনে কোনও কোনও বিজ্ঞান শিক্ষকও সেই একই অন্যায় করিয়া থাকেন। ফলে দেখা যায় যে, কোনও কোনও মেধাবী ছাত্রও বলিয়া থাকে যে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে তাহার কোনও দিন এ ধারণা হয় নাই যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি শ্রেণীকক্ষ বা পরীক্ষাগারের বাহিরে ঘটিতে পারে। এগুলি এমন পদ্ধতিতে পড়ান হয় যে তাহারা মনে করে এগুলি পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় 'বিষয়' মাত্র। সুতরাং সাধারণ লোকের সমালোচনা নিভুর্ল না হইলেও

উহার বিশেষ গুণ এই যে, প্রতি পদে উহা বিদ্যালয়ের সহিত বাস্তব জীবন ও সমাজের সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর এইভাবে জীবনের প্রয়োজনের দিক দিয়া শিক্ষার সার্থকতা কতখানি হইল, সে কথা বিচার করিয়া দেখিতে আমাদের বাধ্য করে।

কার্য্যকরিতার মানদণ্ড সর্ব্বদা প্রয়োগ করা অবশ্য সহজ নহে। গণিতের কথা ধরা যাক; কারণ, সাধারণতঃ লোকের ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ কথা সত্য যে, খানিকটা সংখ্যাগত জ্ঞান থাকা বড়ই আবশ্যক। মানুষ যদি হিসাব করিতে, লাভ লোকসান বুঝিতে বা নিজ টাকা পয়সা মিলাইয়া লইতে না পারে, তবে সে জন্য প্রতিপদে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। কিন্তু শুধু প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ লোকের শুধু এইটুকু গণিতের জ্ঞান থাকিলেই কাজ চলিয়া যায়। তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে পাটীগণিতের দুরূহ অংশগুলি শিখিয়া ফল কি? জ্যামিতি ও বীজগণিতের ত কথাই নাই; কয়েকটি বিশেষ বৃত্তিতে মাত্র এগুলি কাজে লাগে। এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়া সাধারণ লোককে স্বীকার করিতে হয় যে, কতকগুলি বিদ্যা জীবনে সাক্ষাৎভাবে কাজে লাগে না বটে, তবে উহাদের পরোক্ষ উপকারিতা এই যে, এগুলি হইতে উৎকৃষ্ট মানসিক শিক্ষা হয়। কিন্তু এ কথা একবার মানিয়া লইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকও বুদ্ধিকৌশলের চর্চ্চার প্রতি তাঁহার যে অতিরিক্ত আগ্রহ আছে, সে বিষয়ে অবাধ অধিকার পাইলেন। তিনি বলিতে পারেন যে, ছাত্রদের ভাল না লাগিলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া উচিত; কারণ তাহারা সংস্কৃত খুব শীঘ্র হয় ত ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু তবু 'বিশদরূপে চিন্তা' করিতে শিখিবে, কঠিন বাধা অতিক্রম করিবার অমূল্য শক্তি লাভ করিবে। তিনি বীজগণিতের প্রকাণ্ড জটিল সংখ্যাগুলিকে সরল করিতে দিয়া ছাত্রগণের বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারেন, কেন না উহাতে 'মনের নির্ভুলতা' সাধিত হয়। এক কথায় বাহিরের লোকের চক্ষে যেগুলি বড়ই নিরর্থক, সে সমস্তই তিনি এই যুক্তির বলে করিয়া চলিবেন।

এইটি হইল শিক্ষাপ্রণালীর এক প্রসিদ্ধ নীতি, শিক্ষার সর্ব্বাভিমুখিতা (formal training)। অতীতে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। ইহাতে বলা

হইত যে, কোনও এক মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা যে নৈপুণ্য লাভ করা যায়, উহার ফলে সেই গুণসম্পর্কিত অন্যান্য সকল ক্রিয়াতেই এক সাধারণ যোগ্যতা আসে। এ ধারণা যে ভুল, তাহা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাবিদ্‌গণ ভালভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে যে স্থলে পরীক্ষা সম্ভব, সেরূপ ক্ষেত্রে নির্ভুল পরীক্ষা দ্বারাও এই নীতির ত্রুটি প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে বিশ্বাসটি বহুদিন শিক্ষকদের মনে বদ্ধমূল ছিল এবং বহু স্থিরদৃষ্টি ব্যক্তির চোখেও অভ্রান্ত বোধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কিছু মাত্র সত্যতা নাই, এ কথাও মনে করা কঠিন। তবে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ?

একটু আগে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গিয়াছে, উহাতেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। গণিতের ন্যায় কোনও বিষয় শিক্ষার মধ্যে যে বুদ্ধির ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্ট আদর্শ বহু শতাব্দী ধরিয়া এক বিশেষ শ্রেণীর বস্তু ও সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সকল বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এইসব সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সূত্রগুলির কতকাংশ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, কতক সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। আবার তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলগুলির সদ্ব্যবহারও ভবিষ্যতে উত্তর-পুরুষগণ সেইভাবে করিবেন, সেজন্য এগুলি রাখিয়া গিয়াছেন। এইভাবে এক সুনির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিগত ক্রিয়ার ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট, উহার মধ্যে এক স্বতন্ত্র মনোভাব ও আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। যে শিক্ষার্থী গণিত ভালরূপে আয়ত্ত করিবে, এই মনোভাবও তাহার নিজস্ব হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ যে শ্রেণীর ধারণা, মানসিক ক্রিয়ার ধারা ও বুদ্ধির নির্ভুল অনুশীলন এই বিষয়টির সহিত যুক্ত, সেগুলি তাহার মনের অংশীভূত হইয়া যাইবে। সুতরাং যেখানেই এগুলির প্রয়োজন সেইখানেই সে উহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে। যেমন, যিনি আইনব্যবসায়ী, তিনি কোনও বিষয় আইন সংক্রান্ত না হইলেও তাহার সাধারণ নিয়ম বা প্রমাণ ইত্যাদি বিচার করিবার সময়ে নিজ বৃত্তীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিচয় দিবেন। এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক যেমন দার্শনিক মনীষী বেকন (Bacon) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী বলিয়া তাঁহার দর্শনের আলোচনাতেও আইনজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী

বিদ্যমান। তেমনই কোনও আধুনিক রসায়নবিৎ হয় ত পদার্থবিদ্যায় শিক্ষিত সতীর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করিবেন যে তিনি রাসায়নিক ব্যাপারও পদার্থবিদের দৃষ্টিতে দেখেন। চেষ্টারটন (Chesterton) পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আত্মার অমরত্বের কথা নাকি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টিতে বিচার করিত। কিন্তু ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে অন্যরূপ হওয়া সম্ভব কি? বস্তুতঃ, আমাদের প্রত্যেকের শিক্ষার অন্তর্গত বিশেষ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য চিরদিন মানুষে মানুষে মতের পার্থক্য হয়; এবং কতকগুলি সত্য আমাদের প্রত্যেকেরই উপলব্ধির বহির্ভূত থাকিয়া যায়।

কৃষ্টির ইতিহাসেও এই নিয়মের দৃষ্টান্ত প্রতিপদে পাওয়া যায়। যেমন, নিউটন (Newton) মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের (gravitation) চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে তাঁহার মনে জ্যোতির্বিদ্যার যে প্রভাব ছিল, তাহা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও তিনি প্রয়োগ করেন। ইহাই পরে আধুনিক আণবিক পদার্থবিদ্যা (molecular physics) এবং পরমাণবিক রসায়নের (atomic chemistry) ভিত্তি হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ্‌গণ নিউটনের মতবাদে এমনই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিও যেন তাঁহারা জ্যোতির্বিদের ভঙ্গীতে বিচার করিতেন। তেমনই ইঁহাদের পরবর্ত্তীগণ ডারউইনের (Darwin) মতবাদে শিক্ষালাভ করিয়া সকল সমস্যাতেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা জীবের বিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution through natural selection) আনিয়া ফেলিতেন।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কোনও ক্রিয়া বা বিষয় আয়ত্ত করার ফলে যে শিক্ষা হয়, উহাতে মূলতঃ বিশেষ কোনও অবস্থায় এই বিশেষ ধারণাসমূহ ও ক্রিয়াপ্রণালী প্রয়োগের শক্তি আসে; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও অবস্থার ইহার সহিত সাদৃশ্য মনে হইলে সেখানেও এগুলি কাজে লাগাইবার আগ্রহ হয়। ইহার সঙ্গে যদি রসের (sentiment) অন্তর্গত গুণসমূহের স্থায়ী ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তাহা স্মরণ করা যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বাভিমুখী

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটিতে কতটা সত্যতা আছে, তাহা সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে।

পাঠ্যসূচীর কথাটি তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে। বিদ্যালয়কে মূলতঃ এমন একটি স্থান মনে করিলে চলিবে না, যেখানে শিক্ষার্থীরা কতকগুলি জ্ঞান শিখিবে। বরং ধরা উচিত যে এখানে তাহারা এমন কতকগুলি ক্রিয়া শিখিবে, যেগুলির বৃহত্তর জগতে মহান ও চিরন্তন সার্থকতা আছে। এই ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিকভাবে দুইটি শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণীর হইল সেই সব ক্রিয়া, যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা সুরক্ষিত করে ও উহার মান উন্নত রাখে, যেমন, দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব, সদাচার, সমাজ ব্যবস্থা, নীতি ও ধর্ম্ম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে হইল বিশিষ্ট সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াগুলি, এইগুলিই বলিতে গেলে সভ্যতার সবল দেহতন্ত্রী স্বরূপ। সাহিত্য, ইতিহাস, কলা, বিজ্ঞান, এই সবই এই শ্রেণীতে পড়ে, এগুলি হারাইলে সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। এই উভয় শ্রেণীর ক্রিয়াতে মানবের আত্মার বিরাট অভিব্যক্তি দেখা যায়। সভ্যতার অগ্রগতি কোনরূপে অব্যাহত রাখিতে হইলেও মানুষকে চিরদিন এইগুলি লইয়া থাকিতে হইবে, ইহাদের বিকাশ করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে এই সমস্ত ক্রিয়ার স্থান থাকিবে। প্রাথমিক শিক্ষায় এগুলি সাদাসিধা ও সরলভাবে শিখান যাইবে; কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই শিক্ষা আরও সম্পূর্ণ ও বিধিবদ্ধ হওয়া চাই। প্রথমে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াগুলি ধরা যাক। বিদ্যালয়ের পূর্ণ পাঠ্যসূচীতে থাকিবে, সাহিত্য, তাহার মধ্যে অন্ততঃ মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান থাকা চাই; শিল্পকলা, বিশেষতঃ সঙ্গীত, যাহার প্রচলন সারা জগতে আছে; হাতের কাজ, ইহার কতকগুলির বেলায়, যেমন বয়ন, স্থাপত্য, ইত্যাদিতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে, যেমন, ছুতারের কাজ, সূচীশিল্প, ইত্যাদিতে গঠনের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়; বিজ্ঞান, এবং গণিতও বিজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে, কারণ ইহা সংখ্যা, আয়তন ও কালঘটিত বিজ্ঞান। ইতিহাস এবং ভূগোল, উভয়েরই পাঠ্যসূচীতে দুইটি পৃথক দিক রহিয়াছে। একদিকে ইতিহাস সাহিত্য এবং ভূগোল বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে এগুলিকে পাঠ্যসূচীর কেন্দ্রস্থলে রাখিতে হইবে,

কারণ এগুলির সাহায্যেই মানবজীবনের জয়যাত্রার কথা জানা ও বুঝা যায়। বর্ত্তমান ও অতীতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ইতিহাসে শিক্ষা করা যায়। তেমনই ভূগোলে দেখা যায় যে মানুষকে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, আবার সারা জগতে মানবের সমস্ত ক্রিয়াও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ভাষাশিক্ষা এবং তাহারই আনুষঙ্গিক পঠন ও লিখন শিক্ষার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইল না। কারণ ইহা এত প্রয়োজনীয় যে উভয় শ্রেণীর প্রত্যেক ক্রিয়াতেই ইহা আসিয়া পড়িবে; অবশ্য ইহার পৃথক পাঠ্যেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

উপরে বর্ণিত ক্রিয়াগুলির প্রকৃতি এমন যে সেগুলিকে পাঠ্য 'বিষয়' রূপে ধরা চলিবে না। তাহা হইলেও এগুলিতে শিক্ষার্থীর পড়াশুনার প্রেরণা এবং সহায়তা থাকিবে, পৃথক অধ্যাপনার সাহায্যও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় চাই। যেমন, কোনও নূতন ভাষা যেভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, শারীরিক স্বাস্থ্য বা রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয় ঠিক সেইভাবে শিখান যায় না। তথাপি শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের পাঠে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, সেগুলি তাহার স্বাস্থ্যশিক্ষায় কাজে লাগিবে। তেমনই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রচালনা ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সুযোগ পাইবে; তবে এগুলি শিখিবার বিষয়ে ইতিহাস পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট থাকিবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বিদ্যালয়ের অপর কোনও শিক্ষার অবস্থাই ধর্ম্মশিক্ষার চেয়ে বেশী অসন্তোষজনক নহে, সে কথা অবশ্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সে জন্য বিদ্যালয়কে দোষ দিলে অবিচার করা হয়। কারণ সমগ্র সভ্যজগতের আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমানে যেমন বিভ্রান্ত ও ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, ইহাও তাহারই অংশ মাত্র। এক্ষেত্রে ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহা যে মানবাত্মার স্বভাবজাত ক্রিয়া, সেই কথাটির তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিতে হইবে, আর সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিয়া নির্ভীকভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

এই বিষয়টি এমন গুরুতর যে এ সম্পর্কে দুই একটি প্রাথমিক মন্তব্য করা

ছাড়া, অধিক কিছু বলা ধৃষ্টতা হইবে। ধর্ম্মের মধ্যে দুটি পৃথক অংশের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমটিকে বলা যায় ধর্ম্মভাব। দ্বিতীয়টি হইল ধর্ম্মতত্ত্ব, অর্থাৎ যে সব জিনিষ হইতে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, তাহারই নীতিগত জ্ঞান। মানুষের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব একেবারে বাদ দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ধর্ম্মভাবের মূলে আমাদের এইরূপ এক অনুভূতি থাকে যে, কতকগুলি বস্তুর সুমহান ও বিশ্বজনীন সার্থকতা আছে, এগুলিকে শ্রদ্ধা ও সেবা করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায় যে, মানুষের ধর্ম্মভাব সত্যনিষ্ঠা, শিল্পানুরাগ বা সেবাব্রতকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। এরূপ স্থলে সে মনে করে যে, এই শ্রদ্ধা ও সেবা ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার বাহ্যরূপটি নির্ভর করিবে মানুষের নিজ ব্যক্তিতার উপর ; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষে ইহার বিভিন্ন রূপ দেখা যাইবে।

আমাদের স্বভাবের অন্যান্য প্রধান প্রেরণার ন্যায় ধর্ম্মভাবটিও সর্ব্বক্ষেত্রেই সামাজিক আকার গ্রহণ করে। যে সব লোক এক আদর্শ অনুসরণ করেন, তাঁহাদের অন্তরের নিষ্ঠা তাঁহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করে। সম্মিলিত ভাবে তাঁহারা নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রেরণা উপলব্ধি করেন ও ধর্ম্মের বাণী প্রচার বা শ্রবণ করেন। এইরূপ সমবেত শক্তি না থাকিলে জগতের শত্রুতা বা ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে উহার দাঁড়াইবার উপায় নাই। এইজন্য ধর্ম্মভাব থাকিলেই ধর্ম্মমন্দিরেরও সৃষ্টি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবসংযুক্ত এক নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিও গড়িয়া উঠিবে।

ধর্ম্মের দিক হইতে বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব আছে। কারণ মানবজীবনের মহিমা ও মূল্য সম্বন্ধে ধারণা উন্নত করিবার শক্তি সাহিত্যের যেমন আছে, মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ছাড়া আর কোনও কিছুরই তেমন নাই। এইজন্য যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মূল্য আছে, সেগুলি সাহিত্যরূপে পড়ান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই পাঠনা যে একটি মাত্র ধর্ম্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই।

অনুষ্ঠানের কথা ধরিলে ইতিপূর্ব্বে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) এ সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষার বেলাও প্রযোজ্য। ইহাতে

ভুলের সম্ভাবনা এড়াইতে হইলে, বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের আসল আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলি আমাদের নির্ভীক ও খোলাখুলিভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তারপর, ধর্ম্মতত্ত্বের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। এবং ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার স্থান ও রূপ কেমন হইবে, সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। দেশে একাধিক ধর্ম্মের প্রচলন থাকায় এ সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এ প্রশ্নের সাধারণভাবে কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। শুধু এইটুকু বলা যাইবে যে শিক্ষার অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও তেমনই দেখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীকে যে জ্ঞান দেওয়া হইতেছে উহা যেন তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মানসিক পরিণতির উপযুক্ত হয়। পূর্ব্বে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে এইরূপ যে কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না করিলে শিক্ষার্থীর মনে এমন সব গূঢ়ৈষার (complex) উৎপত্তি হইতে পারে, যাহার ফলে সব ধর্ম্মমূলক ব্যাপারের প্রতি তাহার শত্রুভাব জাগিবার সম্ভাবনা। কিশোরগণের মনোবৃত্তি সম্পর্কে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এমন ব্যাপার যথেষ্ট দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে পাঠ্যসূচীর সকল অংশই ক্রিয়ারূপে শিখাইতে হইবে। সুতরাং সে শিক্ষার একটি দিক ব্যবহারিক, অপরটি বুদ্ধিগত। শিল্প ও হাতের কাজে ব্যবহারিক অংশটি আগে চোখে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। সুন্দর সঙ্গীত, চিত্র বা স্থাপত্য, কাঠ বা ধাতুর কারুকার্য্য, সূচী ও বয়নশিল্প, ইত্যাদির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া চাই। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষায় ধরা যাইবে প্রকৃতিপাঠবিষয়ক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের উদ্যান পরিচর্য্যা, আবহাওয়ার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি, তাহার সহিত নিয়মিত পরীক্ষাগারের শিক্ষাও চলিবে। গণিতে ছোটদের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে জ্যামিতির পরিমাপ, আর দক্ষতর ছাত্রদের বেলায় উহার উচ্চতর জ্ঞান ঘটিত বাস্তব সমস্যা প্রভৃতি থাকিবে। সাহিত্যের ব্যবহারিক অনুশীলনের মধ্যে বিদ্যালয়ের পত্রিকার জন্য রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা, নাটক রচনা ও অভিনয়, ইত্যাদি

সহজেই স্থান পাইতে পারে। ভূগোলে গণিতের সমন্বয়ে, সহজ জরীপ, মানচিত্র গঠন প্রভৃতি চলিবে, স্থানীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাইবে। এক কথায় প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন এমন হইবে যে ঠিক যে সৃষ্টিমূলক ধারায় বিষয়টির ক্রমোন্নতি হইয়াছে, বিদ্যালয়ের সরল জীবনে যতদূর সম্ভব সেই ধারাটি বজায় থাকিবে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি পর্য্যায়ের (stages) স্বাভাবিক রূপ প্রকাশ পাইবে। আর দেখা যাইবে যে এই পর্য্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে, আর এগুলি সেই বিষয়সমূহের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পর্য্যায়গুলিরই অনুরূপ। বিদ্যুৎ এবং চুম্বক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গুরুতর নিয়মটির উদাহরণ পাওয়া যায়; কারণ এক্ষেত্রে পর পর পর্য্যায়গুলি খুব সুস্পষ্ট, আর সকলেই এগুলির বিষয় কিছু জানে। ইহার প্রথম পর্য্যায়টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সুপ্রসিদ্ধ 'বিজ্ঞানের বিস্ময়সমূহ' আবিষ্কার; যেমন, চুম্বক পাথরের অদ্ভুত গুণ, বিদ্যুতের আশ্চর্য্য শক্তি, ভেকের পায়ে ধাতু সংযোগ করিলে উহার স্পন্দনের গ্যালভানি (Galvani) প্রদর্শিত পরীক্ষা। বিষয়গুলির নূতনত্ব ও বিস্ময় উদ্রেক করিবার শক্তি থাকার জন্যই লোকে এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং আরও জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্লেটোর (Plato) সুন্দর কথায় এই অবস্থার নাম দেওয়া যায় 'বিস্ময়-পর্য্যায়' (wonder-stage)। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক নূতনত্বই আর এগুলির একমাত্র আকর্ষণ নহে; এগুলিকে মানুষের কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের সৃষ্টি হইল। ইহাকে বলা যাইবে 'উপযোগ-পর্য্যায়' (utility-stage)। সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে দেখা যায়, তড়িৎ ও চুম্বক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের শৃঙ্খলাগত ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের চেষ্টা হইল। ইহাকে 'বিধিবদ্ধতা-পর্য্যায়' (system-stage) অভিহিত করা যাইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও অনুরূপ তিনটি পর্য্যায় দেখা যায়।

জ্ঞানের সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিক্রিয়াতেও এই ক্রমিক বিকাশের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞাত, বিস্ময়কর ও আনন্দকর

বস্তুর প্রতি আগ্রহের ফলেই তাহাদের বহু মানসিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়। চিন্তা ও অনুসন্ধানের সর্ব্বপ্রথম প্রেরণা সে এইভাবেই পাইয়া থাকে। এই আগ্রহের সুযোগ লওয়ার ফলে বহু স্থলে প্রকৃতিপাঠের শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ইহার অবহেলায় আবার অনেক সময়ে গণিতশিক্ষা নীরস হইয়া উঠে। খুব ছোট ছেলেদের বেলায় ইহার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেলায় অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখা হয় না। কারণ, উপরে বর্ণিত বিস্ময়, উপযোগ ও বিধিবদ্ধতা, এই তিনটি পর্য্যায়ের সমগ্র পাঠ্যসূচীতে এবং উহার বিভিন্ন অংশে পর পর স্থান হইলেও কোনও অবস্থার শিক্ষার্থীর পক্ষেই তিনটি পর্য্যায়ের একটিকেও বাদ দেওয়া চলে না। খুব ছোট ছেলেরাও পঠিত বিষয়ের মধ্যে অনেক জিনিষের উপযোগ বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। আবার বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার ফলে বিধিবদ্ধতার প্রাথমিক ধারণাও তাহাদের মনে আসে। তেমনই, যদিও উপযোগের স্থান প্রধানতঃ বিদ্যালয়ে পাঠের মাঝের কয় বৎসরে, আর বিধিবদ্ধতার ধারণা যদি আদৌ জন্মে ত সে একেবারে বিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরে, তবু মাঝে মাঝে বয়স্ক ছাত্রদের পাঠের মধ্যেও অভিনব ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে আগে হইতেই বিধিবদ্ধতার চেষ্টা করা হয়, এবং এই কারণে পূর্ব্ব পর্য্যায় দুটির অবহেলা ঘটে। ইতিপূর্ব্বে অধ্যায়ের প্রথম দিকে দেখা গিয়াছে যে, এই বয়সে বহির্জ্জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে যে কৌতূহল থাকে, তাহা নেশার মত হইয়া উঠিতে পারে। ইহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী গঠন করা আবশ্যক। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে আবার উহার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ উহাতে দেখা যায় যে, গান্ধীজী তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞানের ফলে ঠিক এই নীতিতেই শিশুর শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পদ্ধতিতে শিশুগণ নিজ রুচি অনুযায়ী কোনও বৃত্তি নির্ব্বাচন করে, আর উহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার শিক্ষা চলে। যেমন শিশু হয়ত কৃষিবৃত্তি পছন্দ করিয়া লইল ; তখন তাহাকে দেখান হয় যে, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে উদ্যানপালন সম্বন্ধে বই পড়া আবশ্যক, কিছু

অঙ্কও শেখা প্রয়োজন। এইরূপ উপযোগের উদ্দেশ্য থাকার ফলে সে যত তাড়াতাড়ি শিখিতে পারিবে, বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রণালীর অধ্যাপনায় তাহা পারিবে না। গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্প, কারুকলা এবং অন্যান্য বিষয়ে এই প্রণালীর যথেষ্ট স্থান আছে; প্রথমে একটি কার্য্যকরী সমস্যা লইয়া আরম্ভ করার পরে উহার সমাধানের প্রয়োজনীয় সূত্র ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে সময় হইবার পূর্ব্বেই বিধিবদ্ধতা আনিবার চেষ্টা করা হয় বলিয়া উহাকে পুঁথিগত শিক্ষা আখ্যা দেওয়া হয়। এ সমালোচনা অন্যায় নহে। তবে অবশ্য যথাসময়ে বিধিবদ্ধতারও অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে, আর বর্তমানে ইহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে; বিশেষতঃ গণিতের বেলায়, কারণ বিধিবদ্ধতার অপপ্রয়োগ হইতে ইহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে। সভ্যতার ক্রমপরিণতিতে বিমূর্ত চিন্তা (abstract thought) ও সাধারণ ধারণার প্রভাব অতি বিপুল। স্নতরাং শিক্ষায় যদি এগুলিকে বাদ দেওয়া যায় বা গৌণ স্থান দেওয়া হয়, তবে পরিতাপের বিষয় হইবে। অধিকাংশ ছাত্রের জ্যামিতির বিধি ও বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রেই সচরাচর এরূপ চিন্তার সহিত পরিচয় হয়। কিন্তু সমাজ সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ের অধ্যাপনা যদি ঠিকমত হয়, তবে উহাতে এরূপ চিন্তামূলক আলোচনার বেশী স্নযোগ পাওয়া যায়। উহার ফলে তরুণ শিক্ষার্থীগণ এমন সব সাধারণ তথ্যের সন্ধান পায়, যেগুলি মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রিয়াবলীর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা প্রচলিত 'বিষয়' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি বটে, কিন্তু শিক্ষাকে বর্তমানে যেমন পৃথক কতকগুলি বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। নার্সারী বিদ্যালয়ে ইহার স্থান একেবারেই নাই, আর শিশুবিদ্যালয়েও ইহাকে কেবল পঠন, লিখন, ও অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। শিশু যেমন কৌতূহলবশতঃ পিতা বা অপর কোনও বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে প্রশ্ন করিয়া বহু বিষয় জানিতে পারে, তেমনই ভাবে নিম্নশ্রেণীতে কয়েকটি বস্তু বা আগ্রহের কেন্দ্র (centre of

interest) হইতে ছাত্রদের অনেকখানি জ্ঞানলাভ হইতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠ্যসূচীর শ্রেণীবিভাগ করার চেয়ে ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। তবে উচ্চতর শ্রেণীতে যখন বিধিবদ্ধতার সময় আসে, তখন শিক্ষার্থীকে বোধসহকারে প্রধান যুক্তিসঙ্গত পন্থাগুলি অনুসরণ করিয়া বিদ্যালয়ের জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এখানেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরে যে বিষয়গুলির নাম করা হইয়াছে, সেগুলি দ্বারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর উপযোগী ক্রিয়ার সীমা নির্দ্ধারিত হয় মাত্র। সকল শিক্ষার্থী যে সমভাবে সকল সময়ে এগুলি পৃথক বিষয়রূপে শিক্ষা করিবে, এমন কোনও কথা নাই। এবং যদি দেখা যায় যে, একাধিক বিষয় একসঙ্গে অধ্যয়ন করিলে সুবিধার সম্ভাবনা, তবে সেক্ষেত্রে তাহাই করা যাইবে। যেমন ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত ও পদার্থবিদ্যা এইভাবে সংযুক্ত হইতে পারে। আবার কতকগুলি অংশে, যেমন গণিত বা বিজ্ঞানে, এমন বিকল্প পাঠ্যসূচী থাকা আবশ্যক যাহাতে বিষয়টির প্রধান বস্তুগুলি রাখা হইবে, কিন্তু সকল খুঁটিনাটি ও জটিল কৌশল সমূহ থাকিবে না। কারণ, অল্পবুদ্ধি ছাত্রের পক্ষে এগুলি বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাথমিক বা উন্নত, সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত, সকল শিক্ষাপদ্ধতিই এমন হইবে যাহাতে বিষয়টি এক সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ারূপে এবং সভ্যতার প্রাণবস্তুর নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায়।

এখন পরীক্ষা ব্যাপারটির উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। তবে সে বিষয়ে দুই একটি সাধারণ মন্তব্য মাত্র করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে অনুসৃত বিষয় বা ক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থী কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা নির্ণয় করার প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। এবং এই প্রয়োজন সাধনের জন্য কোনও না কোনও আকারে পরীক্ষারও অতি গুরুতর স্থান বিদ্যালয় জীবনে থাকিবে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে একটি বা দুইটি মাত্র পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সমগ্র বৎসরের সাফল্য নির্ণীত হয়, বা সে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবে কিনা তাহা স্থির হয়, উহার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। উহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা সর্ব্বত্র হইয়াছে। ভাল পরীক্ষাপদ্ধতিতে এমনই ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যে বিদ্যার্থীর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, কতখানি উন্নতি হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি থাকে। আর এমন বিধানও উহাতে থাকা দরকার যে শিক্ষার্থীগণ সমস্ত

সময়ই পড়াশুনার বিষয়ে মনোযোগী এবং সচেষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের পাঠকে বিষয় না ধরিয়া ক্রিয়ারূপে গণ্য করিলে এ উদ্দেশ্যের সহায়তা হইবে। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত পরীক্ষাবিধির বহুবিধ সংস্কারের প্রস্তাব শিক্ষাবিদ্‌গণ সর্ব্বত্রই করিতেছেন। উপযুক্ত সংস্কার হইলে তবেই পরীক্ষার উপযুক্ত সার্থকতা আসিবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মানসিক অভীক্ষণকে (নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পরীক্ষার সহায়ক ও পরিপূরক রূপে লইলেও সদ্বিবেচনার কার্য্য হইবে।

এই নীতিগুলি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইবে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিন্তু সব শেষে একটি সাধারণ প্রশ্ন উঠে, উহার উত্তর দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের যে চিত্রটি এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে, উহাতে বিদ্যালয় হইল একটি সুনির্ব্বাচিত ক্ষেত্র। সেখানে শ্রেষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে বালকগণ স্ব স্ব সৃষ্টি প্রতিভার বিকাশ সাধন করিয়া তদনুযায়ী ব্যক্তিতা গড়িয়া তুলিতে পারে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কি এই কথাও বুঝায় না যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী উহা হইতে স্বাধীনভাবে যাহা ইহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা ইচ্ছা বাদ দিবে? এবং সেরূপ হইলে ত শিক্ষা এক কাণ্ডজ্ঞানবিরোধী বিশৃঙ্খলার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে ও ইহাতে চরিত্রের গঠনের চেয়ে অবনতিই বেশী হইবে, এরূপ মনে হইতে পারে। আবার তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের এমন স্বাধীনতার কথা যদি স্বীকার না করা যায়, তবে এই গ্রন্থে যে নীতি প্রথমাবধি বিবৃত হইয়াছে, তাহা কি শুধু অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র?

সুখের বিষয় এই যে, এই উভয় সঙ্কটের কোনটিতেই আমাদের পড়িবার কারণ নাই। মানব প্রকৃতির গুণ এই যে সকল অবস্থার সহিত উহা নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। আর শিশুর সম্পর্কে পরিণত মানুষের চেয়েও এ কথা বেশী খাটে। শিশুর মানসিক ক্ষুধা বা আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল, তেমনই বৈচিত্র্যময়। অপরের কীর্ত্তি অনুকরণ করার ঝোঁক সে ছাড়িতে পারে না। সুতরাং তাহার মানসিক ক্ষুধার উপযোগী আহার্য্য যদি আমরা ভালভাবে নির্ব্বাচন করি এবং চিত্তাকর্ষকরূপে পরিবেশন করি, তবে উহা তাহাকে গ্রহণ করান সাধারণতঃ কঠিন হয় না। এই উক্তি বিশেষভাবে সত্য,

পড়া, লেখা ও সহজ অঙ্কের সম্পর্কে। আধুনিক জগতে এগুলি না শিখিলে এত ঠেকিতে হয় যে প্রত্যেক শিশুই এগুলি শিখিতে চাহিবে। বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত আকর্ষণ তাহার কাছে বিশেষ কিছু না থাকিতে পারে। অবশ্য অধ্যাপনায় এই আকর্ষণও অনেক বাড়ে। তবে খুব অল্প বয়সেই এইগুলির উপযোগ যতখানি শিশু উপলব্ধি করিতে পারে, অন্যান্য বিষয়ের বেলায় ততখানি হয় না। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য (অর্থাৎ উপযোগ ভিন্ন) স্বাভাবিক প্রেরণাও আসে; নিজ অজ্ঞতা বা অক্ষমতার জন্য লজ্জা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, শিক্ষককে সন্তুষ্ট করিবার এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীটি মানিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হয়। সবার উপরে থাকে এই জ্ঞান যে, অন্য সকলে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকেও করিতে হইবে। পরে যখন শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত বয়স হয়, তখন তাহার খামখেয়ালীও চলিয়া যায়। উহার কারণ কতকটা এই যে, সে দেখিতে পায় যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি ভাল না লাগিলেও তাহার বৃত্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ; আবার খানিকটা কারণ এই যে, সে বুঝিতে পারে যে তাহার অতি প্রিয় বিষয়টিতে অন্য কতকগুলি বিষয়ের সাহায্য না লইয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

পাঠক বলিবেন যে, পড়াশুনা স্বভাবতঃই যে ছেলের ভাল লাগে না, আর সামাজিক প্রেরণার বশেও পাঠে অনুরাগ জন্মে না, এমন ছেলেও ত অবশ্যই দেখা যায়। সে ছেলের কোনও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে ভাল লাগিল না বলিয়া কি সে উহাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটি প্রশ্ন করা যায়। যে বিপদের আশঙ্কা এই স্থলে করা যাইতেছে, তাহা কি প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘটিতে পায় না? অনিচ্ছুক ছাত্রকে কি যথার্থই আমরা যাহা তাহার জানা উচিত মনে করি, ঠিকভাবে তাহা আয়ত্ত করাইতে সমর্থ হই? তবে অবশ্য এ যুক্তি দিলে প্রশ্নটি এড়াইয়া যাওয়ারই সমান হয়। তাই তাহা না করিয়া উহার সোজাসুজি উত্তরই আমরা দিব। এবং এই কথা স্বীকার করিব যে, আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিষয় প্রকৃতই নীরস মনে হইলে, উহা হইতে ছাড় পাইবার সুযোগ তাহার থাকিবে। কিন্তু লঘুভাবে বা

যথার্থরূপে বিষয়টি লইয়া চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে তাহাকে দেওয়া হইবে না। এ ব্যবস্থাটি প্রথমে যতটা আপত্তিকর মনে হয়, কতকগুলি কথা বিবেচনা করিলে সেরূপ আর হইবে না। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এখন কোনও একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুরাগ নাই; কিন্তু পরে সেই বিষয় লইয়াই সে অধিক উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এবং শীঘ্রই যে অংশ তাহার বাদ পড়িয়াছিল, উহা তাহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি বিষয়টির প্রতি বিরাগ স্থায়ীও হয় ত সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সহজ প্রকৃতিকে উৎপীড়িত না করিয়া বরং সে ক্ষতি মানিয়া লওয়া ভাল। কারণ সব রকম মানসিক বৈষম্যের জগতে স্থান পাইবার সমান অধিকার আছে, সে কথা যদি আমরা মানিয়া লই, তবে ইহাও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, খুব কম বালক বালিকারই মনোবৃত্তি এতটা বিসদৃশ হয় যে, উহারই ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী সঙ্কলন করা ও তাহা দ্বারা শিক্ষার যাবতীয় অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানেও গীতার উক্তি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ, জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন (অজ্ঞের ত কথাই নাই); প্রাণীগণ প্রকৃতি অনুসারেই কার্য্য করে, শাসনে কি ফল হইবে? আবার, শিক্ষার্থী কোনও একটি প্রধান জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করিল, একথা শিক্ষকের বড় শোচনীয় মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বুঝিতে হইবে এটি তাঁহারই বৃত্তিগত সংস্কার, বৃহত্তর বহির্জগতের অভিমত ইহা নহে। জগৎবাসী অনেক বিষয়েই অজ্ঞতা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে, যদি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অন্যান্য বিষয়ে মানুষের কৃতিত্ব থাকে। এবং এখানে দুটি জিনিষের গভীর তাৎপর্য্যের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা বিদ্যালয়ের একঘেঁয়ে পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারাই বিস্ময়কর যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহু মহাপ্রতিভাশালী কৃতীপুরুষদের জীবনীতে আমরা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণসমূহ পাই। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহাদের অনেকেই নিজেদের বাল্যের

অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদ এক সময়ে মূক ও নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহারই কঠোরতম সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন ; আর তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষও আছেন যাঁহারা জগতকে তাঁহাদের গভীর ঋণে আবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহাই হউক, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুদের সহজাত সামর্থ্য, প্রতিভা ও প্রবণতার মধ্যে এতখানি প্রভেদ থাকে যে এক শিক্ষাব্যবস্থা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। শিশুর ব্যক্তিতা যতই গরীয়ান বা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, যে শিক্ষা উহার পক্ষে অনুকূল, তাহারই দ্বারা উহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হওয়া সম্ভবপর। এইজন্য সকল দেশেই বিভিন্ন মান ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার, বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। তবেই সকল শিশু নিজ প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ পাইবে। আমাদের দেশেও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দিক দিয়া উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। এই প্রচেষ্টার সবে স্থচনাই হইয়াছে ; শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে যদি ইহা ঠিক পথে পরিচালিত হয়, তবে ভবিষ্যৎকালের পক্ষে ইহা কল্যাণকর হইবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা এখানে যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলিয়াছি, তাহার স্থান কল্পনার রাজ্যে। সেখানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেকেরই চরিত্র ও প্রতিভা অতুলনীয়, আর ব্যবস্থাপনারও কোনও অসুবিধা নাই। এবং সর্ব্বোপরি এ বিদ্যালয় যে সমাজে প্রচলিত, তাহা বর্ত্তমান সমাজের চেয়ে অনেক অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। কিন্তু সে কারণে আমাদের প্রতিপাদ্য যুক্তিটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ বর্ত্তমান সম্ভাবনার বহির্ভূত লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই আদর্শের প্রকৃত সার্থকতা। আমাদের আদর্শটি যথার্থ পথের নির্দ্দেশ দিতে পারিয়াছে কি না, তাহাই আসল কথা। তাহার বিচার পাঠক করিবেন। প্রথম অধ্যায়ে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছিল, তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে কি না, এবং মানুষ ও সমাজের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের দিক হইতে তাহা সমর্থিত হইয়াছে কি না, সে কথা পাঠকই বিবেচনা করিবেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক মহা পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহার আসল রূপটি কেহ জানে না। আমাদের সম্মুখে বহু আশা, কিন্তু সেগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে কি না, তাহা আমরা জানি না। তেমনই ভয়ও অনেক আছে, কিন্তু সেগুলিও অমূলক হইতে পারে। যে সকল সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেগুলির সমাধান আগামী যুগের মানুষকে করিতে হইবে। এই গ্রন্থে যে সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুঁথিগত নহে। মানুষ অবস্থার দাস নহে, বা ভাগ্যের অধীনও নহে; নিজ অজ্ঞাত ভাগ্যের বিধান সে নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে অনিবার্য্যরূপে গড়িয়া তোলে। এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি আমাদের আলোচিত সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। অন্ততঃ এটুকু মনে করিলেও তাঁহারা প্রভূত সান্ত্বনা পাইবেন যে আমাদের শিশুগণ যে সুন্দর জগৎ গড়িয়া তুলিবে, আমাদের পৃথিবীই তাহার ভিত্তি হইবে বটে; কিন্তু চিরকাল আমাদের ব্যর্থতাগুলির পুনরাবৃত্তি তাহারাও করিয়া চলিবে, এমন কোনও কথা নাই, অবশ্য যদি আমরা ভ্রমবশতঃ তাহা করিতে তাহাদের বাধ্য না করি। উহাদের মধ্যে যে সৃষ্টিপ্রতিভা আছে, তাহাকে যদি আমরা সুবিবেচনা ও সহানুভুতির সহিত পরিচালিত করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাকে উহারা এমনই মহিমান্বিত রূপ দিবে, যাহা দেখা দূরের কথা, আমরা কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

সমাপ্ত

প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট

Schools of To-morrow—J. Dewey.
Educational Theories—Sir John Adams.
Foundations of Educational Psychology—Sandiford.
Education in Transition—H. C. Dent.
Talks to Teachers—William James.
The School and Society—J. Dewey.
Psychology—Woodworth.
The Young Delinquent—Sir Cyril Burt.
On Education—Bertrand Russell.
Problems in Psycho-pathology—T. W. Mitchell.
Modern Developments in Educational Practice—Sir John Adams.
Mental and Scholastic Tests—Sir Cyril Burt.
The Abilities of Man—C. Spearman.
Intellectual Growth in Young Children—Susan Isaacs.
Psychology—William Mcdougall.
The Backward Child—Sir Cyril Burt.
Basic Education Committee Report (Indian National Congress).
The Wardha Scheme—Varkey.
The Latest Fad : Basic Education—J. B. Kripalani.

বিষয় সঙ্কেত

সংক্ষিপ্ত পরিভাষা

Ability শক্তি
" general সাধারণ শক্তি
" specific বিশেষ "
Abstraction বিমূর্ত্তণ
Adolescence কৈশোর
Adolescent কিশোর
Association অনুষঙ্গ
Autonomous স্বয়ংচালিত
Behaviourism চেষ্টিতবাদ
Child-guidance শিশুসহায়ক ব্যবস্থা
Co-education সহশিক্ষা
Cognition জ্ঞান
Complex গূঢ়ৈষা
Conation ইচ্ছা
Conscious সংজ্ঞাত
Consolidation সন্নিবদ্ধতা
Correlation অনুবন্ধ
Day-dream জাগরস্বপ্ন
Delinquent দুষ্ক্রিয়, অপরাধপ্রবণ
Determining tendency নিয়তি
Discipline শৃঙ্খলা
Disposition স্বভাব
Emotion প্রক্ষোভ
Engram রেখা, স্নায়বিক সংস্কৃতি
Engram-complex রেখাসমন্বয়
Environment পরিবেশ
Evolution ক্রমবিকাশ, অভিব্যক্তি
Feeling অনুভূতি
Formal training সর্ব্বাভিমুখী শিক্ষা
Frequency পৌনঃপুন্য, বার
Gestalt Psychology সামগ্রিক মনোবিদ্যা
Heredity বংশগতি
Heuristic method আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি
Horme এষণা
Hypnosis সংবেশন
Ideal আদর্শ
Image প্রতিরূপ
Impulse আবেগ
Individuality ব্যক্তিতা
Instinct প্রবৃত্তি
Intelligence test বুদ্ধি অভীক্ষা
" quotient " অঙ্ক
Interest আগ্রহ
Mental age মানসিক বয়স
Mimesis অনুচিকীর্ষা
Mneme স্বতঃস্মৃতি
Noe-genetic principles জ্ঞানের নিয়ম
Pattern আদর্শ, প্রতিকৃতি
Perception প্রত্যক্ষ
Personality ব্যক্তিত্ব
Pleasure-pain principle সুখদুঃখনীতি
Probability সম্ভাব্যতা
Psycho-analysis মনঃসমীক্ষণ
Reality principle বাস্তবনীতি
Reasoning যুক্তি

Recreation বিনোদন
Recapitulation সংক্ষিপ্তাবৃত্তি
Reflex প্রতিবর্ত্ত
" conditioned " সাপেক্ষ
" primary " মুখ্য
" secondary " গৌণ
Repetition compulsion অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি
Repression অবদমন
Resistance প্রতিবন্ধ
Ritual অনুষ্ঠান
Schema ছাঁচ
Self আত্মভাব
Self-assertion আত্মসাম্মুখ্য
Self-feeling আত্মানুভূতি
Self negative " ব্যর্থ
" positive " সার্থক
Self-regard আত্মশ্রদ্ধা
Sentiment রস
Sociability সামাজিকতা
Standard deviation প্রমাণ ব্যত্যয়
" score " সাফল্যাঙ্ক
Sublimation উদ্গতি
Suggestion অভিভাবন
Symbol প্রতীক
Temperament প্রক্ষোভপ্রকৃতি
Trial and error পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন
Unconscious নির্জ্ঞান
Will ইচ্ছাশক্তি